বিষয়ঃশিক্ষা

মোরশেদ শফিউল হাসান

বিষয় : শিক্ষা

www.pathagar.com

বিষয় : শিক্ষা

মোরশেদ শফিউল হাসান

কথাপ্রকাশ

www.pathagar.com

বিষয় : শিক্ষা
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬
স্বত্ব : লেখক
প্রকাশক : জসিম উদ্দিন
কথাপ্রকাশ
Email : jashimuddin1969@gmail.com
ফোন ০১৭৬৬৫৯০৪০৪

প্রধান কার্যালয়
৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৩য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন ৯৫৮৪৪৩৬, ৯৫৮৯৮৫২

প্রাপ্তিস্থান
কথাপ্রকাশ, ৩৭/১ বাংলাবাজার, পি. কে. রায় রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন ৯৫৮১৯৪২, ০১৭১৪৬৬৬৯৪৬
এবং
কথাপ্রকাশ, ৮৭ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা)
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০, ফোন ৯৬৩৫০৮৭

মুদ্রক
সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ৩/ক-খ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা
ফোন ৯৫৩৩০২৯, ০১৭২৬৪৬২৫৩৩

মূল্য : ২০০.০০

প্রচ্ছদ : নিয়াজ চৌধুরী তুলি

BISHOY : SHIKKHA (On Education) by Dr. Morshed Shafiul Hasan
Published by Jashim Uddin
Kathaprokash, 37/1 Banglabazar, Dhaka 1100, Ph. 9581942, 01766590404
First Published : February 2016
Price : Tk. 200.00
Email : kathaprokash@gmail.com, Web : www.kathaprokashbd.com

ISBN : 984 70120 0476 0

www.pathagar.com

ছাত্রজীবনে যাঁদের দেখে শিক্ষক হওয়ার
স্বপ্ন দেখেছিলাম তাঁদের স্মৃতিতে
এবং
শিক্ষকতাকে আজও যাঁরা পেশার চেয়ে
বেশি কিছু মনে করেন তাঁদের হাতে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নিবেদন

তিন দশকেরও বেশি সময়ের পরিসরে লেখা আমার শিক্ষা বিষয়ক বাইশটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ এ বইয়ে একত্রিত হয়ে প্রকাশিত হল। লেখাগুলোর কতক আমার স্বনামে আর কতক হাসান শফি বা অন্যান্য নামে ইতিপূর্বে পত্রপত্রিকা ও বইয়ে ছাপা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ও শেষদিকের গোটা দশেক রচনা দৈনিক পত্রিকার উপসম্পাদকীয় কিংবা কলাম আর বাকিগুলো স্বতন্ত্র রচনা হিসেবে লেখা। অনেকগুলো রচনাই বিচ্ছিন্নভাবে আমার বিভিন্ন প্রবন্ধগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। কিছু রচনা আছে যা ইতিপূর্বে কোনো বইয়ে স্থান পায়নি। লেখাগুলো নিয়ে একটি আলাদা বই প্রকাশের ধারণার জন্য বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক আখতার হুসেনের কাছে আমি ঋণী। আমি কৃতজ্ঞ কথাপ্রকাশের কর্ণধার জসিম উদ্দিনের প্রতি বইটি প্রকাশের আগ্রহ দেখানোর জন্য। আজ দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার সমস্ত ডামাডোলের মধ্যেও শিক্ষার হালঅবস্থা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা সকলেই যখন কমবেশি উদ্বিগ্ন, তখন এ লেখাগুলো যদি কারো ভাবনায় সামান্যও সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়, নিজেকে সার্থক জ্ঞান করব।

মোরশেদ শফিউল হাসান
জানুয়ারি ২০১৬
morshedshasan@gmail.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচি

বিদ্যাবাণিজ্য ও স্বদেশের মুখ ॥ ১১
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের আন্দোলন ॥ ১৯
শিক্ষকের মর্যাদার জন্য যা জরুরি ॥ ২৬
অধ্যাপক জাফর ইকবালকে প্রশ্ন ॥ ৩২
বইবিহীন শিক্ষা ও স্কুলে পার্লার ॥ ৩৪
মানসম্মত শিক্ষা নাকি বেশি বেশি গোল্ডেন প্লাস ॥ ৪০
প্রসঙ্গ : শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ॥ ৪৬
শিক্ষার অপমৃত্যু : একজন শিক্ষকের দৃষ্টিতে ॥ ৪৯
মানুষ গড়ার শিক্ষা চাই ॥ ৫৬
শিক্ষা ও শিক্ষকতা প্রসঙ্গে দু-চার কথা ॥ ৬৪
মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষাদর্শ ॥ ৬৮
ঔপনিবেশিক শিক্ষাদর্শের বিরোধিতায় রবীন্দ্রনাথ ॥ ৭২
রোকেয়া : শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষাচিন্তক ॥ ৯১
বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা : অব্যবস্থার চালচিত্র ॥ ১০৭
প্রসঙ্গ : ব্যাকরণ শিক্ষা ॥ ১২৫
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় ভাষার স্থান ॥ ১২৮
রোকেয়া, তাঁর বিদ্যালয় এবং বাংলা-উর্দু বিতর্ক ॥ ১৩০
পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ॥ ১৩৫
উন্নয়নশীল দেশের মেধাপাচার ॥ ১৩৯
প্রসঙ্গ : শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ॥ ১৪২
বাংলাদেশে ইংরেজি চর্চা ॥ ১৪৭
বৈষম্য সৃষ্টির শিক্ষাব্যবস্থা ॥ ১৫০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিদ্যাবাণিজ্য ও স্বদেশের মুখ

শুনেছি দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তাঁর প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের খদ্দের হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, 'আমাদের উচিত তাদেরকে সেরা পণ্যটি দেওয়া'। বলা বাহুল্য কথাটা তিনি ইংরেজিতেই বলেন, আমি এখানে তার বাংলা অনুবাদ করে দিলাম। 'খদ্দের' অর্থে তিনি 'কাস্টমার' ও 'পণ্য' অর্থে 'প্রোডাক্ট' শব্দটি ব্যবহার করেন। সহকর্মীদের দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করতেই তিনি কথাটি বলেন। আমি বরং তাঁর প্রশংসাই করব, এজন্য যে তিনি বিষয়টাকে যেভাবে দেখেন বা বোঝেন, ঠিক সেভাবেই উপস্থাপন করেন। 'সেবা', 'ব্রত' বা ওই জাতীয় কোনো শব্দ ব্যবহার করে অযথা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন না। তিনি 'বাজার' বোঝেন, 'ব্যবসা' বোঝেন, নিজেও হয়তো ব্যবসা প্রশাসন নিয়েই পড়াশুনা করেছেন। তিনি জানেন, বিদ্যা নামক পণ্যের এই বাজারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্কটা আসলে বিক্রেতা ও ক্রেতার। উপাচার্য মহোদয়ের এই বক্তব্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য বা চরিত্রকেই তুলে ধরে। আর কেবল তাঁর কিংবা অন্যান্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই নয়, সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে আমাদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থার বেলায়ই কথাটা আজ কমবেশি সত্যি।

একসময় শিক্ষা প্রসঙ্গে প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবেই 'মানুষ গড়ার শিক্ষা' কথাটি উচ্চারিত হত। শিক্ষকদের বলা হত 'মানুষ গড়ার কারিগর'। তার মূলে কাজ করত এই ধারণা বা প্রত্যয়টি যে মানবসন্তান ঠিক জন্ম বা উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষ নয় (এবং এখানেই অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে তার পার্থক্য), তাকে একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ হয়ে উঠতে হয়। আর শিক্ষাই হল সেই প্রক্রিয়া। শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে 'আদর্শ নাগরিক' তৈরির কথাও বলা হত। এখানে 'আদর্শ' মানে সচেতন ও দায়িত্বশীল। নিজের একান্ত ব্যক্তিক ও পারিবারিক গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশদশের প্রতি সংবেদনশীলতার অর্থে। বর্তমানে 'মানুষ' কথাটার জায়গা নিয়েছে 'মানব সম্পদ'। কিন্তু দুটি কথার অর্থ, তাৎপর্য বা ব্যঞ্জনা কি এক? সত্যি কথা বলতে, এই তফাতটাই কি আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রেও এক বিরাট বা মৌলিক ফারাক সৃষ্টি করে দিচ্ছে না? তারপর আবার যখন 'মানব সম্পদ' কথাটিও 'জনশক্তি' দিয়ে পুনঃস্থাপিত হয়, তখন তো 'মানুষ', 'মানবিকতা' এ বিষয়গুলোরই কোনো গুরুত্ব থাকে না। তাই বোধহয় আমাদের শিক্ষার বিশেষ করে উচ্চস্তরে বিষয় হিসেবেও মানববিদ্যা ক্রমে তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে 'দক্ষ জনশক্তি' সৃষ্টি, যতটা না নিজ দেশের জন্য, তার চেয়ে বেশি বিশ্ববাজারের জন্য। বিশ্ববাজারে দক্ষ-অদক্ষ নির্বিশেষে আমাদের শস্তা শ্রমশক্তির চাহিদা আছে। আর বাজার চলে চাহিদা ও জোগানের নিয়মে। সবাই সেখানে শস্তায় পেতে ও অধিক লাভবান হতে চায়। যে যাই বলুন, বাজারের কোনো নীতি বা মূল্যবোধ নেই। যে-কোনোভাবে মুনাফা করাই সেখানে উদ্দেশ্য। প্রতারণা-প্রবঞ্চনা সবই সেখানে বৈধ, যদি তা লাভকে নিশ্চিত করে। 'কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি' কথাটাও কিন্তু সেই দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত। অর্থাৎ তা-ও মুনাফার চিন্তা বাদ দিয়ে নয়। আমাদের কিন্ডারগার্টেন থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়—সবই এই নিয়মে পরিচালিত হয়। এমনকি এই বাজার-সংস্কৃতি বর্তমানে আমাদের সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকেও গ্রাস করছে। বিদ্যা ও জ্ঞানচর্চার জায়গা নিচ্ছে বিদ্যাবাণিজ্য। বিষয়টা সবার কাছে এতটাই স্পষ্ট যে তা নিয়ে এখানে বিশদ ব্যাখ্যা বা আলোচনার প্রয়োজন নেই। বাজারে চাহিদা নেই এমন বিদ্যা শিখতে কেউই আজ আর আগ্রহী নয়। একেবারে উপায়হীন না হলে, শুধু আগ্রহের বশে কেউ আজ কোনো বিষয় পড়েও না। বাংলা, ইতিহাস বা দর্শন তো নয়ই, ভালো ছাত্ররা আজ এমনকি পদার্থবিজ্ঞান, গণিত বা অর্থনীতিও পড়ছে না। এমনকি তরুণদের মধ্যে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ঝোঁকটাও যেন কমে আসছে। আগামীতে আমাদের দেশ মেধাবী বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, ইতিহাসবিদ পাবে কোথা থেকে? এখনই তো এসব ক্ষেত্রে মিডিওকারদের দৌরাত্ম্য চলছে। এ ব্যাপারে নিজেদের প্রতিভাহীনতা বা মেধার খামতি পূরণ করতেই বোধহয় তাঁদেরকে দলবাজি করতে হয়। আগামীতে অবস্থা কী দাঁড়াবে, ভাবতে গেলে শিউরে উঠতে হয়। যথেষ্ট সংখ্যক যোগ্য চিকিৎসক, প্রকৌশলী এমনকি আমলাও আমরা পাব কি? একটা সময় আমাদের দেশের মেধাবী তরুণরা মনে মনে সিএসপি হওয়ার স্বপ্ন দেখত। আজকের তরুণদের স্বপ্নের শীর্ষে রয়েছে কোনো বাণিজ্যিক সংস্থার সিইও হওয়া। আজ আমাদের সমাজে অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে একজন অভিভাবকের তিনটি সন্তানের মধ্যে দুটি, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো তিনটিই বিবিএ বা এমবিএ পড়ে। এভাবে আমাদের দেশে পুরো একটি প্রজন্মই তৈরি হচ্ছে যার নাম দেওয়া যেতে পারে 'বিবিএ জেনারেশন'। শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা নিশ্চয় কর্মসংস্থানের সুযোগের কথা ভেবে এদিকে ঝুঁকছে, সেজন্য

www.pathagar.com

তাদের দোষ দেওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কোনো দেশ বা জাতির জন্য এই প্রবণতাটা কতটা শুভকর, ভেবে দেখা প্রয়োজন। বিশ্বপরিসরে যারা বাজার-অর্থনীতির প্রবক্তা ও পৃষ্ঠপোষক, 'সবার উপরে বাজার সত্য' এই ধারণা বা 'দর্শনে'র প্রচার ও প্রসারে যারা আজ সবকিছুই করছে, পশ্চিমের সেই উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা কি আমাদের এই প্রবণতার পোষকতা করে? তাহলে তো তাদের দেশে নতুন গবেষণা ও আবিষ্কারের পথ বন্ধ হয়ে যেত, মানববিদ্যার চর্চা আর হত না, সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্পকলার ক্ষেত্রে মেধাহীনদেরই দৌরাত্ম্য দেখা দিত। কিছুটা তেমন পরিস্থিতি যে সেসব দেশেও দেখা দেয় নি তা নয়। তবে তা আমাদের অবস্থার সঙ্গে তুলনীয় নয়।

আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশও কি আজ প্রকৃত জ্ঞানচর্চার অনুকূল? গত দশ-বিশ বা তিরিশ বছরে কোন ক্ষেত্রে কটি তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণাকর্ম সেখানে হয়েছে? পিএইচডি গবেষণার নামে প্রতিবছর যে ভূরি ভূরি অভিসন্দর্ভ রচিত হচ্ছে, তার কটি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উপস্থাপনযোগ্য? গবেষণা হিসেবেও তার কতভাগ মৌলিকত্ব দাবি করতে পারে? আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকালেই না সত্যেন বসু তাঁর সে গবেষণাপত্রটি রচনা করেছিলেন, যার জার্মান অনুবাদ ও টীকাভাষ্য লিখেছিলেন আইনস্টাইন, এবং যা পরে 'বোস-আইনস্টাইন তত্ত্ব' নামে জগৎখ্যাতি লাভ করে? কাজী মোতাহার হোসেনের 'হুসাইন চেইন রুল'-এর উদ্ভাবনও তো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতাকালে করা তাঁর পিএইচডি গবেষণা থেকে। আজ শিক্ষকদের কতটা সময় বিদ্যাচর্চায় আর কতটা দলবাজিতে ও বিভিন্ন ধান্দার পেছনে ব্যয়িত হয়? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তো বটেই, শিক্ষকরাও রাজনৈতিক ধরনের কর্মসূচি পালনে যতটা উৎসাহী, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান, আলোচনা ও বিতর্কে তার সিকি পরিমাণ আগ্রহও কি তাঁদের মধ্যে দেখা যায়? জ্ঞানচর্চা বা আদর্শবাদের কোনো দৃষ্টান্ত তাঁরা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে পারছেন কি? সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে যথাসময়ে পরীক্ষা হয় না, ফল বেরোয় না, রাজনৈতিক কর্মসূচি ও ক্যাম্পাসের বিশৃঙ্খলায় সেশনজট দেখা দেয়, পাঁচ বছরের কোর্স দশ বছরে গিয়ে ঠেকে। আর এসব কারণে অভিভাবকদের অনেকে তাঁদের সন্তানদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে চান। তা সে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান যা-ই হোক বা তার ডিগ্রির বাজারমূল্য বা গুরুত্ব যাই থাকুক। 'ফেলো কড়ি মাখো তেল' নিয়মে ওই প্রতিষ্ঠানগুলো অন্তত যথাসময়ে তাঁদের সন্তানের হাতে একটা সনদপত্র ধরিয়ে দিতে পারবে, যার অভাবে সন্তানটি তার চাকরির বাজারে প্রবেশাধিকার পাবে না। শিক্ষার পরিবেশ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত

www.pathagar.com

সুবিধার দিক থেকে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশির ভাগই সার্টিফিকেট বিক্রির দোকানের বেশি মর্যাদা দাবি করতে পারে না। বিদেশেও এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় আছে, এই যুক্তিতেই কেবল তাদের অস্তিত্বকে জায়েজ করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কিংবা সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম শর্ত পূরণ না করেও তারা তাদের বিদ্যাবাণিজ্য ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে লিখিত সতর্কীকরণ ও একটু-আধটু হুমকিধামকি ছাড়া এ ব্যাপারে সরকারের যেন কিছুই করণীয় নেই। মনে হয় তারা অসহায়। কারণ এসব দোকানের অনেকগুলোরই মালিক দেশের বড় বড় ব্যবসায়ীরা (তাঁদের অনেক ব্যবসার মধ্যে আসলে এটাও একটা ব্যবসা), যাঁদের কেউ কেউ এমনকি সরাসরি ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে জড়িত। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে যে-কটি প্রতিষ্ঠানের কিছুটা নাম বা খ্যাতি আছে, সেগুলোরও শিক্ষাপদ্ধতি প্রকৃত জ্ঞানচর্চা এবং চিন্তা ও সৃজনশীলতা বিকাশে কতটা সহায়ক, প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠদান ও পরীক্ষাপদ্ধতি বিশেষত ক্লাসের সংখ্যা, সময় ব্যাপ্তি ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের ধরন বিবেচনায় নিলে সেটা সহজেই বোঝা যায়। শিক্ষার নিম্নস্তরে ও পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে ঢালাও পাস ও জিপি-ফাইভ প্রদানের সাম্প্রতিক প্রবণতার পেছনে অনুপ্রেরণা কে জানে আমরা হয়তো সেখান থেকেই পেয়েছি।

প্রতিষ্ঠার ৩৬ বছর পর ১৮৫৩ সালে কলকাতা হিন্দু কলেজের দ্বার সকল বর্ণ ও সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করার পাশাপাশি এর নতুন নামকরণ করা হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ (একেবারে সাম্প্রতিককালে ২০১০ সালে এটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে)। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বিভাগের নামেই ছিল এই নামকরণ। কিন্তু আমাদের দেশে ওই একই নামে কোনো কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনে অনুকরণ-প্রবণতা ছাড়া আর বোধহয় কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না। একইভাবে অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, হ্যারো—এসব শিক্ষাকেন্দ্রের নামকরণেরও রয়েছে আলাদা আলাদা ইতিহাস ও যুক্তি। কিন্তু আমাদের দেশে বিশ্বখ্যাত এসব প্রতিষ্ঠানের নামে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কী কারণ থাকতে পারে? অনুকরণ-প্রবণতা এবং তার উৎসে কাজ করা আমাদের জাতিগত হীনম্মন্যতা ছাড়া? শুধু ইউরোপ-আমেরিকা নয়, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম নকল করেও সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে কিছু কিছু স্কুল-কলেজ গড়ে উঠেছে। অবশ্য এই নাম নকলেও আমাদের তৃপ্তি নেই, গলিঘুঁজিতে গড়ে ওঠা এমনকি কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর নামের সঙ্গেও 'ইন্টারন্যাশনাল' শব্দটি যোগ করে আমরা যেন বোঝাতে চাই, এই দেশ আমাদের সাময়িক আবাস বটে, কিন্তু আমাদের আয়োজন বাইরের বৃহৎ বিশ্বের জন্যই। পৃথিবীর আর কোনো জাতির মধ্যে এ রকম হীনম্মন্যতার পরিচয় পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। অথচ আমরা গর্ব

www.pathagar.com

করে বলি, একমাত্র আমাদের দেশেই ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য মানুষ জীবন দিয়েছে (যদিও 'একমাত্র' কথাটা সঠিক নয়), ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাধিকার রক্ষার সংগ্রামের পথ বেয়ে লক্ষ লক্ষ প্রাণের মূল্যে আমরা স্বাধীন হয়েছি। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো (কি বেসরকারি কি সরকারি) সেই গৌরব ও গর্বের কতটা বহন করে? দেশে আজ ৮০টিরও বেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যার দুটি কি তিনটিতে মাত্র বিষয় হিসেবে বাংলা পড়ানো হয়। বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বাংলা ভাষার ব্যবহার বলতে গেলে নিষিদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনিক ও একাডেমিক কাজকর্মের সবটাই যে ইংরেজিতে পরিচালিত হয় শুধু তা-ই নয়, শ্রেণিকক্ষেও শিক্ষকরা ক্বচিৎ কেউ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বাংলায় বাতচিত করেন। ফলে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বাংলা মাধ্যমে পড়াশুনা করে যেসব শিক্ষার্থী এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তারা শিক্ষকদের লেকচার কমই অনুসরণ করতে পারে, পাঠের বিষয় কমই উপলব্ধি বা আত্মস্থ করতে পারে। এ অবস্থায় শিক্ষকদের সরবরাহ করা নোটশিট ও ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা বইয়ের নির্দিষ্ট কিছু পৃষ্ঠা মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় উগরে দেওয়া ছাড়া তাদের উপায় থাকে না। হয়তো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়েই এক রকম জাতে ওঠার বাসনা থেকে কিংবা তথাকথিত বিশ্বায়ন বা বাজার অর্থনীতির দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও সম্প্রতি তাদের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কর্মকাণ্ডে ইংরেজি দিয়ে বাংলাকে পুনঃস্থাপিত করতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে ভর্তি ফরম, প্রসপেক্টাস, ক্লাস রুটিন, প্রশ্ন ও উত্তরপত্র, নম্বরপত্র ইত্যাদি যেসব ক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার এক রকম অনায়াস গতি লাভ করেছিল, ইদানীংকালে তাতেও বাংলার বদলে ইংরেজির বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে কেউ কেউ কম্পিউটার ও নেট প্রযুক্তির অজুহাত দেন, অন্যরা কোনো অজুহাতেরও প্রয়োজন মনে করেন না। তাঁদের দৃষ্টিতে যেন এটাই হওয়া উচিত, এটাই স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে সংবিধানে যে নির্দেশ রয়েছে তা যেন কেবল সরকারি দপ্তরের বেলায়ই প্রযোজ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নয়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও অনেক বিষয়ে শিক্ষকরা এখন ক্লাস লেকচার দেন ইংরেজিতে। আগে বাংলায় উচ্চশিক্ষা দানের বিরুদ্ধে পরিভাষার অভাবের কথা বলা হত। তারপরও তখন উচ্চশিক্ষার স্তরে ইংরেজির পাশাপাশি শিক্ষকরা কেউ কেউ পাঠদানের ক্ষেত্রে কমবেশি বাংলা ভাষা ব্যবহার করতেন। শিক্ষার্থীদের বোঝার সুবিধার্থেই তাঁরা সেটা করতেন। বিজ্ঞানসহ নানা বিষয়ে ইতিমধ্যে পরিভাষা তৈরিতে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে, যেখানে তার অভাব রয়েছে সেখানে এবং অন্যত্রও প্রচলিত বিদেশী পরিভাষা যে অনায়াসেই গ্রহণ করা যেতে পারে, তা

www.pathagar.com

নিয়েও আজ কারো দ্বিমত নেই। এ অবস্থায় পরিভাষার অজুহাত আর খাটে না। আর উচ্চশিক্ষায় বাংলা পাঠ্যপুস্তক? চাহিদা থাকলে তা-ও এতদিনে তৈরি হয়ে যেত, বাজারের নিয়মেই। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা তো আজকাল বই পড়ে না তেমন, নোট পড়ে। সুতরাং বইয়ের দরকার বেশি শিক্ষকের। তাঁরা ইংরেজি চালু রেখে নিজেদের কাজটা সহজ করে নিচ্ছেন। হয়তো নিজেদের মুখস্থ বিদ্যাই শ্রেণিকক্ষে চালিয়ে দিচ্ছেন। শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের বরং ভুল ইংরেজি বলতে ও লিখতে উৎসাহিত করেন, তবু বাংলা নয়। কারণ তাদের ধারণা, এভাবে ভুল বলতে বলতে আর লিখতে লিখতেই একদিন তারা ইংরেজি শিখে যাবে। আর ইংরেজি ছাড়া আজকের দুনিয়ায় তারা চলবে কিভাবে? উচ্চশিক্ষায় যে ইংরেজির বিকল্প নেই! যেন তাঁদের ছাত্রছাত্রীরা সবাই মাস্টার্স পাস করে ইউরোপ-আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা নিতে যাবে। পাঠদানের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলগুলোর নামফলক; বিভাগের নামফলক, উপাচার্য-অধ্যক্ষ-প্রধান শিক্ষকের নামফলক এসবও যে ইদানীং—আর বাংলার পাশাপাশিও নয়—অনেক ক্ষেত্রে কেবল ইংরেজিতেই লেখা হচ্ছে, এর যুক্তিটা কী?

আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, আর ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিতে অনেক ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ নামক এই দেশটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কথাটা যদি সত্যি হয়, তবে সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও শিক্ষার্থীরা, তা তারা যে যে-বিষয়েই পড়ুক না কেন, সবার জন্য অন্তত স্নাতক পর্যায়ে ব্যবহারিক বাংলা ও ইংরেজির একটি করে পত্র এবং বাংলাদেশের ইতিহাস ও সমাজ-সংস্কৃতির পরিচিতিমূলক একটি পত্র—এই তিনটি পত্র আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক করা উচিত। এ ধরনের প্রয়োজনের কথা ইতিপূর্বে সভা-সেমিনারে বা সংবাদপত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে হয়তো অনেকেই বলেছেন। কিন্তু তাঁদেরই কেউ কেউ যখন শিক্ষামন্ত্রী বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে বসেছেন, তখন তা বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নেন নি কিংবা হয়তো নিতে গিয়েও পিছিয়ে এসেছেন। যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কথা দিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম, সেই বিশ্ববিদ্যালয়টির মাস্টহেডের নিচে বিজ্ঞাপনের মতো করে দুটো বাক্য লেখা থাকে। যার একটিতে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকই যে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ার ডিগ্রিধারী, তার বাইরে কেউ নেই, এটা সগর্বে প্রচার করা হয়। যেন ওই চারটি দেশের বাইরে পৃথিবীর আর কোথাও যথার্থ জ্ঞান-বিজ্ঞান বা বিশ্ববিদ্যার চর্চা হয় না! কিংবা হলেও তা যথেষ্ট মানসম্পন্ন নয়। কথাটার দ্বারা কেবল বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেই নয়, জার্মানি, জাপানসহ পৃথিবীর অন্য সব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ও তাদের শিক্ষাপদ্ধতিকেও প্রকারান্তরে হেয় করা হয়। বিজ্ঞাপন হিসেবেও এমনটা প্রচারের সুযোগ বা অধিকার কারো থাকা

www.pathagar.com

উচিত কি? অথচ তার জন্য ইউজিসি কি বিশ্ববিদ্যালয়টির কাছে কোনো কৈফিয়ত তলব করেছে? আমরা জানি না।

আমাদের দেশে যেসব ছেলেমেয়ে ও-লেভেল, এ-লেভেলে পড়াশুনা করে ও পরীক্ষা দেয়, তাদের অভিভাবকদের উদ্দেশ্য থাকে সন্তানদের শেষপর্যন্ত বাইরে বিশেষ করে ইউরোপ-আমেরিকায় পড়াশুনা করানো। তাঁদের অনেকেই চান পড়াশুনা শেষে ছেলেমেয়েরা তাঁদের ওসব দেশেই সেটেল করুক। যাঁরা হয়তো তেমন স্বপ্ন দেখেন না, তাঁদের সন্তানরাও প্রায়ক্ষেত্রে নিজেরাই নিজেদের জন্য সে পথ বেছে নেয়। এদেশে তারা নিজেদের কোনো ভবিষ্যৎ দেখে না। সত্যি কথা বলতে, দেশে থাকতেই বিদেশী ধারার লেখাপড়ার মধ্য দিয়ে আপন দেশ-সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের এক রকম বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়ে যায়। আমাদের দেশের বেশির ভাগ ইংরেজি মাধ্যম স্কুল-কলেজ ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও তাদের অনুসৃত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতির মধ্য দিয়ে কার্যত এই বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির প্রক্রিয়াকেই এগিয়ে নিচ্ছে। আর আমাদের আমলা, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, রাজনীতিক (কি ডান কি বামপন্থী) অনেকেই তাদের বংশধরদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলচিন্তা থেকে এই বিচ্ছিন্নতার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দেশের ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক ২১ ফেব্রুয়ারি 'ইন্টারন্যাশনাল মাদার্স ল্যাঙ্গুয়েজ ডে', ১ বৈশাখ 'বেঙ্গলি নিউ ইয়ার্স ডে' উদ্‌যাপন কিংবা বড়জোর মাঝেমধ্যে একটি-দুটি বাংলা কনসার্ট আয়োজনেই সীমাবদ্ধ থাকে।

ব্রিটিশরা এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করেছিল তাদের বশংবদ কর্মচারী তৈরির প্রয়োজনে। স্বাধীন ও আধুনিক মানুষ সৃষ্টির জন্য নয়। ঔপনিবেশিক শাসকদের দিক থেকে সেই চাওয়াটা ছিল স্বাভাবিক। লর্ড মেকলে বেশ খোলাখুলিভাবেই ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার এই উদ্দেশ্যটি বয়ান করে গেছেন। অথচ দু-দুবারের পরাধীনতা মুক্তির পরও আমরা এদেশে আজ পর্যন্ত সেই ঔপনিবেশিক শিক্ষাদর্শকেই যেন পরম মমতায় লালন করে চলেছি। ইংরেজ প্রভুর জায়গা আজ হয়তো নিয়েছে আমেরিকানরা। ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষার অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, স্বীকার করতেই হবে, তার মধ্য দিয়েই আধুনিকতা, যুক্তিবাদ ও গণতান্ত্রিক ভাবধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছিল। আমাদের উনিশ ও বিশ শতকের সেরা মানুষগুলো বলতে গেলে সে শিক্ষারই ফল। চলমান বিশ্বের দিকে চোখ মেলে তাকাবার পাশাপাশি, আপন ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতির দিকে ফিরে দেখবার প্রেরণাও তাঁরা সেদিন স্কুল-কলেজের শিক্ষা থেকেই পেয়েছিলেন। তাঁদের সে দেখার মধ্যে অল্পাধিক ভ্রান্তি যে না ছিল, তা নয়। বস্তুত ইতিহাস-ঐতিহ্য, স্বদেশ-সংস্কৃতি সম্পর্কে বাঙলার উনিশ শতকীয় মনীষার সে খণ্ডিত বা সীমাবদ্ধ

www.pathagar.com

দৃষ্টির জের আমরা আজও টেনে চলেছি। আর সেজন্যও অনেকাংশে দায়ী ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রবর্তিত সে শিক্ষাব্যবস্থা। তবু সেদিনের শিক্ষায়ও কোনো না কোনো চেহারায় স্বদেশের একটা উপস্থিতি ছিল। আজ আমাদের শিক্ষার মানচিত্রের এক বড় এলাকা জুড়ে স্বদেশের সেই মুখটিকে ক্রমে নেই করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে আমাদের শিক্ষার্থীরা আজ যতটা প্রযুক্তিবান্ধব, সে তুলনায় তাদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা বাড়ছে না। তারা হয়তো মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিতর্ক করতে শিখছে, কিন্তু তাদের মধ্যে যুক্তিশীলতার বিকাশ ঘটছে না। বিদ্যাবাণিজ্যের কবলে পড়ে মানবিক গুণাবলি স্ফুরণের পথও তাদের জন্য রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই কি তারা আজ ধর্মান্ধতা ও জঙ্গি মতবাদের সহজ লক্ষ্যবস্তু?

২০১৫

www.pathagar.com

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের আন্দোলন

তিপ্পান্ন বছর আগের আরেক সেপ্টেম্বর মাস। সেদিনও ছাত্রবিক্ষোভে উত্তাল হয়েছিল ঢাকা শহর। পরে সে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের অন্যত্রও। আজকের মতো এমনই এক ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখে আন্দোলনরত ছাত্রদের মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণে মোস্তফা ও বাবুল নামে দুজন শ্রমজীবী তরুণ নিহত হন। আহত হয় আড়াই শতাধিক। ছাত্রদের সে আন্দোলন ছিল সামরিক একনায়ক আইয়ুব খানের গঠিত শরিফ কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে। এর কয়েক মাস আগে ঘোষণা দিয়ে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হলেও, দেশে তখনও আইয়ুবি স্বৈরশাসনের বজ্রমুষ্ঠি শিথিল হয় নি। যদিও 'বুনিয়াদি গণতন্ত্র' নামে একধরনের নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র চালু হয়েছে। গঠিত হয়েছে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ। একটি শাসনতন্ত্রও প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতারা তখনও অনেকে জেলে, বাকিদের ওপরও নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে। শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা সেই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছাত্ররাই প্রথম কার্যকরভাবে আইয়ুবি স্বৈরশাসনকে চ্যালেঞ্জ করে। ছাত্রদের সে দুর্বার আন্দোলনের মুখে আইয়ুব সরকার শরিফ কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়। শহীদ মোস্তফা ও বাবুলের সেই আত্মদান এবং ছাত্রদের আন্দোলনের সাফল্যের স্মরণে পরবর্তী সময়ে ১৭ সেপ্টেম্বর দিনটি এদেশে 'শিক্ষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। তো কী ছিল সেদিনের সেই শরিফ কমিশন রিপোর্টে? তার বিরুদ্ধে ছাত্রদের বা অন্যদের আপত্তির কারণই বা কী ছিল? ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার বিষয়টি বাদ দিলে, শরিফ কমিশন রিপোর্টের অন্য প্রধান সুপারিশগুলো ছিল : (এক) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ডিগ্রি পর্যায় পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা, (দুই) ডিগ্রি কোর্স দু-বছরের পরিবর্তে তিন বছর করা, (তিন) বছর শেষে পরীক্ষা নেওয়া ও সেই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী বর্ষে পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া, এবং (চার) অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পরীক্ষার ফলাফল বা প্রাপ্ত নম্বরকে শর্ত গণ্য করা। শুধু

www.pathagar.com

ছাত্ররাই নয়, শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকরাসহ অনেকেই সেদিন এই সুপারিশগুলোকে শিক্ষা সংকোচনের লক্ষ্যে প্রণীত বলে মনে করেছিলেন। তাঁদের অভিমত ছিল, এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা হলে তাতে গরিব বা সাধারণ পরিবারের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ রুদ্ধ হবে। শরিফ কমিশন রিপোর্টে একটি কথা খুব স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল। শিক্ষাকে একটি 'বিনিয়োগ' হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়, তা বিনি পয়সায় বা শস্তায় পাওয়ার জিনিস নয়। এই বক্তব্যটি নিয়ে সেদিন এবং পরবর্তীকালেও বহু বছর আমরা প্রবল আপত্তি তুলেছি। শিক্ষাকে 'বিনিয়োগ' হিসেবে মানতে চাই নি। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি কী? ইংরেজিকে সকল স্তরে বাধ্যতামূলক শুধু নয়, মাতৃভাষা বা জাতীয় ভাষার পরিবর্তে তাকেই এমনকি নিম্নস্তরেও শিক্ষার মাধ্যম করতে আমাদের উৎসাহের অন্ত নেই। আর শিক্ষাকে পণ্য করে তোলার আয়োজনে এদেশে সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রচেষ্টা যেন আজ নিয়োজিত। সম্প্রতি সরকারের তরফে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর ভ্যাট আরোপের চেষ্টায় সে দৃষ্টিভঙ্গিটি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ছাত্র বিক্ষোভের মুখে সরকার শেষ পর্যন্ত পিছু হটেছে বটে। মোস্তফা বা বাবুলের মতো কাউকে প্রাণ দিতেও হয় নি। সেজন্য আমরা সরকারকে নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাব। কিন্তু গত কদিনে অর্থমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কারো বক্তব্যে এমন কিছু কি প্রকাশ পেয়েছে, যা তাঁদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়?

হ্যাঁ, দেশের উন্নতির জন্য অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয় বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। বিশেষ করে আমরা যদি বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্যনির্ভরতা পরিহার করে, যথাসম্ভব স্বনির্ভরতার পথে এই উন্নতি অর্জন করতে চাই। তার জন্য রাজস্ব সংগ্রহের নতুন নতুন খাত সন্ধান করতে হবে, এটাও সত্যি। কিন্তু তা করতে গিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর ভ্যাট বসাতে হবে, এটা জরুরি কিংবা প্রত্যাশিত ছিল না। যখন কিনা নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধিতেও যে কেউ বুঝতে পারে, এই বাড়তি করটা সরকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিলেও, এর বোঝাটা শেষপর্যন্ত গিয়ে চাপবে শিক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবকদের ওপর। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগেপরে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টিউশন ফি বা অন্য কোনো কিছুর নামে এই বাড়তি অর্থটা আদায় করে নেবেই। ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে যেমন তা ক্রেতাদের কাছ থেকেই আদায় করা হয়। বিষয়টা অর্থমন্ত্রী ও অন্যান্য সরকারি নীতিনির্ধারকদের না বোঝার কথা নয়। কিন্তু বুঝেও তাঁরা ছাত্রদের প্রতিবাদের মুখে তাদেরকে নানা রকম স্তোকবাক্য শুনিয়েছেন। একবার বলেছেন, এই ভ্যাট শিক্ষার্থীদের দিতে হবে না, দেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আবার তার পরপরই বলেছেন, প্রথম বছর ছাত্রদের এই কর দিতে হবে না, কিন্তু পরের বছর থেকে দিতে হবে। দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর এই ভ্যাট আরোপের ফলে সরকারের বাড়তি রাজস্ব আয়

www.pathagar.com

হত ৬০ কোটি টাকা। কিন্তু ৬০ কোটি টাকার জন্য দেশকে গত কয়েক দিনে মোট '৬ হাজার কোটি টাকার ঝামেলা' পোহাতে হল। না, এটা আমাদের কথা নয়। কথাটা বলেছেন খোদ সরকারি দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ। দেশে এখন ভোগের ছড়াছড়ি। একশ্রেণির মানুষের হাতে প্রচুর টাকা, তারা সে টাকা খরচের পথ খুঁজে পাচ্ছে না। ভোগে-উপভোগে, বিলাসে-ব্যসনে, আমোদে-প্রমোদে তারা দেশে-বিদেশে এই টাকা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের ভোগবিলাসে ব্যবহৃত পণ্য ও উপকরণ, তাদের বিলাস ও বিনোদনের ওপর আরও বেশি পরিমাণ কর আরোপ করে সরকার তার রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু সরকার সে পথে হাঁটছে না। সরকারি খাতের অপব্যয় ও অপচয় বন্ধের দিকেও তাদের নজর নেই। জনগণের সেবার জন্য যাদের নিয়োগ দেওয়া হয়, জনগণের করের টাকায় যাদের বেতন-ভাতাদি হয়, সেই আমলাদের সুযোগ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশ কিভাবে আরও বৃদ্ধি করা যায়, সেই ভাবনাতেই যেন সরকার ব্যস্ত। জনপ্রতিনিধিরা এদেশে করমুক্ত গাড়ি কেনার সুযোগ পান। পৃথিবীর আর কটি দেশে এমন ব্যবস্থা আছে, আমরা জানি না। সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির পরিকল্পনার কোপ গিয়ে পড়ে শিক্ষার্থীদের ওপর, হলই বা তারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী।

ভ্যাটবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন এক সংবাদ সম্মেলনে অর্থমন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পেলাম, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর এই ভ্যাট আরোপের আগে তিনি নাকি দেশের ৩০টি 'কলেজ' থেকে তথ্য সংগ্রহ করে একটা 'রিসার্চ' করেছেন। তাতে তিনি দেখেছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতিটি শিক্ষার্থী দৈনিক এক হাজার টাকা খরচ করে। 'কলেজে'র তথ্য থেকে তিনি কিভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দৈনিক খরচের হিসাব পেলেন, সে অবশ্য এক বিস্ময়। আমরা ধরে নিচ্ছি, কলেজ বলতে তিনি আসলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কথাই বুঝিয়েছেন। তাঁর বার্ধক্যজনিত এরকম ভুলভাল বা অসতর্ক উক্তির সঙ্গে ইতিমধ্যে আমরা ভালোভাবেই পরিচিত হয়ে উঠেছি। দেশে বর্তমানে নব্বইটির মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এগুলোর মানের তারতম্যের মতো এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক অবস্থা, তাদের পারিবারিক-সামাজিক পটভূমিরও পার্থক্য আছে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারেরও অনেক ছেলেমেয়ে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ না পেয়ে কিংবা অন্য নানা কারণ ও বিবেচনায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। তাদের কতভাগের সপ্তাহে হাজার টাকা হাতখরচের সামর্থ্য আছে? অর্থমন্ত্রী তাঁর গবেষণাকাজের নমুনা-জরিপে কোন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কতজন ছাত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, জানতে পেলে ভালো হত। তারপর তিনি বলেছেন সেই হাজার টাকার ওপর সাড়ে ৭ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করলে শিক্ষার্থীদের মাসে মাত্র ৭৫ টাকা বেশি

www.pathagar.com

খরচ করতে হয়। অর্থাৎ, তিনি বলতে চেয়েছেন, এই মাত্র ৭৫ টাকা নিয়ে হৈচৈ করার কী আছে? কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীকে যদি দিনে হাজার টাকা খরচ করতে হয়, তার জন্যও কে দায়ী? ছাত্ররা নিজেরাই কি? এই টাকার একটা বড় অংশ তাদের ব্যয় হয় যাতায়াত, দুপুরের খাওয়া আর সেই সঙ্গে হয়তো মোবাইল ফোনের পেছনেও। পুরনো ঢাকার যে ছাত্রটি উত্তরা বা বনানীর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, বিকেল বা সন্ধ্যা অবধি যার ক্লাস, সে কি দুপুরে বা বিকেলে খাওয়ার জন্য বাসায় ফিরবে? ক্যাম্পাসের ভেতরেই যদি তার জন্য স্বল্পমূল্যে ক্ষুধা নিবারণের আয়োজন থাকে, সবাই কি রোজ রোজ শখ করে ফাস্টফুডের দোকানে ঢুকবে? শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য কটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিবহনব্যবস্থা আছে? বিকল্প যা আমাদের সেই গণপরিবহনেরই বা কী অবস্থা? একজন ছাত্র বা ছাত্রীর বাসা থেকে ক্যাম্পাসে যাতায়াতে রোজ কত টাকা ব্যয় হয়? তাছাড়া বাসা থেকে বেরুনোর পর অন্তত অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার প্রয়োজনেও, সঙ্গতি থাক বা না থাক, তাদের সবাইকে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে হয়। হ্যাঁ, তার মধ্যে কেউ কেউ হয়তো সত্তর হাজার টাকার সেট ব্যবহার করে, কেউ দু-হাজার টাকার। অর্থমন্ত্রীর জরিপে এই বিষয়গুলো কিভাবে এসেছে আমরা জানি না। তিনিও এর ব্যাখ্যা দেন নি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরও কতভাগ ছাত্রছাত্রী তাদের পড়ার খরচ মেটাতে প্রাইভেট টিউশনি বা অন্য পার্টটাইম জব করে, অর্থমন্ত্রীর 'গবেষণা'য় তার তথ্য ছিল কি?

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের ভ্যাটবিরোধী আন্দোলনের সময় দেশের সব শ্রেণি ও পেশার মানুষের সমর্থন ও সহানুভূতি পেয়েছে। তাদের কদিনের সড়ক অবরোধ কর্মসূচি যে-অজস্র মানুষের কষ্ট বা দুর্ভোগের কারণ ঘটিয়েছে, তারাও কেউ কিন্তু তাদের আন্দোলনের বিরোধিতা করে নি। বরং তার যৌক্তিকতা স্বীকার করে মত দিয়েছে যে সরকারের উচিত হবে অবিলম্বে ছাত্রছাত্রীদের দাবি মেনে নেওয়া। বলা বাহুল্য জনমতের এই চাপও একটি বড় কারণ, যার ফলে সরকার অতি দ্রুত তাদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। যাদের সন্তানসন্ততি এমনকি নিকট আত্মীয়পরিজনেরও কেউ হয়তো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে না, অদূর ভবিষ্যতেও পড়বে এমন সম্ভাবনা নেই, সেই সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষও তাদের আন্দোলনের জন্য কমবেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে। মোটকথা কেবল তাদের অভিভাবকদের নয়, দেশের সব মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ছিল বলেই তাদের আন্দোলন সফল হয়েছে। এই সত্যটা যেন তারা উপলব্ধি করে ও ভবিষ্যতে মনে রাখে। এই সব মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ বিস্মৃত না হয়। সাধারণভাবে মনে করা হয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়াশুনা করে তারা যে শুধু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকে তা-ই নয়। দেশ ও দেশবাসীর সমস্যা-সঙ্কট, নিত্যদিনের

www.pathagar.com

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাও তাদের কমই স্পর্শ করে, কিংবা তারা তা থেকে মুক্ত থাকতে চেষ্টা করে। তাদের শিক্ষাক্রম, শিক্ষাঙ্গন ও ক্লাসের পরিবেশ ইত্যাদি সবই এই বিচ্ছিন্নতার পৃষ্ঠপোষকতা করে। কিংবা বলা যায়, সে লক্ষ্যেই তা পরিকল্পিত হয়। তাদের অভিভাবকরাও যেন কমবেশি এমনটাই চান। এ-ও বলা হয়, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর মতো এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মনোরাজ্যে যতটা না স্বদেশ তার চেয়ে বেশি বিরাজ করে বিদেশ। ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে তাদের ক্ষেত্রে এই উপনিবেশীকরণের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর মতো এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরও অনেকে রসিকতা করে 'ফার্মের মুরগি'র সঙ্গে তুলনা করেন। সে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেই হয়তো ভ্যাটবিরোধী আন্দোলন চলাকালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীকে টিভি ক্যামেরার সামনে তারস্বরে ঘোষণা করতে দেখলাম, 'সবাই দেখুক, আমরা ফার্মের মুরগি নই'। আমরা আশা করব, এই আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে হলেও, তারা আগামীতে সেটা প্রমাণ করবে। তারা এই দেশের, এই মাটির সন্তান; এই দেশের ভালোমন্দের সঙ্গে, দেশবাসীর ভাগ্যের সঙ্গে তাদের স্বার্থ জড়িত; সে কথাটা মনে রাখবে। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী এবং তাদের সুবাদে কিংবা হয়তো অন্যভাবে তাদের অভিভাবকরা যদি বা ভবিষ্যতে স্থায়ীভাবে বিদেশে পাড়ি জমাবার স্বপ্ন দেখেনও, অনেকেই হয়তো তা দেখেন না। কিংবা দেখলেও সবার বেলায় সে স্বপ্ন পূরণ হওয়ার নয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মাধ্যম ব্যতিক্রমহীনভাবে ইংরেজি। কী কারণে ইংরেজি, তা আমরা জানি। এখানে এ নিয়ে যুক্তিতর্কের কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাদের সাম্প্রতিক আন্দোলনে সরকার এবং সেই সঙ্গে গণমাধ্যম ও দেশবাসীর উদ্দেশেই তাদের দাবি ও বক্তব্য তুলে ধরেছে। বিদেশীদের জন্য নয়। তবু কেন তাদের অধিকাংশ পোস্টারের ভাষা ইংরেজি ছিল, যুক্তিসঙ্গতভাবেই সে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। কোনো কোনো পোস্টারের বক্তব্য নিয়েও সামাজিক মাধ্যমে প্রশ্ন বা বিতর্ক সৃষ্টি হয়। আন্দোলন আরও কদিন স্থায়ী হলে যা বিভ্রান্তি ও বিরোধের কারণ ঘটাতে পারত। এ প্রসঙ্গেই দেশের সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় এবং পরিবেশগত বাস্তবতা ও সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার প্রশ্নটি এসে পড়ে।

আমরা মোটেও চাইব না বর্তমানে দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে ছাত্ররাজনীতির নামে অনেক ক্ষেত্রে যে সন্ত্রাস ও দুর্বৃত্তায়নের চর্চা হচ্ছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও তা সংক্রমিত হোক। তবে নিশ্চয় চাইব যে সেখানকার শিক্ষার্থীরা যথার্থ দেশপ্রেমিক ও রাজনীতি-সচেতন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠুক। স্বদেশের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠ যোগ রেখেই তারা বিশ্বনাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলুক। দেশ ও

www.pathagar.com

দেশের মানুষের যে-কোনো বিপদে-আপদে, প্রাকৃতিক ও মানবিক দুর্যোগে তারা এগিয়ে আসুক। নিজেদের শিক্ষাব্যয়ের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানোর বিরুদ্ধে তারা যেভাবে প্রতিবাদী ভূমিকা নিল, দেশ ও সমাজের আর পাঁচটা অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধেও সেভাবেই সোচ্চার হোক। তবে তা যেন হয় নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে—ভাঙচুর, অরাজকতা, সহিংসতা বা জনজীবনের দুর্ভোগ সৃষ্টির পথ পরিহার করে। সাম্প্রতিক ভ্যাটবিরোধী আন্দোলনের প্রথম দিনের কর্মসূচির পর আন্দোলনকারীদের মুখপাত্ররা কেউ কেউ বলেছিল, পরদিন থেকে সড়ক অবরোধের পরিবর্তে তারা নিজ নিজ ক্যাম্পাসের ভেতরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে। তাদের সে ঘোষণাটি সে সময় সবারই প্রশংসা অর্জন করেছিল। সাময়িকভাবে হলেও নগরবাসী তাতে আশ্বস্ত বোধ করেছিল। যদিও পরদিন তাদের সে ঘোষণার কার্যকারিতা সেভাবে লক্ষ করা যায় নি। একদিকে সরকারের তরফে ইতিবাচক সাড়ার অভাব, নানা রকম বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা এবং অন্যদিকে আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদেরও কোনো সংগঠন বা সে অর্থে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব না থাকার ফলেই হয়তো এমনটা হয়েছে। তারপরও দু-একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাদের ক্যাম্পাসের ভেতরে বা সামনেই জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে বলে আমরা শুনেছি। অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তো ক্যাম্পাস বলেই কিছু নেই। সেসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের রাস্তায় নামা ছাড়া আর কী-ই বা উপায় ছিল? সবকিছুর পরও ভ্যাটবিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা গত কদিনে যে সংযম ও বিবেচনাবোধের পরিচয় দিয়েছে তা প্রশংসাযোগ্য। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী এবং সমাজের বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণির মানুষ আগামীতে তাদের ন্যায্য দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করার সময় তাদের সে দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে অনুরূপ বিবেচনাবোধের পরিচয় দেবেন বলে আমরা আশা করি। শিক্ষার্থীদের ভ্যাটবিরোধী আন্দোলন শুরুর একদিন কি দুদিনের মাথায় দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাদের ছাত্রছাত্রীদের ভ্যাটের কারণে বাড়তি ফিস দিতে হবে না বলে ঘোষণা দেয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পরে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এমনও নিশ্চয়তা দেন যে আগামী তিন বছরেও তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের বাড়তি কোনো ফিস দিতে হবে না। একথা জানিয়ে তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে ফিরে যাওয়ার ও লেখাপড়ায় মন দেওয়ার আহ্বান জানান। এমনিতে মনে করা হয়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়াশুনা করে সেসব ছেলেমেয়েরা সাধারণত আত্মকেন্দ্রিক হয়। নিজের ভালোটাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। পরিবেশই তাদেরকে সেভাবে তৈরি করে। কিন্তু দেখা গেল উপাচার্যের আহ্বানের পরও ওই বিশ্ববিদ্যালয়টির বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী ক্লাসে ফিরে যায় নি। তার মানে আন্দোলনে নেমে তারা বুঝেছে,

www.pathagar.com

মানের তারতম্য সত্ত্বেও অন্য সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের স্বার্থ জড়িত। বুঝেছে বিচ্ছিন্নতায় নয়, ঐক্যেই জয়।

শিক্ষার্থীদের ভ্যাটবিরোধী আন্দোলন চলাকালীন কয়েক দিনে অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে দেওয়া তাঁর নানা রকম উল্টোপাল্টা বক্তব্যের মধ্যে একবার এমন কথাও বলেছেন, ভবিষ্যতে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যাতে তাদের ওপর অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপাতে না পারে, সে ব্যাপারে তাদের সতর্ক থাকতে হবে। তার মানে কি তেমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে ছাত্রদের আবারও রাস্তায় নামতে হবে, বিক্ষোভ দেখাতে হবে? অর্থাৎ খোদ অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ীই তাদের আন্দোলন-সংগ্রামের প্রয়োজন ফুরোচ্ছে না। ভ্যাট না হয় প্রত্যাহৃত হল, কিন্তু আমরা তো জানি, আমাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় এমনিতেই অনেক অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা এমনকি দুর্নীতি বিরাজ করছে। যার শিকার সেখানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা। এমনিতেও কয়েকটি ছাড়া বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান নিয়ে বরাবরই প্রশ্ন আছে। সেগুলোকে এককথায় সনদ বিক্রির দোকান বললেও অন্যায় হবে না। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস বলে কিছু নেই। কোনো রকমে একটা বাড়ি ভাড়া করে কিংবা কোনো বিপণিকেন্দ্রের দু-একটি ফ্লোর বা একাংশ নিয়ে তারা একটি বিদ্যাবিপণি বা সার্টিফিকেট সেলস সেন্টার খুলে বসেছে। ইউজিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকারের বলতে গেলে কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই তাদের ওপর। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মালিকরা অনেকেই মূলত ব্যবসায়ী। তাঁদের আর পাঁচটা ব্যবসার মতো এটাও একটা ব্যবসা। তবে অন্য ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁরা সরকারি নিয়মরীতি যেটুকুও মেনে চলেন, এক্ষেত্রে তার সামান্যও ধার ধারেন না। বলা যায় সরকারি নিয়ম-নির্দেশের তারা অল্পই তোয়াক্কা করেন। এ পর্যন্ত নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া সরকারি নির্দেশ পালনসহ নানা ব্যাপারে যা লক্ষ করা গেছে। বারবার সময় বাড়িয়েও সরকার তার এই নির্দেশ বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই আজ পর্যন্ত কার্যকর করতে পারে নি। অননুমোদিত ক্যাম্পাস বন্ধ করার সরকারি নির্দেশও কি পুরোপুরি পালিত হয়েছে এ যাবত? ছাত্রছাত্রীদের কাছে ভর্তি, টিউশন ফি ও অন্যান্য খাতে যে অর্থ আদায় করা হয়, তারও কি যুক্তিসঙ্গত ও অভিন্ন হার আছে? তবে কি এসব অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা দূর করে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে আগামীতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সরব ও সোচ্চার হতে হবে? এ ব্যাপারে সরকারের ব্যর্থতা বা অসহায়ত্বের পটভূমিতে স্বভাবতই এ প্রশ্নটা ওঠে।

২০১৫

www.pathagar.com

শিক্ষকের মর্যাদার জন্য যা জরুরি

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ কদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে গিয়ে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন। দু-একটা টিভি চ্যানেলের সংবাদে কথাগুলো তাঁর স্বকণ্ঠেই শুনেছি, কিন্তু পত্রিকায় খবরটা দেখেছি বলে মনে পড়ে না। হয়তো কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, আমার চোখে পড়ে নি। ফলে এখানে স্মৃতি থেকেই তাঁর বক্তব্য কিংবা সে বক্তব্যের মূল অংশটুকু উদ্ধৃত করতে হচ্ছে। সিলেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ওপর কিছু ছাত্রের হামলার ঘটনায় তিনি তাঁর বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, তাঁদের সময়ে, অর্থাৎ তাঁরা যখন ছাত্র ছিলেন, এমনটা কল্পনাই করা যেত না। ওই বক্তব্যের সূত্র ধরেই তিনি আরেকটা কথাও বলেছেন, আগে ফার্স্টক্লাস না পেলে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারতেন না। অর্থাৎ তিনি বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষকতায় নিয়োজিত আছেন, তাঁদের বা তাঁদের এক উল্লেখযোগ্য অংশের যোগ্যতা বা মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। রাজনৈতিক বা আসলে দলীয় প্রভাবে কিংবা তদবিরের জোরে যে বর্তমানে শিক্ষক নিয়োগ হয় সে বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন, এমন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনাই ঘটতে পারে, ঘটা স্বাভাবিক। জনাব তোফায়েল আহমেদ একসময় ছাত্ররাজনীতি করতেন। সে সময়ের বা তাঁর পূর্বসূরি অনেকের মতো তিনি ছাত্ররাজনীতির পথ বেয়েই জাতীয় রাজনীতিতে এসেছেন। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানকালে তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সহসভাপতি। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দশ নেতার একজন। ডাকসুর ভিপি হিসেবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিভিন্ন সভায় সাধারণত তিনিই সভাপতিত্ব করতেন। পরবর্তীকালে তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়নে তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সবচেয়ে বয়োকনিষ্ঠ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। কয়েক দফায় মন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণিল রাজনৈতিক জীবনে, কি গৌরবময়তার দিক থেকে কি ঐতিহাসিক তাৎপর্যে, ১৯৬০ দশকের সেই

www.pathagar.com

ছাত্ররাজনীতির দিনগুলোর চেয়ে উজ্জ্বল সময় আর এসেছে বলে মনে হয় না। ফলে তিনি আজকের শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতি ও ছাত্ররাজনীতির অবস্থার সঙ্গে তাঁর দেখা সেই দিনগুলোর তুলনা করে হতাশ ও ক্ষুব্ধ হবেন, এটা খুব স্বাভাবিক। তিনি নিজে একদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলেন, তার অনুষ্ঠানে এসে তিনি সে ক্ষোভই প্রকাশ করেছেন।

স্বাধীনতাপূর্ব সেই সময়টাতে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে কি বিবাদ-বিসংবাদ ছিল না? মারামারি বা সংঘর্ষ কি একেবারেই হত না? দু-চারটা প্রাণহানির ঘটনাও কি ঘটেনি? কিন্তু সে সব ঘটনার নিন্দায় সেদিন কি শিক্ষাঙ্গনে কি তার বাইরে দলমত-নির্বিশেষে সবাই সোচ্চার হয়েছে। বিবদমান পক্ষগুলো হয়তো ঘটনার জন্য পরস্পরকে দোষারোপ করে বক্তব্য-বিবৃতি দিয়েছে। কিন্তু যার যার মতো করে সবাই দোষীর শাস্তি দাবি করেছে। শিক্ষাঙ্গনে এমন ঘটনাকে বাঞ্ছনীয় মনে করে নি। কিংবা তার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতে চেষ্টা করে নি। শিক্ষকদের অনেকে হয়তো তখনও কমবেশি রাজনৈতিক মত পোষণ করতেন, কেউ কেউ গোপনে বা প্রকাশ্যে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগও রাখতেন। দলের জন্য হয়তো কাজও করতেন। বিভিন্ন সময় দু-একজন নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন, আইন পরিষদের সদস্য এমনকি মন্ত্রীও হয়েছেন। কিন্তু যতটা সময় শিক্ষাঙ্গনে থেকেছেন, কিংবা যখন সেখানে ফিরে এসেছেন, তাঁরা শিক্ষকের মতোই আচরণ করেছেন। শ্রেণিকক্ষে বা বাইরে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আচরণে তাঁদের দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি বা আনুগত্যের তেমন প্রকাশ ঘটত না। কারণ তাঁরা জানতেন তাঁদের প্রথম ও প্রধান পরিচয় তাঁরা শিক্ষক, আর ছাত্রছাত্রীরা যে যে-দলই করুক না কেন, সবাই তাঁদের চোখে সমান। জানতেন যে শিক্ষক হিসেবে তাঁদের একটিই কর্তব্য, তা হল ছাত্রদের বিদ্যাদান করা, তাদের জ্ঞানচর্চায় আগ্রহী করে তোলা। সেখানে কোনো ত্রুটি ঘটলে তিনি যে আর শিক্ষক নামের যোগ্য থাকেন না, সেটাও জানতেন। ফলে দলমত-নির্বিশেষে ছাত্রছাত্রীরা সেদিন শিক্ষকদের সম্মানের চোখে দেখতেন। বাবা-মার পরেই গুরুজনের আসনে বসাতেন তাঁদের। শিক্ষকদের চোখেও ছাত্রছাত্রীরা ছিল সন্তানতুল্য। আজ বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বা স্কুল, মোটকথা শিক্ষার কোনো পর্যায়েই কি শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে সেই স্নেহ-শ্রদ্ধার সম্পর্কটা আছে? কতটা আছে? কেন নেই? পরিবর্তিত এই পরিস্থিতির জন্য কারা দায়ী? কিংবা হঠাৎ করে বা দু-এক বছরে কি এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে? আমাদের ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে কি ব্যাপারটা ঘটেছে? কেবল ছাত্ররা এর জন্য দায়ী? শিক্ষকরা? ছাত্র-শিক্ষক উভয়েই? সমাজের আর কারো কোনো দায়দায়িত্ব নেই? যাঁরা সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিচালনা করেন, যাঁরা এ ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ করেন, তাঁদের কোনো ভূমিকা নেই? কোনো করণীয় নেই?

www.pathagar.com

স্বাধীনতাপূর্ব আমলের প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণেই ফিরে আসি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিদেশী অধ্যাপক পল নিউম্যান কিংবা পরবর্তী সময়ে উপাচার্য হিসেবে ড. ওসমান গনির ভূমিকা যদি আমরা মনে রাখি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশদূষণে সেদিন তাঁরা একটা বড় ভূমিকা রেখেছিলেন। কিন্তু সেদিনও তাঁদের মতো শিক্ষকের সংখ্যা অল্পই ছিল। সরকারের সমর্থক ছিলেন এমন শিক্ষকরাও সবাই সরকারের তল্পিবাহকের ভূমিকা নিতেন না। প্রকাশ্যে তো নয়ই। কারণ তাঁরা জানতেন ওটা তাঁদের শিক্ষক পরিচয়ের সঙ্গে মানানসই নয়। অর্থনীতির অধ্যাপক ড. আবু মাহমুদের করা মামলায় হাইকোর্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রায় দিলে, তখনকার সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন এনএসএফ অধ্যাপক মাহমুদের ওপর হামলা চালিয়ে তাঁকে আহত করে। সেদিন সে ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকসমাজ তথা সারা দেশের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। গণরোষ থেকে বাঁচতে হামলাকারীরা ক্যাম্পাস ছেড়ে একেবারে গভর্নর হাউসে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি মদদপুষ্ট এনএসএফ সংগঠনটির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন খোদ উপাচার্য ড. ওসমান গনি। তাঁর এই ভূমিকার জন্য তিনি ধিক্কৃত ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর মোনায়েম খানের আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন তিনি। সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান ছাত্র বিক্ষোভ মোকাবেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতেই মোনায়েম খান তাঁকে উপাচার্য নিয়োগ করেছিলেন। সে সময় আজকের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ছিল না। ভোটের মাধ্যমে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচিত হত না। সরকার বা চ্যান্সেলর হিসেবে গভর্নর যাকে খুশি তাঁকে উপাচার্য পদে নিয়োগ করতে পারতেন। মোনায়েম খান ড. ওসমান গনিকেই ওই পদের জন্য পছন্দ করেছিলেন। তবে ওসমান গনি তাঁর নিজ যোগ্যতায়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছিলেন। ছাত্র হিসেবে ছিলেন অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের অধিকারী। এমএসসিতে প্রথম শ্রেণি পেয়েছিলেন, ইংল্যান্ড থেকে কৃষি রসায়নে পিএইচডি করে এসেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার আগে তিনি ছিলেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তারও আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্ট ইত্যাদি পদে তিনি মোটামুটি সুনামের সঙ্গেই তাঁর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বিদ্যাবত্তা ও গবেষণাকর্মের জন্যও তাঁর খ্যাতি ছিল। সুতরাং বলা যাবে না, উপাচার্য পদের যোগ্য না হয়েও শুধু দলীয় বিবেচনায় বা তদবিরের জোরে তিনি উপাচার্য হয়েছিলেন। বরং শিক্ষক হিসেবে তাঁর যে সুখ্যাতি ও সম্মান, উপাচার্য পদে বসার পর তা তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তারপরও ড. আনিসুজ্জামানের স্মৃতিকথা থেকে আমরা জানতে পারি, উপাচার্য হিসেবে তাঁর কর্মকালে তিনি নাকি মাত্র একবারই হয়তো কোনো সভায় যোগ দিতে সচিবালয়ে

www.pathagar.com

গিয়েছিলেন। আজকের দিনে দেশের কোনো উপাচার্য সম্পর্কে কি এমন কথা বলা যায়? সচিব তো সচিব, নানা প্রয়োজনে তাঁদেরকে হয়তো উপসচিব এমনকি সহকারী সচিবের টেবিলেও ধরনা দিতে হয়। দেশের স্বাধীনতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন লাভের সুফল কি এটা?

আজ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা সরকার-ঘোষিত নতুন বেতনকাঠামোয় তাঁদের প্রতি বৈষম্যের প্রতিবাদে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতনকাঠামো গঠনের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। ইতিমধ্যে এই দাবিতে সারা দেশের সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এক দিনের কর্মবিরতি পালন করেছেন। সামনে অনুরূপ আরও কর্মসূচি আছে তাঁদের। শিক্ষকদের দাবির মুখে সরকার অবশ্য মন্ত্রিসভা কমিটিতে তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র বেতনকাঠামো গঠনের বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু বিষয়টা তো কেবল বেতনের নয়, মর্যাদারও। গত রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ফেডারেশনের সভাপতি জানিয়েছেন, তাঁদের দাবিদাওয়ার ব্যাপারটি তুলে ধরার জন্য গত তিন মাস ধরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি এজন্য সরকারের ভেতরের 'কিছু লোক'কে দায়ী করেছেন, যারা 'শান্ত' বিশ্ববিদ্যালয়কে অশান্ত করতে আর সরকারকে বিপদে ফেলতে 'প্রধানমন্ত্রীকে ভুল পথে পরিচালিত' করছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতির উক্ত বক্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর ইতিমধ্যে কয়েকদিন অতিবাহিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ পাওয়ার সম্ভাবনাটি কতদূর এগিয়েছে আমাদের জানা নেই। তবে তাঁদের আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণার কারণেই হয়তো মন্ত্রিসভার বৈঠকে জাতীয় বেতন স্কেল অনুমোদনের সময় তাঁদের বিষয়টি আলাদাভাবে 'খতিয়ে দেখা'র কথা বলা হয়েছে। যদিও একদিন পরই আবার শিক্ষকদের 'জ্ঞানের অভাবে'র কথা বলে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তুলেছেন।

কেবল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরাই যে তাঁদের বেতন ও মর্যাদার দাবিতে আন্দোলনে নামার কথা বলেছেন, তা-ই নয়। সরকারি ও বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকরাও প্রায় একইরকম দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের একটি সমিতিও সরকার তাঁদের পদমর্যাদা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। মোটকথা শিক্ষকসমাজের এসব দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে দেশের পুরো শিক্ষাঙ্গনে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সামনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে। এমন একটা অবস্থায় সরকারের অত্যন্ত

www.pathagar.com

সতর্কতার সঙ্গে ও গুরুত্ব দিয়েই সমস্যা সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সমিতির নেতৃত্ব সরকার-সমর্থকদের হাতেই আছে। সুতরাং বলা যাবে না বিরোধী দল বিষয়টিকে নিয়ে জল ঘোলা করার চেষ্টা করছে।

তোফায়েল আহমেদ কয়েকদিন আগে যে কথা বলেছেন, তারপর দুদিন আগে অর্থমন্ত্রী শিক্ষকদের 'জ্ঞানের অভাবে'র কথা বলতে গিয়ে সম্ভবত যে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা পেশায় জ্ঞানী লোকের অভাবের কথাটি হয়তো একটি বাস্তবতা। কিন্তু এই বাস্তবতা তৈরির ব্যাপারেও মূল দায়টা রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপরই বর্তায়। অর্থমন্ত্রী মুহিত নিজেও একসময় কিছুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। তখন কোন যোগ্যতায় শিক্ষক নিয়োগ পেত, কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কলেজের অধ্যক্ষ কিংবা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হতেন, নিশ্চয় তাঁর জানা আছে। সমাজ বা প্রশাসন তাঁদের কী চোখে দেখত? সেদিনের উপাচার্য, অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষকের মতো দু-চারজনও কি আজ সারা দেশ ঢুঁড়ে পাওয়া যাবে? তার মানে কি ওই যোগ্যতার লোক আজ দেশে নেই? নাকি তাঁরা ওই পদে বসার সুযোগ পান না? বেসরকারিগুলোর কথা বাদ দিলেও, আমাদের দেশে আজ সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত মিলিয়ে এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়! তার মধ্যে কটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কজন উপাচার্যের পণ্ডিত হিসেবে কিংবা নিজস্ব ক্ষেত্রে বিদ্যাবত্তা বা গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিতি আছে? বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যদের কাজ কি প্রতিদিন টিভি টকশোতে এসে সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রসঙ্গে সরকারদলীয় মুখপাত্রের মতো বক্তব্য রাখা? তর্কযুদ্ধ করা? তারপরও এই যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা বর্তমানে তাঁদের বেতন ও মর্যাদার দাবিতে আন্দোলন করছেন, কোনোদিন কোনো টকশোতে তো দেখলাম না কোনো ভিসিকে এ নিয়ে কোনো কথা বলতে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষা পরিকল্পনা কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো বিষয় নিয়েও কোনো টকশো বা গোলটেবিলে তাঁদেরকে কখনো বক্তব্য রাখতে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। যিনি যে-বিষয়েরই শিক্ষক হন, তাঁরা সবাই যেন একেকজন রাজনীতিবিশারদ! দেশে এত এত সাংবাদিক, রাজনীতিক থাকতে টিভি চ্যানেলগুলোকেই বা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যদের দৈনন্দিন রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে আর খবরের কাগজের সংবাদ পর্যালোচনা করতে ডেকে আনতে হয় কেন, বোঝা মুশকিল। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে কি এমনটা দেখা যায়?

বলা বাহুল্য, আগামীতে শিক্ষকতা পেশায় যোগ্য ও মেধাবী তরুণদের আকৃষ্ট করতে হলে এই পেশার মর্যাদা বৃদ্ধির কথা সবার আগে ভাবতে হবে। আর তার জন্য শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়। তাঁদের প্রতি রাষ্ট্র ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি

www.pathagar.com

বদলাতে হবে। খুদকুঁড়ো খেয়ে শিক্ষকরা আমাদের সন্তানদের বিদ্যাদানের মহান কর্তব্য পালন করে যাবেন, আজকের দিনে এমনটা আশা করা যায় না। কেউ বোধহয় আর তেমন আশা করেনও না। একজন শিক্ষক যাতে সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারেন, রাষ্ট্রকে তা নিশ্চিত করতে হবে। সেই সঙ্গে একজন শিক্ষকের জন্য স্বাধীন চিন্তাচর্চার সুযোগটাও দরকারি। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাও যদি নিজেদের যতটা না শিক্ষক, তার চেয়ে বেশি আমলা বা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে ভাবতে অভ্যস্ত হন, তবে সেই পরিবেশে প্রকৃত জ্ঞানচর্চা ও মানুষ তৈরির কাজটি ব্যাহত হতে বাধ্য। দলানুগত্য ও তোষামোদ পটুত্বের বদলে বিদ্যানুরাগ ও গবেষণা প্রবৃত্তিকেই শিক্ষক, এমনকি শিক্ষা প্রশাসকের জন্যও মূল যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। অন্য দেশের উদাহরণের প্রয়োজন নেই, আমাদের দেশেই অতীতে যাঁরা শিক্ষকতায় কিংবা ভিসি, ডিপিআই ও শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের মতো পদগুলোতে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁদের অনেকের কথা স্মরণ করলেই আমরা কথাটার তাৎপর্য বুঝতে পারব। অন্যদিকে শিক্ষকদেরও স্বতন্ত্র বেতনকাঠামো ও বিশেষ মর্যাদা দাবির পাশাপাশি তাঁদের পেশার স্বাতন্ত্র্যের কথাটা মনে রাখতে হবে। একজন শিক্ষক বা চিকিৎসকের পেশার সঙ্গে নিশ্চয় সমাজের আর পাঁচটা পেশার তুলনা চলে না। দায়িত্বশীলতার বিষয়টি সব পেশার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে শিক্ষকতার সঙ্গে 'ব্রত' শব্দটির একটি যোগ সবকালেই ছিল, আর আজও তা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে মনে করার কারণ নেই। ফলে একজন শিক্ষক যদি তাঁর আত্মীয় বা প্রতিবেশী কোনো ব্যবসায়ী, শুল্ক কর্মকর্তা, আমলা বা পুলিশ অফিসারের সঙ্গে নিজের অর্থবিত্ত বা প্রভাব-প্রতিপত্তির তুলনা করেন, তবে হীনম্মন্যতা তাঁকে আগেপরে গ্রাস করবেই। সেক্ষেত্রে পেশা ত্যাগ করতে না পারলে তাঁকে তাঁর 'দুরবস্থা' থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে হবে ক্লাসে পাঠদানকে গৌণ করে তুলে প্রাইভেট কোচিং, নোট-গাইড লেখা, প্রজেক্ট, কনসালটেন্সি ইত্যাদির মাধ্যমে। আমাদের শীর্ষ আমলাদের অনেকেই একসময় ছাত্রজীবন শেষে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কলেজ শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা ছিল তাঁদের সাময়িক অবলম্বন। আগ্রহের অভাবেই হোক কিংবা অধিক মানমর্যাদা বা প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা থেকে তাঁদের অনেকেই পরে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে আমলা জীবন বেছে নিয়েছেন। কেউ কেউ ব্যবসায়ী হয়েছেন। বস্তুত প্রশাসন বা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে এমন আমলা বা সাবেক আমলারাই পরে শিক্ষকতা পেশার মর্যাদা অবনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। হয়তো আজও রেখে চলেছেন।

২০১৫

www.pathagar.com

অধ্যাপক জাফর ইকবালকে প্রশ্ন

সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর একদল ছাত্রলীগ-কর্মীর হামলার ঘটনায় অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল যুগপৎ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাঁর এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার দুটি কারণ তাঁর বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পেরেছি। এক. ছাত্ররা হামলা করেছে শিক্ষকদের ওপর। দুই. হামলার সময় তারা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে-'জয় বাংলা' আমাদের রণধ্বনি ছিল। ঘটনার পর বৃষ্টির মধ্যে একাকী বসে থেকে তিনি এ ব্যাপারে তাঁর ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আমরা তাঁর সে প্রতিবাদের ধরনটির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যদিও তাঁর বিস্ময়ের কারণটি আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। এখানে সে সম্পর্কেই দু-একটা কথা বলতে চাই।

দু-দল ছাত্র যখন কোনো কিছুকে কেন্দ্র করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা বাইরে পরস্পর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে সেটা এক কথা। কিন্তু কিছু ছাত্র যখন দল বেঁধে কাউকে আক্রমণ করে, পিটিয়ে বা গুলি করে আহত বা নিহত করে, কিংবা অন্য দলের শান্তিপূর্ণ সমাবেশের ওপর লাঠিসোঁটা বা অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়, তখন সেটা অন্য ব্যাপার। শেষোক্ত ক্ষেত্রে যারা তা করে তাদেরকে কি আমরা ছাত্র নাকি ছাত্রনামধারী দুষ্কৃতকারী বা গুন্ডা বলব? এমন ঘটনা তো দেশে আকছারই ঘটছে। এভাবে যারা অন্য দলের, এমনকি নিজ দলেরই অন্য গ্রুপের কর্মীদের ওপর হামলা চালাতে পারে, সাধারণ নিরীহ ছাত্রও শুধু তাদের মিছিলে যোগ দিতে রাজি না হওয়ায় যাদের প্রতিহিংসার শিকার হয়, দুদিন আগে বা পরে তারা যে শিক্ষকদের ওপর চড়াও হবে, তাদের গায়ে হাত তুলবে, তাতে অস্বাভাবিকতা বা আশ্চর্যের কী আছে? বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষকের ওপর হামলার এমন ঘটনা কি দেশে আগেও ঘটে নি? ছাত্রলীগ বা অন্য আমলে ছাত্রদলের নামে? রাজনৈতিক নেতৃত্বের পৃষ্ঠপোষকতা, অন্তত প্রচ্ছন্ন সায় ছাড়া কি দিনের পর দিন এসব ঘটনা ঘটতে পারে?

এবার দ্বিতীয় বিষয়টিতে আসি। 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর হামলার ঘটনা কি দেশে এই প্রথম ঘটল? স্বাধীনতার আগে ও পরে আর কখনো ঘটে নি? সাম্প্রতিককালেও শাহবাগ গণজাগরণ মঞ্চে হামলার ঘটনার সময় কি

www.pathagar.com

ছাত্রলীগের একদল কর্মী এই স্লোগান ব্যবহার করে নি? অধ্যাপক ইকবাল কি সেটা জানেন না? দোষ কি স্লোগানের? নাকি কোনো স্লোগান আওড়ালেই কেউ পূত-পবিত্র হয়ে যায়? আমাদের পূর্বপুরুষরা কি একদা ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতাসংগ্রাম কিংবা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে 'বন্দেমাতরম' বা 'নারায়ে তকবির, আল্লাহু আকবর' স্লোগান দেন নি? আবার দাঙ্গার সময় সেই একই স্লোগান দিয়ে কি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাবাজরা ভিন্নধর্মীদের হত্যা করে নি? আজ জঙ্গিরা কি 'আল্লাহু আকবর' স্লোগান দিয়েই দেশে-বিদেশে মানুষ হত্যা করছে না? শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর হামলাকারী যুবকরা ভিসির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত শিক্ষকদের তাদের প্রতিপক্ষ মনে করেছে। ভিসির অপসারণ দাবিতে শিক্ষকদের একাংশের আন্দোলনকে তাদের স্বার্থবিরোধী বিবেচনা করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার চেয়ে স্বার্থচেতনার গুরুত্ব তাদের কাছে অনেক বেশি। শিক্ষকদের অনেকের বেলায়ও নিশ্চয় কথাটা সত্যি।

উপাচার্য ও তাঁর সমর্থক শিক্ষকদের পক্ষে আমাদের কিছুই বলবার নেই। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা ও সেদিন ক্যাম্পাসে যে ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে, অন্তত তার দায় নিয়েই ভিসির অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত। কিন্তু অধ্যাপক জাফর ইকবালের ভাবাবেগের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও বিনীতভাবে তাঁকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। ভিসি বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দুর্নীতির বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে ন্যায়নিষ্ঠ শিক্ষকরা আন্দোলন করতেই পারেন। কিন্তু তার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাম জড়ানো কেন? দেখা যাচ্ছে, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষক আজ 'মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকবৃন্দ' ব্যানার নিয়ে উপাচার্যের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও তাঁর অপসারণের দাবিতে আন্দোলন করছেন। উল্টো দিকে আরেক দল শিক্ষক আবার 'মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মুক্তচিন্তা চর্চায় ঐক্যবদ্ধ শিক্ষকবৃন্দ' ব্যানারে উপাচার্যের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। অর্থাৎ সেরের ওপর সোয়া-সেরের মতো তাঁরা 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র সঙ্গে 'মুক্তচিন্তা'র স্লোগানটিও যুক্ত করেছেন। তার মানে কি অধ্যাপক জাফর ইকবালসহ শিক্ষকদের অন্য গ্রুপটি যাঁরা তাঁদের সঙ্গে নেই, তাঁরা মুক্তচিন্তার বিরোধী? স্পষ্টতই হামলাকারী যুবকদের প্রতি ভিসি ছাড়াও এই 'মুক্তচিন্তা চর্চাকারী' গ্রুপটির ইন্ধন বা প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় ছিল। 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' কথাটার এই অপব্যবহার, রাজনীতিকদের মতো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদেরও দলীয় বা গোষ্ঠীস্বার্থে মুক্তিযুদ্ধের নাম ব্যবহার কি অধ্যাপক জাফর ইকবালকে পীড়িত করে না? শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা ওই দুই গোষ্ঠীর কোনোটিতেই হয়তো নেই, তাঁরা কি সবাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী? কিংবা মুক্তচিন্তার শত্রু? যে স্লোগান বা ব্যানার নিয়েই হোক, ক্যাম্পাসে শিক্ষকদের এই দলাদলি কি শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশকে ব্যাহত করে না?

২০১৫

www.pathagar.com

বইবিহীন শিক্ষা ও স্কুলে পার্লার

বাংলা ভাষায় 'লেজেগোবরে' বলে একটি কথা আছে। এটি একটি বাগ্‌ধারা। যার অর্থ, অকর্মণ্যতার কারণে নাকাল হওয়া। এত দিন যাঁদের কাছে কথাটার অর্থ বা তাৎপর্য হয়তো ততটা স্পষ্ট ছিল না, তাঁরাও আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আইটি-উৎসাহী সচিব মহোদয়ের কল্যাণে গত কদিনে মনে হয় তা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। আগামীতে পরীক্ষার্থীরা এই বাগ্‌ধারাটি দিয়ে বাক্য রচনাকালে অনেকেই হয়তো লিখবে, 'অনলাইনে ভর্তি করতে গিয়ে বোর্ডের (বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের) লেজেগোবরে অবস্থা হয়েছে'। কয়েকবার দিন-তারিখ ও সময় দিয়ে ব্যর্থ হওয়ার পর অবশেষে গত সোমবার রাত আড়াইটার দিকে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের ওয়েবসাইটে কলেজে ভর্তির জন্য মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। যদিও সে রাতেই যে কেবল অনেকে ওয়েবসাইটটিতে ঢুকতে বা তালিকাটি দেখতে পারেন নি তা নয়। পরদিন সকালেও অনেক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক একই রকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। শিক্ষাসচিব অবশ্য বলেছেন, সবাই একসঙ্গে দেখার চেষ্টা করায় 'একটু' সমস্যা হতে পারে, তবে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমরাও চাই কলেজগুলোতে ভর্তি নিয়ে আর বড় রকমের কোনো জটিলতা সৃষ্টি না হোক। সত্যি সত্যি 'সবকিছু ঠিক' হয়ে যাক। কেউ কেউ যে বলছেন, এ তো সমস্যার শুরু মাত্র, তাঁদের সে রকম কথাবার্তাকে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোকের প্রলাপ বলেই আমরা গণ্য করতে চাই। একথাও মানি যে, নতুন কোনো ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে গেলে, প্রথম দিকে কিছু সমস্যা-সঙ্কটের মোকাবেলা করতেই হয়। বৃহত্তর ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু প্রশ্ন হল, কী ধরনের এবং কতটা পর্যন্ত সমস্যা হতে পারে, সে ব্যাপারে কোনো পূর্বধারণা নতুন এই বিধান বা ব্যবস্থা প্রবর্তকদের আছে কি না। তাঁরা যথেষ্ট সময় ও পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে, সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন করে কাজটায় হাত দিয়েছেন কি না। একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির মনোনয়ন-তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে তা যে করা হয় নি, গত কদিনে শিক্ষাসচিবসহ তাঁর মন্ত্রণালয়, বোর্ড এবং

www.pathagar.com

তালিকা তৈরির ব্যাপারে প্রযুক্তি-সহায়তা দানকারী বুয়েটের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কথাবার্তায় তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। তারপরও তাঁরা শুধু নিজেদের দিকটার কথাই বলছেন। যাদের এর ফলভোগী হওয়ার কথা, কিংবা যাদের মঙ্গলের জন্য এই ব্যবস্থা, তাদের সমস্যা বা অসুবিধাগুলো তাঁরা বিন্দুমাত্রও বিবেচনায় নিয়েছেন এমন প্রমাণ আমরা পাই নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রবর্তিত এই 'স্মার্ট এডমিশন সিস্টেম'-এর সুবিধা গ্রহণের মতো 'স্মার্ট' অবস্থা আমাদের দেশের কত ভাগ শিক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবকের আছে? যে এগারো লাখ শিক্ষার্থী এবার এসএসসি পাস করে কলেজে ভর্তির জন্য অপেক্ষা করছিল, তাদের কতজনের নিজস্ব কিংবা পরিবারের কারো না কারো স্মার্ট ফোন আছে? বাংলাদেশের মফস্বলাঞ্চলে এমন লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী আছে, যাদের বাড়ির কয়েক মাইলের মধ্যে পয়সা খরচ করেও ইন্টারনেট চেক করার সুবিধা নেই। ফলে বোর্ড এভাবে বারবার তালিকা প্রকাশের দিনক্ষণ জানান দিয়ে তা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের যে হেনস্থা হল, টাকার ও শ্রমের মূল্যে তার হিসাব কর্তৃপক্ষ করেছেন কি? ফল প্রকাশের পর এখনও যে তেষট্টি হাজারের মতো শিক্ষার্থী বঞ্চিত রয়ে গেল, যাদেরকে পরবর্তী আরেকটি তালিকা প্রকাশের অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে, তাদের দুর্গতির অবসান তো হলই না। এমনকি শুরুতে ভর্তির আবেদন করা নিয়ে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তার দায়দায়িত্বই বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের কর্মকর্তারা এড়াবেন কিভাবে? তাঁদের উদ্ভাবিত পদ্ধতির গোড়ায় গলদ না থাকলে তাঁদেরকে কি এভাবে কেঁচে গণ্ডূষ করতে হত? আমাদের শিক্ষাসচিব না হয় আমলা মানুষ, হয়তো আইটিও বোঝেন, কিংবা কেবল আইটিই বোঝেন, দেশের বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা বা অভিজ্ঞতা কম, তিনি সিঙ্গাপুরের অভিজ্ঞতা দিয়ে বাংলাদেশকে সহসাই সিঙ্গাপুর বানিয়ে ফেলতে চান। কিন্তু আমাদের শিক্ষামন্ত্রী তো দীর্ঘদিনের মাঠের রাজনীতি করা মানুষ। তিনি কী করে দেশের বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে এ ধরনের সব তুঘলকি কর্মকাণ্ডে সায় দিতে পারেন? দিল্লির সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকও তাঁর সাম্রাজ্যের উন্নতি বা প্রজাসাধারণের কল্যাণে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অনেক কাজের পেছনে ভালো উদ্দেশ্যও কাজ করেছিল বলে ঐতিহাসিকরা অভিমত দিয়ে থাকেন। তবে তিনি যেভাবে দ্রুততার সঙ্গে ও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে দিল্লি থেকে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরসহ তাঁর বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছিলেন তা প্রজাদের অশেষ দুর্গতির কারণ ঘটায়। যে কারণে তিনি 'পাগলা তুঘলক' নামে পরিচিতি লাভ করেন এবং আজ পর্যন্ত 'তুঘলকি কারবার' বলে একটা কথা আমরা ব্যবহার করি। বর্তমান সরকারের অন্য যে-কোনো মন্ত্রণালয়ের চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে তুঘলকি কর্মকাণ্ডে এগিয়ে আছে এ পর্যন্ত

www.pathagar.com

বারবারই তারা সে প্রমাণ দিয়েছে। আর এই তুঘলকি কর্মকাণ্ডকে উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একজন যোগ্য কান্ডারি হিসেবে সাম্প্রতিককালে একজন শিক্ষাসচিবকেও আমরা পেয়েছি। ইতিমধ্যে ছাত্রছাত্রীদের হাতে বইয়ের পরিবর্তে ট্যাব ধরিয়ে দেওয়ার এবং স্কুলে স্কুলে বিউটি পার্লার খোলার ঘোষণা দিয়ে তিনি কিছুটা কৌতুক ও অনেকটাই সমালোচনার পাত্র হয়েছেন। এর আগে বছরের প্রথম দিনটিতেই 'বই দিবস' উপলক্ষে এক টেলিভিশন টকশোতে অংশ নিতে গিয়ে তিনি বললেন, সামনে তিনি শিক্ষার্থীদের বই পড়ার কষ্ট বা ঝামেলা অনেকটাই কমিয়ে দেবেন। তিনি সিঙ্গাপুর এবং আরও কোথায় কোথায় সরকারি সফরে গিয়ে দেখে এসেছেন, সেখানে বইয়ের পরিবর্তে মাল্টিমিডিয়া ও অন্যান্য ই-প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। এদেশেও তিনি ও তাঁর মন্ত্রণালয় শিগগিরই তা সম্ভব করে তুলবেন। শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ও এ ধরনের অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবহারে আমাদের আপত্তি থাকার কোনো কারণই নেই। শিক্ষার্থীদের পাঠদানে তা যে খুবই সহায়ক হবে তাতেও আমরা সন্দেহ পোষণ করি না। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হল, বাংলাদেশের মতো বিশাল জনসংখ্যার মূলত গ্রামপ্রধান একটি দেশে, আরও বিশেষ করে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায়, নগর-রাষ্ট্র সিঙ্গাপুরের অভিজ্ঞতা প্রয়োগ কতটা সম্ভব ও স্বাভাবিক? সে দেশেও কি সকল অঞ্চলে সমানভাবে প্রযুক্তির এই ব্যবহার নিশ্চিত করা গেছে? নাকি প্রজেক্টর ও অপারেটর সেখানে বই ও শিক্ষকের বিকল্প হয়েছে? এর পরও কথা আছে। আমাদের দেশে এ যাবত জেলা ও থানা পর্যায় পর্যন্ত এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে, তার কতটা সদ্ব্যবহার হচ্ছে, কত ভাগ অদ্যাবধি ব্যবহারোপযোগী আছে, মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে কখনো তা অনুসন্ধান করে দেখেছে কি? মাল্টিমিডিয়া কি বিদ্যুতে নাকি ব্যাটারিতে চলবে? ব্যাটারি কি সরকার সরবরাহ করবে? আমাদের দেশে যেখানে লোডশেডিং এখনও একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, রাজধানীতে এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানেও যেখানে আকস্মিক বিদ্যুৎ বিপর্যয় রোধ করা যায় না, পরীক্ষার আগে ছাত্রছাত্রীদের হারিকেন বা মোমের আলোয় পড়াশুনা করতে হয়, পরীক্ষার হলেও কখনো কখনো মোমবাতি জ্বালাতে হয়, সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া সরবরাহ ও ছাত্রছাত্রীদের হাতে ট্যাব ধরিয়ে দিয়ে শিক্ষাসচিব কোন বিপ্লবটা সাধন করবেন? মাত্র দশ হাজার টাকায় 'দোয়েল' নামক ল্যাপটপ সরবরাহের সেই বহুবিজ্ঞাপিত সরকারি প্রকল্পের পরিণতি কী হয়েছে? বর্তমান শিক্ষাসচিব যিনি এর আগে প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সচিব ছিলেন, তিনি এসব প্রশ্নের কী জবাব দেবেন? অবশ্য এ ধরনের পরিকল্পনার সুবাদে একেবারে কারোই যে কোনো লাভ হয় না, হবে না, তা নয়। মন্ত্রণালয়ের বিশেষ প্রকল্পের অধীনে নিম্নমানের বা প্রায়

www.pathagar.com

ব্যবহার-অনুপযোগী মাল্টিমিডিয়া সরঞ্জাম বা ট্যাব সরবরাহ করে কিছু লোকের নিশ্চয় পকেট ভারি হবে। সরঞ্জাম সরবরাহকারী বিদেশী প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহের সৌজন্যে এবং এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের নামে মন্ত্রণালয়ের ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর-অধিদপ্তরের কিছু কর্মকর্তার বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ হবে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের হয়তো দেখা যাবে পরীক্ষার ঠিক আগে বিকল বা হ্যাং হয়ে যাওয়া ট্যাব হাতে অসহায় ছোটাছুটি করে বেড়াতে। এই সুযোগে স্কুল-কলেজের পাশে হয়তো বইখাতার দোকানের মতো কিংবা সেগুলোর জায়গায় সারি সারি ল্যাপটপ-ট্যাব মেরামতের দোকান বসবে। কে জানে আমাদের শিক্ষাসচিব হয়তো দেশে তেমন একটা আইটি 'বিপ্লবে'রই স্বপ্ন দেখছেন!

আমরা বিশেষ করে নিচের ক্লাসের শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে অতিরিক্ত পাঠ্যবইয়ের বোঝা কমাতে চাই। যেহেতু তা তাদের মানসিক বিকাশের সহায়ক হওয়ার পরিবর্তে বরং তাদেরকে এক রকম মানসিক ও শারীরিক পঙ্গুত্বের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। যাঁরা শিক্ষা নিয়ে ভাবেন, শিশুদের ব্যাপারে কমবেশি চিন্তা করেন, তাঁরা সকলেই অনেকদিন ধরে এই কথাটা বলে আসছেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও একাধিকবার শিশুদের ওপর পাঠ্যবইয়ের এ বোঝা কমানোর বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সেদিক থেকে বলা যায়, এ ব্যাপারে একটা জাতীয় ঐকমত্যই আছে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তার অধীন কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট অন্য দপ্তরগুলো সে লক্ষ্যে কতটা কী করেছে এ পর্যন্ত? শিক্ষাসচিব যে সামগ্রিকভাবে (সব পর্যায়ের) ছাত্রছাত্রীদের বই পড়ার ক্লেশই কমিয়ে দিতে চান এবং তার পরিবর্তে তাদের হাতে ট্যাব ধরিয়ে দিতে চান, তা শুনে পাঠে অনাগ্রহী শিক্ষার্থীরা নিশ্চয় প্রাণ খুলে তাঁর জন্য দোয়া করবেন। ট্যাবের বহুমুখী ব্যবহারোপযোগিতা (গেম, ফেসবুক এবং আরও অনেক কিছু) সম্পর্কে নিশ্চয় তারা কমবেশি অবহিত। পৃথিবীর কোনো দেশে কি আজ পর্যন্ত মাল্টিমিডিয়া বা ট্যাব ছাপা-বইয়ের বিকল্প হতে পেরেছে? সামনে দশ-বিশ বা পঞ্চাশ বছরেও পারবে? সচিব মহোদয় কি ছাপা বইয়ের পরিবর্তে ই-বুকের কথা বলেছেন? বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কোন কোন বিষয়ে ই-বুক ছাপা বইয়ের চাহিদা মেটাতে পারবে? সে বইয়ের কি সবই সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশ থেকে ডেভলপ করা জিনিস হবে? না হলে এদেশে কারা তা তৈরি করবেন? বছরের পর বছর অযোগ্য লোকদের সিন্ডিকেট দিয়ে বই লেখাবার ফলে ছাপা পাঠ্যপুস্তকের মান বর্তমানে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে সেগুলো বাদ দিলে জাতির খুব বড় ক্ষতি হয়তো হবে না। শিক্ষাসচিব হয়তো সেটা জানেন। কিন্তু ই-বুকগুলো তৈরির দায়িত্বও তো তাঁরা বা তাঁদের মতোই আর কেউ পাবেন? তার ফল আবার তো সেই তুঘলকি কাণ্ড!

www.pathagar.com

কিন্তু আমরা অযথা কল্পনা করতে চাই না। সচিব মহোদয় খুব সম্ভব সব রকম বইয়েরই ব্যবহার কমাবার পক্ষপাতী। তিনি একটি তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর সমাজ বা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন, যেখানে বইয়ের ভূমিকা কম বা হয়তো একেবারেই থাকবে না। তবে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের পার্থক্যটা বোধহয় তাঁর কাছে খুব স্পষ্ট নয়। যেমন মনে হয় জ্ঞান ও তথ্যকেও তিনি একই মনে করেন। মনে রাখতে হবে, প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ মানেই কিন্তু জ্ঞানদীপ্ত সমাজ নয়। এদেশে আমরা একটা জ্ঞানদীপ্ত সমাজ গড়ে তুলতে চাই। আর জ্ঞানদীপ্ত সমাজ ও আলোকিত মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে বইয়ের সত্যি সত্যি কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষাসচিব স্কুলে স্কুলে বিউটি পার্লার খোলার কথা বলেছেন। এমনিতেই দেখা যাচ্ছে ঢাকা এবং সম্ভবত দেশের অন্যান্য শহরাঞ্চলেও স্কুলগুলোর আশেপাশে শাড়ি-প্রসাধন ও অন্যান্য দোকানপাটের সঙ্গে ইদানীং কিছু কিছু বিউটি পার্লার গড়ে উঠেছে। সন্তানদের স্কুলে নিয়ে আসা মায়েরা কেউ কেউ তাঁদের অপেক্ষার সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করতে সেখানে ঢুকে তাঁদের রূপচর্চার প্রয়োজনটুকুও সেরে নেন। স্কুলগুলোতে যেসব পার্লার স্থাপিত হবে, তাতে শিক্ষার্থীর মায়েদেরও কোনো সুযোগ থাকবে কি না, আমরা জানি না। শিক্ষাসচিবের বক্তব্য থেকে সে বিষয়ে কোনো ধারণা আমরা পাই নি। তবে বুঝেছি, সৌন্দর্য বলতে তিনি মুখশ্রীর ব্যাপারটাই বোঝেন। মনের সৌন্দর্যের গুরুত্ব তাঁর কাছে নিতান্তই কম। না হলে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সিলেবাসের বাইরেও বেশি বেশি বই পড়ার, নিয়মিত সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের, দেয়াল পত্রিকা ও বার্ষিকী প্রকাশ—এ বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দিতেন।

সিঙ্গাপুরের মতো দেশগুলো কিছু ক্ষেত্রে আমাদের জন্য উন্নয়নের উদাহরণ হলেও হতে পারে। কিন্তু শাসননীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি কোনো ব্যাপারেই অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে না। ইতিহাস-ঐতিহ্যের দিক থেকেও সিঙ্গাপুরের সঙ্গে আমাদের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। জাতি হিসেবে আমাদের অনেক দোষ-দুর্বলতা আছে সত্যি। সব দেশ বা জাতিরই তেমন কমবেশি সীমাবদ্ধতা থাকে। কিন্তু ভুললে চলবে না, এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী আমরা। আমরা আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করেছি। অনেক রক্ত ও আত্মদানের মূল্যে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে। পার্লামেন্টে প্রস্তাব পাস করিয়ে কেউ আমাদের দেশটাকে স্বাধীন করে দেয় নি। সমস্যা হল, আমাদের সরকারি কর্মকর্তারা যখন কোনো দেশ সফরে যান, তখন কনডাকটেড ট্যুরের অংশ হিসেবে তাঁদেরকে সে দেশের হয়তো নানা স্থানে অবস্থিত কিছু উন্নয়ন মডেল ঘুরে দেখানো হয়। আমরাও এদেশে বিদেশী অভ্যাগতদের বেলায় সাধারণত তা-ই করে থাকি। হয়তো ঢাকার ও সাভারের একটা স্কুল এবং সেই সঙ্গে রংপুরের গঙ্গাচড়ার একটি

www.pathagar.com

স্কুলও দেখাতে নিয়ে যাই। এগুলো আসলে বিদেশীদের দেখাবার জন্য পূর্বনির্ধারিতই থাকে। এভাবে আমরা বিদেশীদের চোখকে কতটা ফাঁকি দিতে পারি জানি না। কিন্তু আমাদের আমলারা বিদেশ থেকে সেই মডেলগুলো দেখেই যারপরনাই মুগ্ধ-বিমোহিত হয়ে আসেন। আর তাকেই সেসব দেশের সামগ্রিক চিত্রের অংশ বলে মনে করেন। দেশের বাস্তবতা না বুঝে তার প্রয়োগ ঘটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শিক্ষা তো অনেক বড়, দীর্ঘমেয়াদি একটা ব্যাপার। আপাতত টেস্ট কেস হিসেবে আমরা শুধু ঢাকা শহরেই সিঙ্গাপুরের যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তিটা প্রয়োগ করে দেখাই না কেন? বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে আনা সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো কেন এখানে কাজ করতে পারে না? কেন লাগাবার কদিনের মধ্যেই তা অচল হয়ে যায়?

২০১৫

www.pathagar.com

মানসম্মত শিক্ষা নাকি বেশি বেশি গোল্ডেন প্লাস

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'সার্টিফিকেটসর্বস্ব শিক্ষা নয়, নোট মুখস্থ করে পাস করা শিক্ষা নয়, আলোকিত মানুষ হওয়ার শিক্ষা চাই, সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব গড়ার শিক্ষা চাই।' তিনি আরও বলেছেন, 'হাজার দুয়ারি আলোকিত রাজ্যে প্রবেশের মাধ্যম হোক শিক্ষা। কূপমণ্ডূকতায় আবিষ্ট বদ্ধ ঘরের খোলা জানালাটি হোক শিক্ষা।' রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আচার্যের উপর্যুক্ত বক্তব্যে শিক্ষার লক্ষ্য বা অভিমুখ সম্পর্কে একটি দিগ্‌দর্শনই যে শুধু তুলে ধরা হয়েছে তা-ই নয়। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের বিদ্যমান বাস্তবতা সম্পর্কে একধরনের নেতিবাচক মূল্যায়নও যেন তাতে প্রকাশ পেয়েছে। প্রচ্ছন্নভাবে হলেও। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা যে সার্টিফিকেটসর্বস্ব, নোট বা মুখস্থবিদ্যা নির্ভর; তা আলোকিত মানুষ বা সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব গড়ার অনুকূল নয়; মুক্তবুদ্ধি বা স্বাধীনচিন্তা চর্চার সহায়ক নয়; এমন কথা আমাদের গুণীজনদের মুখে আমরা হরহামেশাই শুনে আসছি। আজ বহু বছর ধরেই। কিন্তু রাষ্ট্রের শীর্ষ পদাধিকারী ব্যক্তিটি যখন দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে এমন ধারা কথা বলেন, তখন তা একটি ভিন্ন তাৎপর্যে আমাদের সামনে ধরা দেয়। হলই বা তা তাঁর লিখিত, আনুষ্ঠানিক ভাষণ। বরং লিখিত ও আনুষ্ঠানিক বলেই বোধ করি এর একটা আলাদা মূল্য বা গুরুত্ব আছে।

একই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেছেন, 'নানা কারণে দেশে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দক্ষতা সৃষ্টি এবং সে অনুযায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ পর্যাপ্ত নয়। শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতিবছরই বাড়ছে। বিভাগগুলোতে সব শিক্ষার্থী যে তাদের দক্ষতা ও আগ্রহ অনুযায়ী ভর্তি হচ্ছে, সে কথা বলা যাবে না।' তিনি বলেছেন, 'এর পরিণাম শুভ হতে পারে না।' দেশের শিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে এই সত্য উচ্চারণের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য উভয়কে আমরা নিশ্চয় সাধুবাদ দেব। কিন্তু স্বাধীনতার চার দশক পর এ

www.pathagar.com

ধরনের কথা শুনে উদ্দীপ্ত বা আশাবাদী হওয়ার পরিবর্তে আমরা কি অনেকখানি হতাশও হয়ে পড়ি না, অসহায়ও বোধ করি না? স্বভাবতই তখন মনে প্রশ্ন জাগে, শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান এ বাস্তবতার পরিবর্তন ঘটাবে কে? রাষ্ট্রপতির ঈপ্সিত শিক্ষাব্যবস্থার সে মৌলিক পরিবর্তন ঘটাবার দায়িত্বটা আসলে কার? অর্থাৎ সেই পুরনো কথা, বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

ব্রিটিশ শাসকদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা, যা পরিকল্পিতই হয়েছিল মূলত তাদের অনুগত প্রজা বা গোলাম সৃষ্টির উদ্দেশ্য থেকে, তা কী করে একটি স্বাধীন দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টির সহায়ক হতে পারে? এ কি কাঁঠালগাছ লাগিয়ে তা থেকে আম খাওয়ার বাসনার মতো ব্যাপার নয়? অথচ দু-দুবারের পরাধীনতা মুক্তির পরও আজও আমাদের দেশে আমরা সেই পুরনো ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষাব্যবস্থাই সামান্য হেরফের ঘটিয়ে চালু রেখেছি। বরং ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থারও যা কিছু ইতিবাচক দিক ছিল, তাতেও আলোকিত মানুষ তৈরির ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার যেটুকু ফাঁকফোকর ছিল, প্রথমে তেইশ বছরের পাকিস্তানি শাসনে ও পরে তেতাল্লিশ বছরের বাংলাদেশ আমলে নানা অব্যবস্থা, দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের কবলে পড়ে তা-ও ইতিমধ্যে আমরা খুইয়ে ফেলেছি।

পুরো পাকিস্তান আমল জুড়ে আমাদের সংগ্রামটা ছিল এক অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থার দাবিতে। ১৯৬২-এর শরিফ কমিশন ও ১৯৬৪-এর হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট-বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৯-এর এগার দফা আন্দোলন এবং ১৯৭০-এর নূর খান কমিশন রিপোর্ট-বিরোধী আন্দোলনের ভেতর দিয়ে বারবার এ দাবিটিই উঠে এসেছে। সেদিন তরুণ বয়সে যাঁরা এসব আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদেরই অনেকে আজ রাষ্ট্রের নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত, শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে জাতিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু বহুধারায় বিভক্ত ও বৈষম্যভিত্তিক দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে তাঁরাও মনে হয় এক অমোচনীয় বাস্তবতা বলে মেনে নিয়েছেন। তাঁদের বংশধররাই আজ ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করে। নিজেদের ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনিদের ইংরেজি মাধ্যমে পড়িয়ে তাঁরা ইংরেজি-মাধ্যম শিক্ষার বিরুদ্ধে কথা বলবেন কী করে? আর বললেই বা মানুষ তাঁদের সে কথায় কান দেবে কেন? আবার যে-কারণে তাঁরা ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিতে অক্ষম, সেই একই কারণে অন্যদের সন্তানদের মাদ্রাসাশিক্ষা গ্রহণের অধিকারের বিরুদ্ধেও তাঁরা কথা বলতে পারেন না। সেটাও এক রকম দ্বিচারিতা হয়ে যায়। এদেশের গরিব বা সঙ্গতিহীন পরিবারের সন্তানরাই সাধারণত মাদ্রাসায় পড়ে। এমনকি যারা ধর্মীয় রাজনীতির চর্চা করেন, ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি ও মাদ্রাসাশিক্ষার পক্ষে কথা বলেন, তাঁদের মধ্যেও যাঁরা সঙ্গতিপন্ন তাঁদের কজন নিজেদের ছেলেমেয়েদের মাদ্রাসায় পড়ান, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক গবেষণার বিষয় হতে পারে। এই গবেষণাটা

www.pathagar.com

হওয়া দরকার। একটা দেশে নানা ধারার শিক্ষা চালু রেখে, শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য ও বিভেদ বজায় রেখে জাতিকে অভিন্ন লক্ষ্যের দিকে চালিত করার কথা ভাবা আকাশকুসুম কল্পনা বৈ তো নয়। সভা-সেমিনারে দাঁড়িয়ে বা পত্রপত্রিকায় লিখে আমরা যাঁরা আজ একই ধারার শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলি, তাঁরাও মনে হয় আর এর সম্ভাব্যতায় বিশ্বাস করি না। তাহলেও দিনের পর দিন আমরা কথাটা বলে যাচ্ছি। কেন বলছি? আমার মনে হয়, অতঃপর আমাদের এ কথাটা আর না বলাই ভালো। তার পরিবর্তে আমাদের যা করা দরকার তা হল, বৈষম্যভিত্তিক এই সমাজে বিভিন্ন ধারার শিক্ষাব্যবস্থার অস্তিত্বকে আপাতত স্বীকার করে নিয়েই (আমরা আসলে যা মেনেও নিয়েছি) এর মধ্যবর্তী ব্যবধানটিকে সম্ভব ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসা। আমরা যাকে আজ দেশের মূল বা সাধারণ ধারার শিক্ষা বলি, তার সঙ্গে কিন্ডারগার্টেন ও মাদ্রাসা উভয় পদ্ধতির শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিষয়গত পার্থক্যকে যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনা। তারপরও ও-লেভেল, এ-লেভেলের মতো বিদেশী ঘরানার শিক্ষা যারা গ্রহণ করছে, আমাদের জাতীয় শিক্ষাদর্শের সঙ্গে তার সমন্বয় সাধনের ব্যাপারটি কীভাবে করা যায়, তার উপায় খোঁজার কর্তব্যটি থেকেই যাচ্ছে।

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর প্রথমে কুদরাত-ই খুদা শিক্ষা কমিশন এবং তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারেরই বিগত দুটি আমলে শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে দু-দুবার কমিশন-কমিটি গঠন ও তার সুপারিশ কার্যকর করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ছোটখাটো দু-একটা পদক্ষেপ ছাড়া এ ব্যাপারে মৌলিক বা প্রকৃত কাজের কাজ এ যাবত কিছুই হয়নি বা করা যায়নি। অন্য সরকারগুলোর উদ্যোগ বা প্রচেষ্টার কথা এখানে না-ই বা আনলাম। আসলে জাতীয় পর্যায়ে মোটামুটি একটা ঐকমত্য ছাড়া শিক্ষার মতো বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা নিয়ে তা বাস্তবায়ন করা কঠিনই শুধু নয়, বলা যায় অসম্ভব। ওই ঐকমত্যের অনুপস্থিতিতে শিক্ষায় বিপ্লব ঘটানো বা সংস্কার সাধনের যে-কোনো মহতী উদ্যোগ যে শেষপর্যন্ত কাগুজে পরিকল্পনা আর বক্তৃতাবাজিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে, অভিজ্ঞতা থেকে কি বারবার আমাদের সে উপলব্ধি ঘটেনি? অত্যুক্তি হবে না যদি বলি, শিক্ষা সংস্কারের অর্থ আজ আমাদের দেশে দাঁড়িয়েছে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের 'প্রকৃত ইতিহাস শিক্ষা' দেওয়ার নামে তাড়াহুড়া করে ও যেনতেন প্রকারে পাঠ্যপুস্তকের সংস্কার। কিছু বিষয় বাদ ও কিছু বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি। আর সে কাজটিও করা হয় খুব অযোগ্য, একান্তভাবে দল-মনস্ক ও নমনীয় শিরদাঁড়ার লোকদের দ্বারা। আর দশটা ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি এক্ষেত্রেও একধরনের সিন্ডিকেট কাজ করে। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কিছু সুযোগসন্ধানী আমলার সমন্বয়ে এই সিন্ডিকেট গঠিত হয়। সরকার পরিবর্তনে ব্যক্তি বদলায়, কিন্তু কাজের ধরনটা একই রকম থেকে যায়।

www.pathagar.com

একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সঠিক ভিত্তি দেওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি যে ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন তা হল শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তক। অথচ আমাদের বিদ্যমান শিক্ষাকাঠামোয় মেধাবী তরুণরা শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট হন না। আর পাঠ্যপুস্তক যে কত দায়িত্বহীনতা ও অযত্নের সঙ্গে পরিকল্পিত, রচিত ও সম্পাদিত হতে পারে, আমাদের দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের যে-কোনো একটি শ্রেণির দু-তিনটি পাঠ্যপুস্তকের পাতা উল্টেই যে-কেউ সে ধারণা লাভ করতে পারেন। এ নিয়ে এ পর্যন্ত বিস্তর লেখালেখি হয়েছে কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি। নিতান্ত স্বল্পশিক্ষিত অভিভাবক কিংবা বিদ্যালয় শিক্ষকদের চোখেও পাঠ্যপুস্তকে যেসব বানান ও বাক্যগঠনের ত্রুটি, অসঙ্গতি ও বানান ভুল চোখে পড়ে, আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এসব পাঠ্যপুস্তক রচনা, সম্পাদনা ও মুদ্রণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রথিতযশা বিদ্বজ্জনদের তা চোখ এড়িয়ে যায়। নাকি ইচ্ছা করেই এসব ভুল রাখা হয়? কারণ ভুল থাকলেই তা আবার সংস্কার ও সংশোধনের প্রয়োজন হবে। তার জন্য আবার সভা-সেমিনার-কর্মশালা, মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন-পর্যালোচনা, অর্থাৎ অর্থপ্রাপ্তির নতুন সুযোগ। একই বিশেষজ্ঞরা কারিকুলাম তৈরি করেন, তাঁরাই আবার কদিন পর তা পর্যালোচনা করে সংস্কার-সংশোধনের পক্ষে মত দেন, সুপারিশ প্রণয়ন করেন। কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তককে যুগোপযোগী করার নামে এভাবে ঘনঘন তার সংস্কার করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে জ্ঞানলাভের জন্য দাতাসংস্থার অর্থানুকূল্যে স্থানীয় পর্যায়ে পর্যালোচনা সভা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও বিদেশ সফরের ব্যবস্থা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের আমলা ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানসহ সবাই এর কমবেশি সুফলভোগী। কাজেই এ অবস্থার অবসান কে চাইবেন, কেনই বা চাইবেন?

রাষ্ট্রপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তাঁর উপরিউক্ত সমাবর্তন বক্তৃতায় শিক্ষকদের বলেছেন, 'পাঠে আনন্দের সম্মিলন' ঘটাতে। খুবই প্রয়োজনীয় কথা। আর, বলা বাহুল্য, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে এই আনন্দ-সহযোগে বিদ্যাদানের প্রয়োজনীয়তাটা সবচেয়ে বেশি। অথচ আমাদের শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা যেন শিক্ষাকে কতটা নিরানন্দ ও নীরস করা যায় সে উদ্দেশ্য নিয়েই আদাজল খেয়ে নেমেছেন। বিদেশী পুস্তক পড়ে ও প্রশিক্ষণ নিয়ে তাঁরা কারিকুলাম ব্যাপারটা যতটা হয়তো বোঝেন, দৈশিক ও সামাজিক বাস্তবতা, শিশু-কিশোর মনস্তত্ত্ব বা আনন্দের ব্যাপারে তার সিকি পরিমাণ ধারণাও তাঁদের আছে বলে অন্তত কার্যদৃষ্টে মনে হয় না। পাঠ্যপুস্তকে নতুন নতুন দরকারি বা কার্যোপযোগী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার নামে সেগুলোকে ক্রমে রসকষহীন করে তোলা হচ্ছে। স্কুল পর্যায়ে অতীতের পাঠ্যপুস্তকগুলোর সঙ্গে বর্তমান পাঠ্যপুস্তকের তুলনা করলেই যে কেউ তা উপলব্ধি করতে পারবেন। এক বাংলা বইয়েই একুশে ফেব্রুয়ারি/শহীদ মিনার, স্বাধীনতা সংগ্রাম/বঙ্গবন্ধু বা বীরশ্রেষ্ঠদের জীবনী, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীসমূহের পরিচিতি

www.pathagar.com

প্রভৃতি হরেক বিষয়ের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। তাও যদি সেগুলো সুলিখিত হত। অনেক রচনাই আছে যা বোর্ডের নিজস্ব বা পছন্দের লোকদের ফরমায়েশ দিয়ে তাড়াহুড়ো করে লেখানো। ফলে না হয় তা মানসম্পন্ন না বিশেষ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপযোগী। একই পুস্তকে একবার বঙ্গবন্ধুর জীবনী আবার তাঁকে নিয়ে কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই অতিভক্তি বা বাড়াবাড়ির দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিহাসবোধ বা দেশপ্রেম আসলে কতটা সঞ্চারিত হচ্ছে এই মুহূর্তে তা নিরূপণ করা যাবে না। কিন্তু তারা যে পাঠ্যবিষয়ের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে ও ক্রমে আরও বেশি করে মুখস্থবিদ্যা-নির্ভর ও গাইড বই আশ্রয়ী হয়ে পড়ছে তা এক রকম নিশ্চিত করেই বলা যায়। তথাকথিত সৃজনশীল শিক্ষা বা পরীক্ষা পদ্ধতিও এ অবস্থা থেকে তাদেরকে মুক্তি দিতে পারবে বলে অবস্থাদৃষ্টে আশা করা যায় না। সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হতে না হতেই বাজারে সে ধরনের প্রশ্নের নমুনা সংবলিত গাইড বই চলে এসেছে। আর এই পদ্ধতি প্রবর্তন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষক ও শিক্ষকদেরই একাংশ সেসব পুস্তক রচনা ও প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত বলে জানা যায়। প্রশ্নকর্তারা এসব গাইড বই দেখেই নতুন ধাঁচের প্রশ্ন করছেন। কোচিং ব্যবসা বন্ধ হওয়া দূরের কথা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগে যারা যেসব বিষয়ে কোচিং নিত না, সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তনের পর তারাও এখন ওই সব বিষয়েও বিশেষ বিশেষ শিক্ষকদের (সৃজনশীল-অভিজ্ঞ?) কাছে কোচিং করতে বাধ্য হচ্ছে। কিংবা শিক্ষকরাই এ ব্যাপারে তাদের উদ্বুদ্ধ বা বাধ্য করছেন। এ সম্পর্কে সৃজনশীল পদ্ধতির প্রবক্তাদের কাউকে কাউকে প্রশ্ন করে যে জবাবটা পাওয়া যায় তা হল, এই পদ্ধতির সুফল পেতে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে। দেখা যাক। কিন্তু তারপরও কথা থাকে। শিক্ষায় মুখস্থনির্ভরতার অবসান হোক, শিক্ষার মধ্য দিয়ে অল্প বয়স থেকেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটুক, এটা সবারই কাম্য। 'মুখস্থকে না বলুন' স্লোগানটার দ্বারা আমরা যদি সেটাকেই বুঝিয়ে থাকি, ঠিক আছে। কিন্তু শিক্ষার একটা স্তর পর্যন্ত মুখস্থকে কি একেবারে বাদ দেওয়া যায়? শিশু-কিশোররা কবিতা মুখস্থ করবে না? বীজগণিতের ফর্মুলা বা পদার্থবিদ্যার সূত্র, রসায়নের প্রতীক এগুলো মুখস্থ না করে উপায় কী?

বিগত কয়েক বছর যাবত আমাদের কর্মদক্ষ শিক্ষামন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রণালয়ের সাফল্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে দুটি মাত্র বিষয়ের মধ্যে। এর একটি যথাসময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ এবং অন্যটি পাসের ও এ-প্লাসের হার বৃদ্ধি। এর বিপরীতে ব্যর্থতা ও অব্যবস্থাপনার ফিরিস্তি কিন্তু কম নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির হার কমেছে বলে যে দাবি করা হয় মাঠপর্যায়ের তথ্য ও বাস্তবতা মোটেও তা সমর্থন করে না। মন্ত্রী নিজে হয়তো সৎ, কিন্তু তাঁর আশেপাশের লোকজন, মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও বোর্ডসমূহের কর্মকর্তাদের সম্পর্কে অনেক কথাই ভুক্তভোগীরা বলে থাকেন।

www.pathagar.com

পত্রপত্রিকায়ও বিভিন্ন সময় এ ধরনের অনেক খবর এসেছে। বিশেষ করে মন্ত্রীর এক ব্যক্তিগত সহকারী সম্পর্কে পদায়ন বাণিজ্যের ব্যাপক অভিযোগ সত্ত্বেও কী গুণে বা যোগ্যতায় তাঁকে দীর্ঘদিন ওই পদে বসিয়ে রাখা হয়েছিল সেটা অনেকেরই প্রশ্ন। এমনকি শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির একজন সাবেক সভাপতি সম্পর্কেও ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগ বাতাসে ভেসে বেড়ায়। এসব অভিযোগের বিষয়ে মন্ত্রী বা মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা কখনোই পাওয়া যায়নি।

পরীক্ষার পর যথাসময়ে তার ফল প্রকাশিত হোক, এটা সবারই কাম্য। এ ক্ষেত্রে অহেতুক দীর্ঘসূত্রতা শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সবারই বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেদিক থেকে গত কয়েক বছর ধরে প্রায় পূর্বঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের ব্যাপারটি নিশ্চয় স্বস্তিকর এবং সে কারণে প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু এভাবে নির্দিষ্ট সময়ে ফল প্রকাশের তাড়াহুড়ায় উত্তরপত্র পরীক্ষায় গাফিলতি ঘটছে কি না, পরীক্ষায় পাস ও 'গোল্ডেন'-এ প্রাপ্তির উচ্চহার নিশ্চিত করতে গিয়ে পরীক্ষার্থীদের মেধার প্রতি যথার্থ সুবিচার করা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে অভিভাবক-শিক্ষার্থী-শিক্ষক তথা সচেতন জনমনে ইতিমধ্যেই একটা সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। অনেক বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক এই ফলাফলে খুশি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন বলে প্রতিক্রিয়াটা হয়তো এখনও কর্তৃপক্ষের অনুকূলেই রয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পরই এর অন্য দিকটি সবার কাছে স্পষ্ট হবে। যাঁরা নিয়মিত পরীক্ষার খাতা দেখেন তেমন শিক্ষকদের কাছ থেকেই জানা যায়, বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তরপত্র দেওয়ার সময় তাঁদেরকে এ মর্মে মৌখিক ডিরেক্টিভ দেওয়া হয়, তাঁরা যেন খুব উদারভাবে নম্বর দেন। কেউ উত্তর 'এটেম্পট' করলেই তাকে যেন নম্বর দেওয়া হয়। এমনকি বাংলা-ইংরেজি পত্রেও বানান ভুলের জন্যও যেন নম্বর কাটা না হয়। এমনকি খাতা দেখে জমা দেওয়ার পর পরীক্ষকদের বোর্ডে তলব করে তাঁদেরকে দিয়ে নম্বর বাড়িয়ে নেওয়ারও ঘটনা শোনা যায়।

আমরা শিক্ষার হারবৃদ্ধি চাই, কিন্তু নিশ্চয় তা মানের প্রশ্নে আপস করে নয়। সকল পর্যায়ে শিক্ষার মানের অবনতি নিয়ে ইদানীং নানা সভা-সেমিনারে সুধীজনদের উদ্বেগ ব্যক্ত করতে আমরা শুনছি। খোদ শিক্ষামন্ত্রীও প্রায়ই তাঁর বক্তৃতায় শিক্ষার মানোন্নয়নের ব্যাপারে সবাইকে যত্নবান হতে এবং এজন্য সরকারের প্রচেষ্টার কথা বলেন। কিন্তু এই সহজ বাহবা পাওয়ার পথে কি সেটা সম্ভব? অন্য যে-কোনো দেশ বা জাতির বেলায় যেমন, তেমনি আমাদের জন্যও সে হবে এক কঠিনের সাধনা।

২০১৪ *শেখ মুজিবের আত্মজীবনী ও আরও কিছু প্রসঙ্গ (২০১৫)*

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ : শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ

স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় কাউকে ঠিক শিক্ষিত বা জ্ঞানী করে না। ডিগ্রিধারী বা বড়জোর পুঁথিপড়া পণ্ডিত হয়তো তৈরি করে। যে-পণ্ডিতদের কথা মনে করেই হয়তো *ডাকঘর*-এর অমল বলেছিল, 'আমাকে পণ্ডিত হতে বলো না পিসেমশায়!' সেই যে কবে প্রমথ চৌধুরী বলে গেছেন, 'সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই স্বশিক্ষিত', কথাটা সব সময়ের জন্যই সত্যি। এই স্বশিক্ষিত হওয়ার ব্যাপারটি যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে তেমনি বাইরেও ঘটতে পারে। বস্তুত শিক্ষাঙ্গনের সার্থকতা নির্ভর করছে তা এই স্বশিক্ষিত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টির কতটা অনুকূল তার ওপর। শিক্ষাঙ্গন জেলখানাও নয়, কামারশালাও নয়। শিক্ষককে বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর। এই কথাটাও মনে হয় পুরোপুরি ঠিক নয়। গড়েপিটে তো মানুষ বানানো যায় না। মানুষ ভেতর থেকে হয়ে ওঠে। ফুলের মতো ফুটে ওঠে। একজন দার্শনিক শিক্ষককে তুলনা করেছেন সহিসের সঙ্গে, তৃষ্ণার্ত ঘোড়াকে যে কিনা জলের ধারে নিয়ে যায়। কিন্তু ঘোড়া যদি তৃষ্ণার্ত না হয়? উপরন্তু জলের তৃষ্ণা আর জ্ঞানের তৃষ্ণা তো এক নয়। আর মানুষও কিন্তু ঘোড়া নয়। ছোটাতেই তার সার্থকতা নয়।

ছাগলের পালে ঘটনাক্রমে একটা বাঘের বাচ্চা বড় হচ্ছে। ছাগলদের সঙ্গেই সে মাঠে মাঠে চরে বেড়ায়, তাদের মতোই ঘাস খায়। ছাগলের মতোই ভ্যা-ভ্যা করে ডাকে। বনের পশু দেখলে ভয় পেয়ে ছাগলদের সঙ্গেই পালায়। একটা বাঘ অনেক দিন ধরেই বিষয়টা লক্ষ করছিল। একদিন সে ছাগলের পালে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘের বাচ্চাটাকে ধরল। তারপর ঘাড় চেপে তাকে নিয়ে গেল নদীর ধারে। নদীর পানির ওপর তার মুখ ঠুঁসে ধরে বাঘ বলল. 'ব্যাটা দ্যাখ, তোর চেহারা কি ওদের মতো নাকি আমার মতো?' নদীর পানিতে নিজের মুখ দেখে বাঘের বাচ্চা চমকে উঠল, 'আরে, তাই তো!' রামকৃষ্ণ বলেছেন, গুরুর কাজ শিষ্যকে ওই আত্মরূপ চেনানো। একইভাবে শিক্ষকেরও প্রথম ও প্রধান কাজ হওয়া উচিত মানব-সন্তানকে তার মানবিক সত্তাটি সম্পর্কে সচেতন করা, তার ভেতরের মানুষটিকে জাগিয়ে তোলা। সে কাজটি আমাদের শিক্ষকরা আজ কতটা করছেন বা করতে পারছেন?

www.pathagar.com

এদেশে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ যে আজ শিক্ষার অনুকূল থাকছে না, এ তো সর্বজনস্বীকৃত সত্য। কিন্তু এর জন্য কি কেবল ছাত্ররাই দায়ী? কিংবা ছাত্রনামধারী কিছু সন্ত্রাসী? রাজনৈতিক নেতৃত্বের আনুকূল্য ছাড়া কতিপয় অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তের পক্ষে দেশের শিক্ষাঙ্গনকে এভাবে বিপর্যস্ত করা আদৌ সম্ভব ছিল কি? বাইরে থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রশ্রয় না পেলে, তাঁরা ঠিকমতো রাস টেনে ধরলে, মোটকথা এ ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সত্যি সত্যি আন্তরিক হলে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা কি আজও কঠিন? জাতীয় রাজনীতিই আজ যেখানে ক্রমবর্ধমান হারে দুর্বৃত্তায়িত, কালোটাকার মালিক আর অস্ত্রবাজদের দখলে, প্রকৃত রাজনীতিকরা যেখানে নির্বাসিত বা কোণঠাসা; সেখানে সেই অপরাজনীতির ক্রোড়াশ্রয়ী ছাত্ররাজনীতির কাছে আমরা অন্য কী আশা করতে পারি? কেনই বা করব? বছরের পর বছর দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদগুলোর নির্বাচন স্থগিত রেখে ক্যাম্পাসে আজ সে কোন্ ছাত্ররাজনীতির চর্চা হচ্ছে?

বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতির সুযোগ থাকা উচিত কি না, কিংবা থাকলেও তার ধরনটা কী রকম হবে, সে-সম্পর্কে বিতর্ক চলতে পারে। অন্তত কথাটা শুনলেই আজ আর কারো অমনি একেবারে 'হা-হা' করে ওঠা উচিত নয়। তবে শিক্ষাঙ্গনে কমপক্ষে শিক্ষকদের রাজনীতিচর্চা বা দলবাজি যে বন্ধ বা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত, এ নিয়ে মনে হয় দেশের অল্প মানুষই দ্বিমত করবেন। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকদের প্রকাশ্য দলীয় আনুগত্য, সক্রিয় রাজনৈতিক তৎপরতা যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান বিশৃঙ্খল-বিপর্যস্ত দশার জন্য বহুলাংশে দায়ী, একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। কিছু লোকের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ ছাড়া, এই দল বা 'রং'চর্চা কি শিক্ষার্থী বা শিক্ষাব্যবস্থা কারো সামান্যতম উপকারেও আসছে? এমনিতেই ছাত্রদের সামনে উন্নত চরিত্র ও অনুসরণযোগ্য আদর্শের প্রতীক হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে পারেন এমন শিক্ষকের সংখ্যা ইদানীং কমে আসছে। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থে শিক্ষকদের দ্বারা ছাত্রদের ব্যবহারের দৃষ্টান্তই বরং দেখা যাচ্ছে বেশি। প্রভাষক নিয়োগ থেকে উপাচার্য পদে মনোনয়ন পর্যন্ত সকল পর্যায়ে রাজনৈতিক বা দলীয় বিবেচনা যদি প্রধান হয়ে ওঠে, তবে সেখানে এমনটাই তো হওয়া স্বাভাবিক। এ অবস্থায় দেশের ভবিষ্যতের স্বার্থেই, শিক্ষাব্যবস্থাকে চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো পুনর্বিবেচনা ও বদলের কথা আমাদের জরুরিভাবে ভাবতে হবে। এটি আজ সময়ের দাবি। ছাত্ররাজনীতি বন্ধ বা স্থগিতের কথা উঠলে বিভিন্ন মহল থেকে বারবার একটি কথা বলা হয় : ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত আমাদের বিশাল অর্জনগুলো সব ছাত্ররাজনীতির ফল। কে অস্বীকার করবে? কিন্তু যাঁরা এই

www.pathagar.com

জানা কথাটা মনে করিয়ে দিতে চান, তাঁরাও কিন্তু সেদিনের ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে আজকের ছাত্ররাজনীতির বৃহদংশের মৌলিক বা গুণগত পার্থক্য অস্বীকার করেন না, করতে পারবেন না। তাঁরাও কিন্তু দেশের, পৃথিবীর আর পাঁচটি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের প্রয়োজন বা বাস্তবতা মেনে নিচ্ছেন। ক্যাম্পাসে শিক্ষকদের রং বা দলচর্চা বন্ধের দাবির মুখে কেউ নিশ্চয় বলবেন না, বায়ান্ন থেকে একাত্তর পর্যন্ত আমাদের ইতিহাস শিক্ষক-রাজনীতির ফল! তাহলে?

পাঠদান বা শিক্ষালাভের বিষয়টি যদি শ্রেণিকক্ষ থেকে বেরিয়ে শিক্ষকদের বাসাবাড়ি ও তথাকথিত কোচিং সেন্টারে এসে ওঠে, কিংবা দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের সর্বোচ্চ পদাধিকারীর দিনের বেশির ভাগ সময় যদি ক্যাম্পাসের বাইরে নানা ধরনের অনুষ্ঠান উদ্বোধন, ফিতা কাটা, বেলুন ওড়ানো, মোড়ক উন্মোচনের মতো বিষয়ে কেটে যায়, তবে সেদেশে শিক্ষার অপমৃত্যু কে রোধ করবে?

২০১১ *বুদ্ধিমুক্তির দায় ও দায়িত্ব (২০১৩)*

www.pathagar.com

শিক্ষার অপমৃত্যু : একজন শিক্ষকের দৃষ্টিতে

উনিশ শতকের ছয়ের দশকে ঢাকায় প্রথমে 'ব্রাহ্ম স্কুল' ও পরে 'জগন্নাথ স্কুল' হিসেবে যার যাত্রা শুরু, প্রায় সার্ধশতাব্দী পেরিয়ে তাই আজ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। ১৮৮৪ সালে কলেজে উন্নীত হওয়ার পর থেকে ২০০৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে কার্যক্রম শুরুর আগে পর্যন্ত এটি ছিল 'জগন্নাথ কলেজ', প্রথমে বেসরকারি ও পরে সরকারি। এ সুদীর্ঘ সময়ে দেশের বৃহত্তম মহাবিদ্যালয় হিসেবে এতদঞ্চলের উচ্চশিক্ষা বিস্তারে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একদা অবৈতনিক বিদ্যালয় হিসেবে যার প্রতিষ্ঠা, পরবর্তীকালেও কলেজ হিসেবে তা দেশের প্রায়-দরিদ্র, নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের উচ্চশিক্ষা লাভে আগ্রহী সন্তানদের ভরসাস্থল হয়ে উঠেছিল। একটা কথাই চালু ছিল : 'অনাথের নাথ জগন্নাথ'। আজকের শিক্ষার ক্রমবাণিজ্যিকীকরণের যুগে বিষয়টি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ও স্মরণযোগ্য। এদেশের প্রাতঃস্মরণীয় মনীষী-লেখক-পণ্ডিত ও প্রথিতযশা শিক্ষাবিদদের অনেকেই আগেপরে এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছেন। একইভাবে উপমহাদেশের অসংখ্য খ্যাতকীর্তি ব্যক্তিত্বের আলমা-মাতার ছিল এই জগন্নাথ কলেজ। এসব শিক্ষক ও ছাত্রের নামের তালিকা দিতে গেলে বোধহয় কয়েক পৃষ্ঠাতেও কুলোবে না। বিভাগপূর্ব আমল থেকে কেবল বিদ্যা বিতরণেই নয়, এদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অগ্রগমনেও প্রতিষ্ঠান হিসেবে জগন্নাথ কলেজের এবং এর শিক্ষক-ছাত্রদের অবদান এককথায় অতুলনীয়। আমাদের ভাষা আন্দোলন ও পরবর্তী স্বাধিকার-স্বাধীনতার সংগ্রামেও জগন্নাথ কলেজের শিক্ষক ও ছাত্ররা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রেখেছেন। সেদিক থেকে জগন্নাথ কলেজের ইতিহাস বা সে ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত যে-কোনো স্মৃতিচারণামূলক রচনাও আমাদের জাতীয় ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ হিসেবে গণ্য হবার দাবি রাখে। সম্প্রতি প্রকাশিত মির্জা হারুণ-অর-রশিদের *স্মৃতি-বিস্মৃতির জগন্নাথ কলেজ* বইটিকে আমরা সে গুরুত্বেই বিবেচনা করব।

www.pathagar.com

মির্জা হারুণ-অর-রশিদ জগন্নাথ কলেজের বাংলার প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। সুদীর্ঘ তিন দশক তিনি এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করে বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন। প্রথমে কলকাতা ও পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবন শেষ করে ১৯৬৩ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানেই প্রথমে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন ও ১৯৯৬ সালে এখান থেকেই অবসরে যান। এর মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি সরকারি কলেজে রূপান্তরিত হয়। সরকারিকরণের পর বদলিযোগ্য চাকরির অংশ হিসেবে, কিংবা অন্যান্য কারণেও আগেপরে তাঁর সহকর্মীদের অনেককে এ প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যেতে হয়, কেউ কেউ স্বেচ্ছায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনকি অন্য পেশায়ও যোগদান করেন। কিন্তু তিনি সেই বিরল ভাগ্যের (সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, জানি না) অধিকারীদের একজন প্রথম থেকে শেষাবধি যিনি এই প্রতিষ্ঠানেই চাকরি বা শিক্ষকতা করে গেছেন। সেদিক থেকে 'জগন্নাথ' নামটি তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে। তাঁর অগণিত ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু এবং অন্যান্য যাঁরা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন, তাঁদের তো জানবারই কথা, অপরিচিত পাঠকও এ বইটি পড়ে নিঃসংশয়ে সেটা উপলব্ধি করবেন। লেখকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস *জগন্নাথ কলেজ শতবর্ষ পূর্তি উৎসব স্মরণিকা* ১৯৯১-এ প্রকাশিত তাঁর 'বহে নিরন্তর' শীর্ষক রচনায় (আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের পরিশিষ্টেও যা সংকলিত হয়েছে) যা লিখেছিলেন, একটু দীর্ঘ হলেও এখানে তা উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না :

> জাতশিক্ষক অজিত গুহের উত্তরসূরি যদি কাউকে বলতে হয় তো তিনি হলেন মির্জা হারুণ অর রশিদ। অজিতবাবুর মতোই ছাত্রঅন্তপ্রাণ, পড়াশোনা থেকে শুরু করে গরিব ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার ফিসের বন্দোবস্ত করা সব ব্যাপারে তাঁর প্রখর দৃষ্টি। তাঁর সঙ্গে রাস্তায় হাঁটা মুশকিল। কোনো ছাত্রের সঙ্গে দেখা হলেই থামবেন। ক্লাস ঠিকমতো না করার জন্যে তাঁকে ধমক দেওয়া, তাঁর আসল ও নকল সমস্যা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং সমাধানের ভুল ও ঠিক পরামর্শ দেওয়া ছাড়াও এমনি একটু গল্প করা এসব কাজ করতে তিনি পদে পদে দাঁড়াবেন। রাগ করে তাঁর নাম দিয়েছিলাম 'টাউন সার্ভিস'। তখনকার দিনে সদরঘাট-গুলিস্তান রুটে টাউন সার্ভিসের লক্কড় বাস মিনিটে মিনিটে থেমে লোক নিতো বলে ঐ নামকরণ করা হয়। লেখাপড়ার ব্যাপারেও খুঁতখুঁতে মানুষ, তাঁর চোখা দৃষ্টির জন্যে হেলাফেলা করে একটা দরখাস্ত লেখার জো নেই। ইংরেজি বাংলা যে ভাষাতেই হোক, বাক্য গঠনে কি শব্দ চয়নে, কিংবা ভাষা ব্যবহারে একটা না একটা বানান ভুল তিনি বার করবেনই। একবার ভর্তি পরীক্ষায় একটি মেয়ে নিজের নামের বানান ভুল লেখায় তাকে কিছুতেই ভর্তি করবেন না, আমরা অনেক বলে-কয়ে তাঁর রাগ দূর করলাম। অজিতবাবুর মতোই তিনি পরম রবীন্দ্রভক্ত, আবার অজিতবাবুর মতোই পড়াশোনার ব্যাপারে ফাঁকিবাজি কিংবা চালিয়াতি সহ্য করতে পারেন না। প্রথম প্রথম তাঁর

www.pathagar.com

সাহচর্য আমার মতো ব্যাকরণ না জানা এবং বানান ভুল করা লোকের জন্য অস্বস্তিকর ছিল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে করতে আর তাঁর ধমক শুনতে শুনতে অসচেতনভাবে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। এ ফল আজও ভালোই ভোগ করে চলেছি। জগন্নাথ কলেজ থেকে বদলি হয়েছি অনেক দিন, কিন্তু এখনও দু'কলম লিখতে গেলে কোনো বানান কি শব্দ ব্যবহার নিয়ে খটকা লাগলে তাঁকে টেলিফোন করি, ঠিক জবাবটি পেয়ে যাই। সেই সঙ্গে উপরি জোটে শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁর আকর্ষণীয় ব্যাখ্যা। (পৃ.৩১৫)

অধ্যাপক হারুণের উল্লিখিত ব্যক্তিত্বের ছাপ তাঁর রচনাতেও পড়েছে। প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার তিনি জগন্নাথ কলেজের ইতিহাস লেখেননি, আর সেটা তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল না। যদিও সম্ভাব্য সে ইতিহাস লেখার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের সর্বাধিক সমাবেশ ঘটেছে এ বইটিতে। আর সে তথ্য সংগ্রহ ও তার অভ্রান্ততা নিশ্চিত করতে গিয়ে এই প্রবীণ বয়সেও যে-পরিশ্রম ও নিষ্ঠার তিনি পরিচয় দিয়েছেন তা যে-কোনো সৎ ও মেধাবী তরুণ গবেষকের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ী দৃষ্টান্ত হতে পারে। আত্মজীবনী তো নয়ই, এমনকি ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা বলতে যা বোঝায় এ বইটিকে ঠিক তা-ও বলা যাবে না। মজলিশি ঢংয়ে লেখা এই বইটিতে তিনি নিজের বয়ানে ও অন্যান্যের জবানিতে জগন্নাথ কলেজের স্মৃতিময় দিনগুলোকে জীবন্ত করে তুলেছেন। ইতিপূর্বে জগন্নাথ কলেজের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে অধ্যাপক মির্জা হারুণেরই সম্পাদনায় যে-স্মরণিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে সংকলিত তাঁর নিজ ও অন্যান্যদের রচনা থেকে স্থানে স্থানে প্রচুর উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছেন।

শিক্ষকতা বা অধ্যাপনা আর দশটা পেশার মতো একটা পেশা বা জীবিকা সংস্থানের উপায় মাত্র নয়, তার চেয়ে ভিন্ন বা অতিরিক্ত কিছু। শিক্ষককে বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর। অধ্যাপক হারুণ যে-সময়ের কথা লিখেছেন সে-সময় পর্যন্ত হয়তো কথাটা সত্যি ছিল। অন্তত শিক্ষকদের একটা বড় অংশ, নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারুন বা না-পারুন, কথাটা বিশ্বাস করতেন। ছাত্রছাত্রীদের শুধু সিলেবাস পড়িয়ে বা উপদেশ দিয়েই যাঁরা তাঁদের দায়িত্ব শেষ করতেন না, নিজের জীবনকেও তাদের সামনে বিদ্যানুরাগ ও মূল্যবোধের জীবন্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরার কমপক্ষে চেষ্টাটুকু তাঁদের অনেকেরই ছিল। অধ্যাপক অজিত গুহের মতো শিক্ষক হয়তো কোনোকালেই বেশি ছিলেন না, জগন্নাথের সে-অধ্যায়েও তিনি হয়তো ছিলেন সব অর্থেই ব্যতিক্রম। তবে, মত বা দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা সত্ত্বেও, সততা ও আদর্শবাদকে আলাদা করে চিনে নেওয়ার, তাকে সম্মান জানানোর সামর্থ্যটা সেদিন যেমন শিক্ষাঙ্গনে তেমনি বাইরের পরিবেশেও কমবেশি উপস্থিত ছিল। যাঁদের সে অভিজ্ঞতা বা হারানো বাস্তবতার সঙ্গে সরাসরি পরিচয় নেই, তাঁরাও মনে হয় অধ্যাপক মির্জা হারুণের বইটি পাঠে সেটা উপলব্ধি করতে পারবেন। তবে,

www.pathagar.com

এরই পাশাপাশি সে বিশ্বাস বা মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সূচনাও যে সে-কালেই ঘটেছিল, তারও কিছু অবিশ্বাস্যরকম প্রমাণ তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। অধ্যাপক হারুণ পেশাদার বুদ্ধিজীবী নন, লেখার কলাকৌশলও হয়তো তাঁর ততটা আয়ত্তাধীন নয়, ফলে কোনোরকম রাখঢাক না করেই কিছু তথ্য বা ঘটনার উল্লেখ তিনি তাঁর এ বইয়ে করেছেন, যা পড়লে আমাদের বিস্ময়ের অধিক বিস্ময় জন্মে। মনে হয় : 'কার নিন্দা করো তুমি, এ আমার এ তোমার পাপ'। ঘটনাগুলোর সাক্ষী বা প্রত্যক্ষদর্শী নিশ্চয় অনেকেই ছিলেন, যাঁদের কেউ কেউ আজও জীবিত আছেন, কিন্তু তাঁদের কারো লেখায় এমনকি জগন্নাথ কলেজকে নিয়ে স্মৃতিচারণায়ও আমরা সেভাবে ঘটনা বা বিষয়গুলোর উল্লেখ পাই না। প্রসঙ্গত শিক্ষাঙ্গনে অনিয়ম, দুর্নীতি, শিক্ষার্থীদের নকলপ্রবণতা, সন্ত্রাস ইত্যাদি যে-বিষয়গুলো নিয়ে আজ আমরা বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন, সোচ্চার, সাধারণভাবে ধারণা করা হয় এগুলো হল সাম্প্রতিক ব্যাধি। স্বাধীনতার পরই তা ব্যাপকতা লাভ, অর্থাৎ দ্রুত সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংক্রমিত করে, একথা যদিও বা সত্যি, কিন্তু এর বীজাণু যে আগেই, বিশেষ করে আমাদের 'স্বাধিকার' সংগ্রামের দিনগুলোতেই উপ্ত হয়েছিল, আর এ ব্যাপারে কেবল সরকার বা ছাত্ররাজনীতির ওপর দোষ চাপিয়ে পার পাওয়া যাবে না, আমাদের শিক্ষকসমাজ ও শিক্ষা প্রশাসনেরও এক্ষেত্রে কমবেশি ভূমিকা আছে, অধ্যাপক হারুণের এ বইটি পাঠে তা বোঝা যাবে। এদেশের একজন বিশিষ্ট ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ, অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তচিন্তার প্রবক্তা এবং সংশয়বাদী দার্শনিক হিসেবে যাঁর পরিচিতি ছিল, জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে খোদ শেখ সাহেব (তখনও তিনি বঙ্গবন্ধু হননি) যাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতেন, পরীক্ষার হলে ঢুকে তিনি শিক্ষকদের সরাসরি নির্দেশ দিতেন ছাত্রদের নকলের সুযোগ দেওয়ার জন্য। ভাবা যায়? লেখকের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করা যাক : "তিনি পরীক্ষার সময় রুমে গিয়ে 'ইনভিজিলেটর'দের ধমকানি দিয়ে বলে বেড়াতে লাগলেন– 'মিয়ারা পড়াইবার পার না আবার নকল ধরবার চাও।' ব্যস, আর যায় কোথায়! চারদিকে নকলের মহোৎসব শুরু হয়ে গেল। এই সময় কিছু 'ব্রিফকেস' শিক্ষকের অভ্যুদয় ঘটল অর্থাৎ পরীক্ষা শেষে 'ব্রিফকেস' ভর্তি করে খাতা নিয়ে এসে 'সাগরের পানিতে' ঢালতে শুরু করলেন।" (পৃ.১৬৮) কোনো রকম অসূয়া বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে যে লেখক একথাগুলো লেখেননি তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় অন্যত্র যেখানে তিনি উক্ত অধ্যক্ষের পাণ্ডিত্য, রসবোধ, উদার অন্তঃকরণ ও পরোপকার প্রবৃত্তির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। (রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন, "পরীক্ষাগারে বইখানা চাদরের মধ্যে নিয়ে গেলেই চুরি, আর মগজের মধ্যে করে নিয়ে গেলে তাকে কী বলব?" আমরা জানি না, স্বনামধন্য ওই শিক্ষাবিদ অনুরূপ কোনো দর্শন দ্বারা চালিত হতেন কি না।) শিক্ষকরাও (সবাই অবশ্যই নন) যে ব্যক্তিস্বার্থে কত কিছু করতে পারেন, কীভাবে

www.pathagar.com

ছাত্রদের ব্যবহার করতে পারেন, তার উদাহরণ হিসেবে লেখক একজন নাট্যকার-অধ্যাপকের (যিনি নাকি মাঝে মাঝে বডি-বিল্ডার ছাত্রের হোন্ডার পেছনে চেপে ক্যাম্পাসে আসতেন) নামোল্লেখ না করেও কয়েকটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। এদেশের শিক্ষার অধঃপাত তো কোনো এক সময়ে এক পক্ষের দ্বারা ঘটেনি! অধ্যাপক হারুণের বইটি পাঠে সেটা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়।

পাকিস্তান আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর সরকার-বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দ্বিতীয় সূতিকাগার বা 'অগ্নিকুণ্ড' (লেখক তাঁর বইয়ে বারবার শেষোক্ত শব্দটিই ব্যবহার করেছেন) বলে পরিচিত জগন্নাথ কলেজকে নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালে বিচিত্র কায়দায় ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে দ্বিখণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন ও সরকারি করা হয় (তখন অবশ্য 'সরকারিকরণ'-এর পরিবর্তে 'প্রাদেশিকীকরণ' কথাটা ব্যবহার করা হয়েছিল)। এই ঘটনা বা জগন্নাথ কলেজের ইতিহাসের এই পর্বের বিশদ বিবরণ লেখক দিয়েছেন বইয়ের সর্বশেষ 'জগন্নাথ কলেজের আঁষ শাঁস বদলে গেল যেদিন' শীর্ষক পরিচ্ছেদে। যা একইসঙ্গে কৌতূহলোদ্দীপক ও চিন্তা-উদ্রেককারী। এ প্রসঙ্গে লেখক মন্তব্য করেছেন : 'এ দেশের সর্ববৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জগন্নাথ কলেজে যুগে যুগে যে পরিবর্তন এসেছে তার সবটাই এসেছে মানুষের যৎপরোনাস্তি হস্তক্ষেপের ফলে বিশেষ উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়কে সামনে রেখে।' (পৃ.২১০) স্বনির্ভর এই প্রতিষ্ঠানটির সরকারিকরণের পেছনে বলা বাহুল্য শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট কোনো মহৎ উদ্দেশ্য কাজ করেনি। বরং এই পদক্ষেপের দ্বারা শিক্ষার সুযোগকে খর্বই করা হয়। যে-কারণে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানকালে ছাত্রদের '১১ দফা' দাবির প্রথম দফাটিতেই জগন্নাথসহ স্বাবলম্বী কলেজগুলোর 'প্রাদেশিকীকরণ' প্রত্যাহারের দাবিটি স্থান পায়। মোনায়েম খাঁর প্রাদেশিক সরকারের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিপ্রসূত এই সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় আগেপরে দেশের আরও কয়েকটি বৃহৎ সুখ্যাত ও ঐতিহ্যবাহী কলেজকে সরকারি করা হয়। স্বাধীনতা-উত্তর পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি বা জাতীয়করণের এই প্রবণতাটি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়। বলা যায় একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দাবিতেই পরিণত হয় এটি। এভাবে শিক্ষকদের সরকারি চাকুরে বা আরও পরে ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তায় পরিণত করার ফলে তাঁদের চাকরি ও জীবিকার নিশ্চয়তা হয়তো বেড়েছে, কিন্তু দেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার ওপর তার প্রভাব যে শেষপর্যন্ত ইতিবাচক হয়নি, একথা বোধহয় আজ নিঃসংশয়ে বলা যায়। বিশেষ করে শিক্ষার মানের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। শিক্ষার মান তো আর দালানের সৌকর্য ও চেয়ার-টেবিলের প্রাচুর্যের ওপর নির্ভর করে না। তা প্রধানত নির্ভর করে শিক্ষকের যোগ্যতা— বিদ্যানুরাগ, দায়িত্ববোধ ও নিষ্ঠার ওপর। আর শিক্ষকতা পেশায় স্বাধীনচিত্ততার কোনো বিকল্প নেই। অথচ সরকারিকরণের ফলে শিক্ষকের চাকরি বদলিযোগ্য ও অধ্যক্ষ তথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের 'এসিআর' (বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন) নামক খড়্গাধীন হয়ে

www.pathagar.com

পড়ায় শ্রেণিকক্ষের পরিবর্তে অধ্যক্ষের কক্ষে উপস্থিতি এবং শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পাঠদানের পরিবর্তে তদবির-তোষামোদই শিক্ষক সমাজের একাংশের কাছে মুখ্য করণীয় হয়ে ওঠে। এ পর্যায়ে উপযুক্ত যোগ্যতা বা পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই, কেবল প্রভাবশালীদের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে ও অন্যান্য উপায়ে এমন সব শিক্ষক জগন্নাথসহ রাজধানীর নামীদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভিড় জমাতে থাকেন, যাঁদের আর যে-গুণই থাক, বিদ্যার প্রতি অনুরাগ ছিল না। জগন্নাথ কলেজের এই পর্বের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে অধ্যাপক হারুণ লিখেছেন :

> অপ্রত্যাশিত, জিঘাংসাপূর্ণ করাল কালো ছায়া জগন্নাথ কলেজের এতদিনের শিক্ষা দীক্ষা, উন্নত ও রুচিশীল পরিবেশ, এতদিনের লালিত সব ঐতিহ্যকে গ্রাস করতে শুরু করল। যেসব খ্যাতিমান, প্রথিতযশা অধ্যাপক জগন্নাথ কলেজের শিক্ষার পরিবেশকে তাঁদের বিদ্যাবত্তা ও আত্মত্যাগের গৌরব দিয়ে আলোকিত করে রেখেছিলেন তাঁরা সব কোণঠাসা হয়ে ম্রিয়মাণ ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়লেন। হুড় হুড় করে মফস্বলের সদরের বহু কলেজ থেকে সব অধ্যাপক অধ্যাপিকা এসে কলেজ ভরে যেতে লাগল। আত্মোৎসর্গকারী সব অধ্যাপক যাঁরা কলেজকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন, যাঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করে কলেজকেই আপন গৃহ মনে করতেন তাঁদের চোখের সামনেই শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ ধসে যেতে লাগল, কেবল মনে মনে গভীর হতাশা এবং বেদনা পোষণ করা ছাড়া তাঁদের কিছু করার ছিল না। (পৃ.২২৭)

তবে এ রকম বিষাদাক্রান্ত সুরের সাক্ষাৎ পুরো বইটিতে কমই পাওয়া যাবে। একটি বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতার আলোকে আসলে আমাদের শিক্ষার আদর্শচ্যুতি ও ক্রমিক অপমৃত্যুর বিবরণই লেখক দিয়েছেন তাঁর এ-বইটিতে। তবে গুরুতর দুঃখের কথাকেও লেখক যেন এ বইয়ে হালকা চালে ও রসময় করে পরিবেশন করতে চেয়েছেন। নিন্দা-সমালোচনাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাজস্তুতির আড়ালে ঢাকা পড়েছে। সন্দেহ নেই লেখকের রসবোধ ও মজলিশি মেজাজ পুরো বইটিকে একধরনের রমণীয়তা দিয়েছে। তবে রসের ভিয়েন কোথাও কোথাও পাত্র উপচেও পড়েছে, পাঠকের পক্ষে যার স্বাদগ্রহণ দুঃসাধ্য হতে পারে বলে আমার ধারণা। লেখকের বইটিতে পুনরাবৃত্তি আছে। একই কথা একই বা হয়তো ভিন্ন প্রসঙ্গে কখনো নিজের জবানিতে আবার কখনো অন্যের উদ্ধৃতিতে তিনি একাধিকবার বলেছেন। প্রসঙ্গ থেকে প্রায়ই প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছেন, তারপর 'খেই হারিয়ে ফেলেছি' বলে আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে এসেছেন। এ ধরনের স্মৃতিচারণামূলক বা মজলিশি রচনার যা একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। পুরনো সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি এই বয়সেও দিনের পর দিন অমানুষিক শ্রম করেছেন। বহু কষ্টে, অনেক গলিঘুঁজি হাঁটকে, হয়তো সেই সহকর্মীর নিকট বা দূর-সম্পর্কিত কাউকে খুঁজে পেয়েছেন। সেই আবিষ্কার কাহিনি

www.pathagar.com

এবং সেই সূত্রে পাওয়া সহকর্মী ও তাঁর বংশধরদের হালহকিকত—চাকরি-ব্যবসা এমনকি বৈবাহিক অবস্থার তথ্য দিতেও নিশ্চেষ্ট থাকেননি। এমন তথ্য, জগন্নাথ কলেজের ইতিহাসের সঙ্গে যার হয়তো কমই সম্পর্ক আছে কিংবা একেবারে নেই বললেও চলে। প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি তাঁদের রচিত গ্রন্থের দীর্ঘ তালিকা সংযোজন করতেও ক্লান্তি বোধ করেন নি। এসবই তাঁর বন্ধুবৎসল, ছাত্রবৎসল, উপচিকীর্ষু মনের পরিচায়ক। তবে পাঠকের জন্য তা সব সময় উপাদেয় না-ও হতে পারে।

প্রচুর ছাপার ভুল রয়েছে বইটিতে। আর তা প্রায় ক্ষেত্রে প্রুফসংশোধনের ত্রুটি বা গাফিলতিজনিত বলেই মনে হয়। যদিও ভাষা ও বানানের ব্যাপারে ভীষণরকম সংবেদনশীল একজন লেখকের বইয়ে বানান ভুলের এ ধরনের নমুনা লেখক ও পাঠক উভয়ের জন্যই শোকাবহ। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের আশায় ছোটখাটো কিছু তথ্যবিভ্রাটের (যা খুব সম্ভব লেখকের অসতর্কতাজনিত) প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। যেমন ৫২ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে 'জাতিসংঘের প্রেসিডেন্ট উ-থান্টের নামে তাঁকে ডাকতাম'। উথান্ট জাতিসংঘের প্রেসিডেন্ট নয়, সেক্রেটারি জেনারেল অর্থাৎ মহাসচিব ছিলেন। ২১৫ পৃষ্ঠায় জগন্নাথ কলেজ সরকারিকরণের পর গভর্নর মোনায়েম খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে জনৈক অধ্যাপকের তোষামোদীর নমুনা হিসেবে লেখক যে 'আর বাংলাদেশ ব্যাংকের এই সুদৃশ্য বিরাট বিল্ডিংয়ের কথা ভুলে যান কেন? সেটাও তো স্যারেরই কীর্তি' কথাটি উদ্ধৃত করেছেন, সেটি নিশ্চয় 'বাংলাদেশ ব্যাংক' নয়, 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান' হবে।

প্রসঙ্গত বলতে চাই, সামান্য সম্পাদকীয় স্পর্শ পেলে উল্লিখিত দোষত্রুটিগুলি কাটিয়ে বইটি একটি সর্বাঙ্গসুন্দর প্রকাশনা হতে পারত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যত নামীদামি লেখকই হন না কেন, সম্পাদকের টেবিল না হয়ে সাধারণত কোনো পাণ্ডুলিপি ছাপতে যায় না। সাম্প্রতিককালে আমাদের প্রকাশনা বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, মুদ্রণশিল্পেরও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। বাহ্যিক পারিপাট্যে আজ যে-কোনো সারহীন গ্রন্থও চোখ কাড়তে সক্ষম। তবে সম্পাদনার মতো একটি জরুরি কর্তব্যের প্রতি প্রকাশকদের যূথবদ্ধ উদাসীনতা আজ আমাদের প্রকাশনাশিল্পের ভবিষ্যতকেই যেন সংশয়াচ্ছন্ন করে তুলছে। দুঃখের পরিমাণটা বাড়ে যখন আলোচিত বইটির মতো কোনো মূল্যবান বা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থকে সে উদাসীনতা বা অবহেলার শিকার হতে দেখি।*

২০১১ *হীনম্মন্যতার বিপক্ষে (২০১১)*

---

* *স্মৃতি-বিস্মৃতির জগন্নাথ কলেজ* : মির্জা হারুণ-অর রশিদ। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা : ২০১০।

www.pathagar.com

মানুষ গড়ার শিক্ষা চাই

একটি জাতির সামনে এগিয়ে চলার জন্য কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্যের বিকল্প নেই। শিক্ষা তেমনি একটি ক্ষেত্র যেখানে এই জাতীয় ঐকমত্যের প্রয়োজন সর্বাধিক। কারণ একটি জাতির গন্তব্য বা অভিমুখ নির্ধারণে তার শিক্ষাব্যবস্থাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সরকার আসবে, যাবে। প্রতিটি সরকারই তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ বা আর্থ-সামাজিক নীতির আলোকে নানা ক্ষেত্রে উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করবে। তাই বলে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর শিক্ষার দিগ্‌দর্শন বদলে যাবে, প্রতিটি সরকার ক্ষমতায় এসে জাতিকে একটি নতুন শিক্ষানীতি উপহার দেবে বা অন্তত দেবার চেষ্টা করবে, প্রতিবার সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তককে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে, এটা নিশ্চয় অভিপ্রেত নয়। যদিও অভিজ্ঞতা আমাদেরকে তেমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে।

সরকারকে ধন্যবাদ, কিছু না হলেও তাদের কাছ থেকে আমরা একটি মোটামুটি ভালো শিক্ষানীতি পেয়েছি, যার অনেকগুলি বিষয়ই সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে। মানুষের পৃথিবীতে কোনো কিছুই হয়তো পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত বা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। বর্তমান শিক্ষানীতি নিয়েও তেমন সমালোচনার সুযোগ রয়েছে। তারপরও এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা গেলে তা জাতির জন্য এক দীর্ঘস্থায়ী সুফল বয়ে আনবে বলে আশা করা যায়। তবে সংশয় দেখা দিয়েছে মহলবিশেষের বিরোধিতার মুখে সরকার শেষপর্যন্ত এই শিক্ষানীতির কতটা বাস্তবায়ন করতে পারবে। যাঁরা এই শিক্ষানীতির বিরোধিতা করছেন, শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তাঁদের মূল অভিযোগ বা আপত্তিটা হল এতে ধর্মশিক্ষাকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয় নি কিংবা তাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। যদিও বক্তব্যটি মোটেও তথ্য বা যুক্তিসমর্থিত নয়। অন্ততপক্ষে তাঁরা সেভাবে তাকে তুলে ধরতে পারেন নি।

নীতি বা আদর্শের স্তরে যা-ই ভাবা কিংবা উচিত বলে মনে করা হোক না কেন, বিদ্যমান বাস্তবতায় শিক্ষার মূল ধারায় ধর্মীয় শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত না করে আমাদের উপায় নেই। কিছু বুদ্ধিজীবী ছাড়া, এ সত্য বোধ করি আজ সকলেই উপলব্ধি

www.pathagar.com

করেন। সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি বা অবস্থানও এ ব্যাপারে মোটের ওপর বাস্তববুদ্ধির পরিচায়ক। কিন্তু অন্যান্য পক্ষকেও নিশ্চয় বুঝতে ও মনে রাখতে হবে, আমাদের মতো একটি গরিব ও উন্নয়নশীল দেশে পাশাপাশি তিন বা চার ধারার শিক্ষা সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধি ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য অর্জনেই সফল হবে না। ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার সুযোগ বজায় রেখে আমরা যেমন মাদ্রাসাশিক্ষার বিরোধিতা করতে পারি না, একইভাবে কওমি মাদ্রাসার মতো একেবারে স্বতন্ত্র ধারার শিক্ষাব্যবস্থা চালু রেখে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার বিরোধিতা করারই বা যুক্তি কী? এ অবস্থায়, সকল দিক বিবেচনায়, যা বাস্তবসম্মত তা হল, গুরুত্বের হেরফের ঘটিয়েও, বিদ্যমান ধারাগুলোর মধ্যেকার পার্থক্যকে যত দূর অবধি সম্ভব কমিয়ে আনা।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে দীর্ঘদিন যাবত। একাডেমিক আলোচনাচক্র থেকে ক্ষমতার উঁচু মঞ্চ পর্যন্ত সর্বত্র এই পরিবর্তনের আবশ্যকতা কমবেশি অনুভূত হয়ে আসছে। সংস্কারের লক্ষ্য বা তার ধরন সম্পর্কে মতভেদ থাকতে পারে, আছেও। তবে ঔপনিবেশিক আমলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা যে একটি স্বাধীন জাতির আত্মবিকাশের সহায়ক নয়, হতে পারে না, এ প্রশ্নে সবাই মোটের ওপর একমত বলেই মনে হয়। তবে এই ঐকমত্যের চরিত্রটা বহুলাংশে তাত্ত্বিক। আসল কথা হল, দু-দুবারের পরাধীনতামুক্তিও এ ব্যাপারে আমাদের প্রকৃত মোহমুক্তি ঘটাতে পারেনি।

ঔপনিবেশিক শিক্ষাকাঠামোর কথা যখন উঠলই, তখন এ-প্রসঙ্গে দু-চার কথা বলে নেওয়া যাক। আমাদের দেশে বর্তমানে যে-শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে তার কাঠামো এমনকি প্রকরণ-পদ্ধতিগুলোও সেই ইংরেজ আমলের। ঔপনিবেশিক শাসকরা তাদের নিজেদের স্বার্থেই তা প্রবর্তন করেছিল, অনেক ভেবেচিন্তে। আর তাদের উদ্দেশ্য অর্জনেও তা সহায়ক হয়েছিল। ব্রিটিশরা যে দুশো বছর এদেশ শাসন করে গেল তা কেবল ক্ষমতার দাপটে নয়, ওই শিক্ষাব্যবস্থার 'গুণে'ও। পরবর্তী সময়েও পাকিস্তানি শাসকরা তাদের নিজেদের স্বার্থে ওই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছে। কিন্তু স্বাধীনতার চার দশক পর আজও আমরা যে এক্ষেত্রে কোনো মৌলিক বা তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আনলাম না—'করি-করি' করেও করলাম না কিংবা করতে পারলাম না, তার কারণ কী? আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আমাদের উপলব্ধির মধ্যেই কিছু ফাঁক বা ফাঁকি রয়েছে। আসলে সামাজিক বা জাতীয় স্বার্থের দিকে চেয়ে আমরা সাধারণত যা উচ্চারণ করে থাকি, ব্যক্তি পরিবার গোষ্ঠী বা শ্রেণিগত স্বার্থে বিশ্বাস বা কামনা করি তার উল্টোটা। এবং স্বভাবতই আমাদের প্রয়াস সচেতন বা অচেতনে সেই কামনার পথেই পরিচালিত হয়।

বিদেশী ডিগ্রি, বিদেশে চাকরি এবং সম্ভব হলে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস, নিদেনপক্ষে দেশেই বিদেশী বা বহুজাতিক কোনো প্রতিষ্ঠানে মোটা বেতনের

www.pathagar.com

চাকরির মোহ যদি ব্যক্তিজীবনে আমাদের স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষার শীর্ষবিন্দুকে অধিকার করে রাখে, তবে সেক্ষেত্রে সমাজ বা জাতির স্বার্থ আমাদের কাছে তেমন গুরুত্ব না পাবারই কথা। ফলে ঔপনিবেশিক শিক্ষাকাঠামোর পরিবর্তন, জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ও চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার লক্ষ্য এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে নিতান্ত কথার কথাই হয়ে রয়েছে। তা উদ্যোগহীন চিন্তা-ভাবনা, আলাপ-আলোচনা, কিংবা বড়জোর কাগুজে পরিকল্পনার স্তরেই সীমাবদ্ধ। শুধু তা-ই নয়, স্বাধীন দেশেও আজ আমরা যখন স্বাধীন জাতির উপযোগী একটি নয়া শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলি, তখনও সেই ঔপনিবেশিক শিক্ষার 'গুণ' নানাভাবে আমাদের পিছু টেনে রাখে। একথা যদি সত্যি হয় যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ঔপনিবেশিক আমলের ফসল, তাহলে এক্ষেত্রে যে-কোনো পরিবর্তন বা সংস্কারের গোড়ার কথাই তো হওয়া উচিত ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণা বা মানসিকতার ভূত ছাড়ানো। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা কতটা সচেতন ও আন্তরিক? আমাদের মধ্যে যাঁরা মাদ্রাসাশিক্ষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপারে সোচ্চার ও সক্রিয় তাঁরা কি জানেন না, নাকি ভুলে যান যে, হেস্টিংসের আমলে মূলত তাঁরই আগ্রহাতিশয্যে এদেশে সরকারি উদ্যোগে মাদ্রাসাশিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দেওয়ার কাজটি আসলে ঔপনিবেশিক শাসকদের স্বার্থেই হয়েছিল? আর একধরনের ভেদবুদ্ধিই এর পেছনে কাজ করেছিল?

শিক্ষার সুযোগকে সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে সম্প্রসারিত করা; দেশীয় পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের সাথে শিক্ষাব্যবস্থাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা; শিক্ষাকে জাতীয় চেতনা, সামাজিক দায়িত্বশীলতা, ঐতিহাসিক বোধ ও নৈতিক মূল্যবোধের উদ্বোধক করে তোলা—এসব তো শেষ পর্যন্ত পরাধীন আমলে ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রবর্তিত ও টিকিয়ে রাখা সেই শিক্ষাদর্শের প্রভাব থেকে মুক্তির প্রশ্নটির সঙ্গেই সম্পর্কিত। কথাটা আমরা যে জানি না তা নয়। তবু শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার বা পরিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে দেখা যায় আমরা বারবার সেই পুরনো দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাই পরিচালিত হই। শিক্ষার সর্বস্তরে জাতীয় ভাষার প্রয়োগ—তার সম্ভাব্যতা ও কার্যকারিতার প্রশ্নে—প্রকাশ্যে স্বীকার করতে চাই বা না-চাই—আমাদের দ্বিধান্বিত মানসিকতা এর একটি বড় প্রমাণ। প্রসঙ্গত বলা দরকার, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে বাংলা ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে যে-যুক্তিগুলো দেওয়া হয়, তার মধ্যে প্রধান হল পাঠ্যপুস্তকের অভাব। আসলে এটি এমন একটি যুক্তি যাকে ঠিক এককথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শুধুমাত্র কথা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ও এটি নয়। এর সঙ্গে একটি দায়িত্বশীলতার প্রশ্ন জড়িত। সে দায়িত্বকে এড়িয়ে বা পাশ কাটিয়ে আমরা যদি স্রেফ তর্কের খাতিরেই তর্ক চালিয়ে যাই, তা সে পক্ষে বা বিপক্ষে যেদিকেই হোক,

www.pathagar.com

তাতে বাস্তবতার এমন কিছু হেরফের ঘটবে না। প্রকৃতপক্ষে ঘটছেও না। উচ্চশিক্ষায় উপযুক্ত মানের প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকের অভাবের এ-সমস্যাটির মোকাবেলা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকেও আগেপরে করতে হয়েছে। তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরাও বোধহয় এ ব্যাপারে একটি মধ্যপন্থা অবলম্বনের কথা ভাবতে পারি।

আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রধান শর্ত হল তাকে অবশ্যই কর্মসংস্থানমুখী হতে হবে। শিক্ষা যদি তা উত্তর জীবনে অন্ন বা জীবিকার নিশ্চয়তা দিতে না পারে তবে সে-শিক্ষা অন্য যে বা যত মূল্যই বহন করুক না কেন, তা শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবে না। কিন্তু শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য তো শেষপর্যন্ত মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো। একটি স্বাধীন দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে অবশ্যই পরিকল্পিত ও পরিচালিত হতে হবে স্বাধীন, যথার্থ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও সামাজিক অর্থে দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে। সেখানে ছাড় বা আপসের কোনো সুযোগ নেই। আর ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কশূন্যভাবে নাগরিক বা মানুষ তৈরির এই কর্তব্যটি সাধন করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

সামাজিক গতিশীলতার সাথে যে-কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থারও অবক্ষয় ঘটে। আদর্শ ব্যবস্থাকেও ফলে পরিবর্তিত সময়ের নিরিখে বারবার যাচাই ও পুনর্মূল্যায়ন করতে হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আমরা শুধু যে দীর্ঘদিন হয় ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খলমুক্ত হয়েছি তা-ই নয়। সে শৃঙ্খলমুক্তির ব্যাপারটাও ঘটেছে এক স্বল্পস্থায়ী কিন্তু ব্যাপক মাত্রার সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে, সমাজের গোড়া অবধি যা নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। সমাজ-কাঠামো বা উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো মৌলিক পরিবর্তন না ঘটলেও, আমাদের আর্থ-সামাজিক শৃঙ্খলা বা বিন্যাসের ক্ষেত্রেও ইতিমধ্যে লক্ষ্যযোগ্য পরিবর্তন, মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বড় রকমের ভাঙচুর ঘটেছে। পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে এই সামঞ্জস্যহীনতার কারণেই ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার ইতিবাচক দিকগুলোও আমাদের দেশে বর্তমানে তার কার্যকারিতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। আজ শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও শিক্ষার মানের অবনতি দৃষ্টে আমরা যখন পুরনো দিনগুলির কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস মোচন করি তখন আসলে এই সত্যটি আমাদের মনোযোগ এড়িয়ে যায়, কিংবা হয়তো ইচ্ছা করেই আমরা চোখ ফিরিয়ে থাকি।

ব্রিটিশ-ভারতের জন্য যে-শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব (১৮৩৫) করেছিলেন লর্ড ব্যাবিংটন মেকলে, মনে রাখতে হবে, তা তাঁদের নিজ দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অবিকল প্রতিরূপ নয়। তাহলেও ইউরোপীয় শিক্ষার কিছু কিছু সদ্‌গুণ যে এতে বর্তেছিল এবং পরিণামে তা যে আমাদের জন্য ফলদায়ক হয়েছে, সেকথা অস্বীকার করবার জো নেই। তবে পাশাপাশি এ-ও সত্যি, মূলত বৈষম্যের ওপরই এই

www.pathagar.com

শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। উপনিবেশের জন্য সীমিতসংখ্যক খণ্ডিত ব্যক্তিত্বের মানুষ—আরও সঠিক অর্থে তাঁবেদার সৃষ্টি করাই ছিল এর মৌলিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। যোগ করা নয়, মিল ঘটানো নয়, ব্যবধান সৃষ্টিতেই এই শিক্ষার সার্থকতা। এ প্রসঙ্গে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙলার প্রথম গ্রাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য : "শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউলকারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিনযাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের ফটিকচাঁদ তিলার্দ্ধ মনে স্থান দেন না। বিলাতে কানা ফসেট্ সাহেব, এদেশে সার অস্‌লি ইডেন্, ইঁহারা তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিকচাঁদের সেই ভাবনা। রামা চুলোয় যাক্, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।" ('লোকশিক্ষা', ১২৮৫) আজ স্বাধীন দেশে আমরা সেই ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থারই জের টেনে চলেছি শুধু নয়; ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে সে ভেদবুদ্ধিকে দৃঢ়মূল করার লক্ষ্যেই যেন আমাদের সকল কর্মপ্রয়াস পরিচালিত। মেকলের শিক্ষা পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল একদল নেটিভ তৈরি করা, যারা রক্তে ও গাত্রবর্ণে এদেশীয় হয়েও চিন্তা-চেতনায় হবে বিদেশী শাদা প্রভুদের অনুসারী। আজ স্বাধীন দেশেও সাম্রাজ্যবাদের অনুগ্রহজীবী বা বশংবদ তৈরি করা ছাড়া আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আর কোন ভূমিকাটি পালন করছে? ফলাফল : বৈষম্য বাড়ছে, বাড়ছে রামাদের সংখ্যা। অন্য প্রান্তে শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে ফটিকচাঁদদের।

শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত করার কথাটা আমাদের দেশে মাঝেমাঝেই ওঠে। আর প্রতিবারই এর পক্ষে-বিপক্ষে নরম-গরম নানা বাক্য বিনিময় হয়। প্রতিবারই হয়। এ থেকে মনে হয় বিষয়টির পক্ষে ও বিপক্ষে দুদিকেই বলবার মতো কথা আছে এবং তাতে যুক্তির ভাগও নেহাত কম নয়। আসলে 'ছাত্রানাম অধ্যয়নং তপঃ' বহুব্যবহৃত এই উদ্ধৃতিটি পরিহার করেও বোধহয় বলা যায় যে, অখণ্ড মনোযোগে বিদ্যার্জনই একজন শিক্ষার্থীর প্রধানতম কর্তব্য হওয়া উচিত। এ নিয়ে কোনো মহলেই অন্তত প্রকাশ্যে কোনো দ্বিমত আছে বলে মনে হয় না। শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক শিক্ষাজীবনকে ব্যাহত বা বাধাগ্রস্ত করতে পারে এমন পরিবেশ বা পরিস্থিতি রাষ্ট্র, সমাজ বা শিক্ষাঙ্গন যেখানেই বিরাজ করুক না কেন, তা অনভিপ্রেত। আর তাকে প্রতিহত করা শেষপর্যন্ত দেশ ও জাতির স্বার্থেই জরুরি। বর্তমানের ভিতের ওপরই ভবিষ্যতের ইমারত গড়ে ওঠে। সুতরাং বর্তমানের কর্তব্যকে উপেক্ষা করে কেবল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা যেমন কোনো কাজের কথা নয়, তেমনি আবার বর্তমানের প্রয়োজনের কাছে ভবিষ্যতকে জলাঞ্জলি দেওয়া বা তাকে বাজি রাখা, সে-ও ঠিক সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। ছাত্র ও তরুণরা হল জাতির ভবিষ্যৎ। তারা যদি উপযুক্ত পরিবেশে সঠিকভাবে গড়ে উঠতে না পারে তবে তা জাতির ভবিষ্যতের জন্যই

www.pathagar.com

ক্ষতিকর। দেশের ভবিষ্যত রাজনৈতিক নেতৃত্বের বেলায়ও একথা প্রযোজ্য। শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান রাজনৈতিক ডামাডোল যদি জাতির ভবিষ্যত নেতৃত্বের শূন্যতা পূরণের বদলে তার শূন্যগর্ভতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তবে তার চেয়ে মর্মান্তিক বিষয় আর কী হতে পারে? সে অবস্থাটা নিশ্চয় কারোই কাম্য নয়। আমাদের ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ কিংবা তারও পরে ১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রাম পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রদের নেতৃস্থানীয় ভূমিকার কথা মনে রেখেও, আজ ছাত্ররাজনীতির নামে সারা দেশে যা চলছে তাকে কি কোনোক্রমে মেনে নেওয়া যায়? ছাত্ররাজনীতির সেই গৌরবময় দিনগুলোতেও আমাদের দেশের একজন প্রধান লেখক ও চিন্তাবিদ আবুল ফজল, যাঁকে বাংলার বিবেক নামে অভিহিত করা হত, শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতিচর্চার বিরুদ্ধে তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। এমনকি ছাত্র সংগঠনের সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়েও তিনি একাধিকবার দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর এ অভিমত তুলে ধরেন। দেশের আরেকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক কবীর চৌধুরীও স্বাধীনোত্তরকালে একটি পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ছাত্ররাজনীতির বিরুদ্ধে তাঁর মত ব্যক্ত করেছিলেন বলে মনে পড়ে। তাঁদের সে দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সবাই আমরা সহমত না হতে পারি, কিন্তু কোনো অসৎ বা প্রতিক্রিয়াশীল উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে তাঁরা কথাটা বলেছেন, এমন ভাবার কারণ নেই। শিক্ষাবিদ হিসেবে নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকেই হয়তো তাঁরা তাঁদের আন্তরিক উপলব্ধির কথা বলেছিলেন। বস্তুত প্রশ্নটি যদিও ছাত্রদের রাজনীতিচর্চা বা তাদের অতিরিক্ত রাজনীতি-মনস্কতা নিয়ে, তবু এর যৌক্তিকতা কিংবা আজ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ছাত্ররাজনীতির রূপ বা ধরনটি কী হবে, তা যতটা না রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্কের, তার চেয়ে বেশি মনে হয় শিক্ষাবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক মহলে গভীর অনুধ্যান বা বিচার-বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত।

জীবনে অর্থ, কীর্তি ও খ্যাতি লাভের হাজারটা সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ থাকতে পারে। সহজ পথে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও হয়তো লাভ করা যায়। কিন্তু জ্ঞান অর্জনের পথ একান্তভাবেই কঠিন ও দূরতিক্রম্য। একজন বিদ্যার্থীর নিষ্ঠা, অনুরাগ ও অধ্যবসায়ই কেবল এ পথে তার সঙ্গী হতে পারে। এ কথা সত্যি যে পৃথিবীর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই সকল ছাত্র ঠিক বিদ্যা বা জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্য নিয়ে লেখাপড়া করে না। তবে শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত নাগরিক তথা ভবিষ্যত পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে গড়ে তোলার পাশাপাশি তার মধ্যে প্রকৃত বিদ্যানুরাগ ও জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সঞ্চার করাও শিক্ষার উদ্দেশ্য। সত্যি কথা বলতে কি, এই দুই উদ্দেশ্য অর্জনেই আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো, কিংবা আরও সঠিক অর্থে, শিক্ষাব্যবস্থা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। ফলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিবছর ডজন ডজন কৃতী ছাত্র বেরুচ্ছে ঠিকই,

www.pathagar.com

কিন্তু তাদের কজন শেষাবধি আমাদের বিদ্যা ও মননচর্চার জগতে মূল্যবান বা তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারছে? একইভাবে আমাদের ছাত্ররাজনীতিও দেশকে নিয়মিত বহু 'রাজপথ কাঁপানো' ছাত্রনেতা উপহার দিচ্ছে। তবে নিকট বা দূর ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় রাজনীতিতে নেতৃত্বের শূন্যতা পূরণে তারা কতটা ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আশা করা যায়?

বর্তমানে আমাদের শিক্ষাঙ্গনে যে পরিবেশ বিরাজ করছে তাকে আর যা-ই হোক, বিদ্যার্জনের জন্য আদর্শ বা সুষ্ঠু পরিবেশ বলা যায় না। তবে এর জন্য কোনো একক ঘটনা বা কারণকেও বোধহয় দায়ী করা ঠিক হবে না। তাছাড়া একদিনে বা কোনো একজনের দ্বারা এ পরিবেশ সৃষ্টি হয় নি। অনেকদিন ধরে অনেকগুলো কার্যকারণের মিলিত ফল হল আজকের এ অবস্থা। একে যদি একটি সমস্যা হিসেবে ধরা হয়, তবে জানতে হবে তার শেকড় অনেক দূর অবধি প্রসারিত। শিক্ষাঙ্গনে এই নৈরাজ্য বা বিশৃঙ্খলাকে যদি ব্যাধি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবে নিঃসন্দেহে তা সামাজিক ব্যাধি। সমাজের সামূহিক মূল্যবোধহীনতার পরিপ্রেক্ষিতটিকে বাদ দিয়ে এর নিরাময় খুঁজতে যাওয়াটা হবে নিতান্তই পণ্ডশ্রম। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে ছাত্র ও শিক্ষকদের যেমন দায়িত্ব আছে, তেমনি বা তার চেয়েও বেশি দায়িত্ব এ ব্যাপারে সমাজ ও রাষ্ট্রের। শিক্ষাঙ্গন তো বৃহত্তর সমাজ বা রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপ নয়। সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রবাহিত বিরুদ্ধ বাতাস সুতরাং শিক্ষাঙ্গনে ঢুকে পড়ে সেখানে চাঞ্চল্য জাগাতেই পারে। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা কেউ বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়। তারাও বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে রক্ত ও অর্থের সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ। তাদেরও পেছনে-সঙ্গে আছে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-প্রতিবেশী। শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্যই যদি না হয়ে দাঁড়ায় মানুষকে কতগুলো বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত করা, তাহলে সমাজের আলোড়ন-বিলোড়ন, হতাশা-অস্থিরতা থেকে শিক্ষাঙ্গন বা শিক্ষার্থীদেরই বা দূরে রাখার উপায় কী? পাশাপাশি এ কথাই বা কী করে অস্বীকার করি যে রাষ্ট্রীয় জীবনের সমূহ দায়িত্ব যদি কোমলমতি শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের ঘাড়েই অনুভব করে বা করতে বাধ্য হয়, তবে সেক্ষেত্রে সহজেই তাদের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটা স্বাভাবিক। তরুণ মনের ঔৎসুক্য, সদাজাগ্রত কৌতূহলকে যদি সময়ে একাগ্র জ্ঞানসাধনার পথে পরিচালিত করা না হয়, পরিবর্তে তারুণ্যের উদ্দামতা যদি তাদের ভাসিয়ে নেয়, তবে জাতির ভবিষ্যতের জন্য তা হবে উদ্বেগজনক। সুতরাং সমস্যাটা আসলে ঔচিত্য-অনৌচিত্যের নয়, একান্তভাবে সম্ভাব্যতা-অসম্ভাব্যতার। আর শেষপর্যন্ত তা বৃহত্তর সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গেই সম্পর্কিত। রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে যদি স্থিতিশীলতার অভাব ঘটে, সেখানে যদি সুষ্ঠু জীবন বিকাশের শর্ত উপস্থিত না থাকে, উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি না হয়, তবে শিক্ষাঙ্গনেই বা শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হবে কিভাবে?

www.pathagar.com

সমাজে ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, আমলা, রাজনীতিক, সৈনিক সবারই নির্ধারিত পালনীয় দায়িত্ব এবং তার নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ও পরিধি আছে। কে না জানে নিজস্ব অবস্থানে থেকে আপন দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেই একজন দেশ ও জাতির সর্বোত্তম সেবা করতে পারে। তারপরও সময়ের প্রয়োজন ও দেশের ডাকের কাছে কর্তব্যের সে সীমা-সরহদ কি কখনো লোপ পায় না? পায়, আর বিশেষ করে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর বেলায় আমরা তাকে প্রায় অনিবার্য বলেই মেনে নিই। তবে সে হল আপৎকালীন ভূমিকা। আর একটা জাতির জন্য চিরস্থায়ী আপৎকাল নিশ্চয় কারো কাম্য নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বোধ করি ছাত্রদের রাজনীতি-সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও, এবং এদেশের অতীত সকল আন্দোলন-সংগ্রামে (যার চরিত্র ছিল মূলত রাজনৈতিক) ছাত্রদের গৌরবময় ভূমিকার স্বীকৃতি দেওয়ার পরও, অনেকে অতিরিক্ত রাজনীতি-মনস্কতা ও সক্রিয়তার অর্থে ছাত্রদের রাজনীতিচর্চার বিরোধিতা করেন।

ছাত্ররাজনীতির একটা ইতিবাচক দিক হল তা তরুণ মনে আদর্শবাদের সঞ্চার করে। আর তরুণ বয়সে কারো মধ্যে যদি আদর্শবাদের প্রভাব প্রবল না হয়, তবে পরবর্তী জীবনে সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতময় চলার পথে, জটিল-কঠিন বাস্তবতায় তারা আদর্শবাদী মনোভাবের পরিচয় দিতে পারবে এমন আশা প্রায় সুদূরপরাহত। অন্যদিকে তথাকথিত ছাত্ররাজনীতির নেতিবাচক দিকটি আদর্শহীন দলাদলি, হানাহানি এবং শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও অরাজকতা সৃষ্টির রূপে আজ অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষগোচর।

এটা ঠিক যে, ব্যবস্থার বদল ছাড়া, কেবল কিছু মানুষের সদিচ্ছা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা সমাজ-রাষ্ট্রের নানা ক্ষেত্রে আমরা আজ যে-গভীর সঙ্কটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি, তার থেকে উত্তরণ অসম্ভব। তবে কোনো ব্যবস্থা, তা যতই ভালো বা ত্রুটিমুক্ত হোক, তাকে সঠিকভাবে পরিচালনা বা এগিয়ে নেওয়ার জন্য যদি সমাজে যথেষ্ট সংখ্যক সৎ ও যোগ্য লোকের অভাব ঘটে, তাহলে সে ব্যবস্থাও আগেপরে ভেঙে পড়তে বাধ্য। আর ব্যবস্থা পরিবর্তনের কাজটিও তো মানুষই করে। আদর্শবাদী, দায়বদ্ধ মানুষ। সুতরাং সেই মানুষ তৈরির কর্তব্যটিকে উপেক্ষা করে, বা তাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে, শিক্ষা পরিকল্পনায় কোন ইতিবাচক ফলটি আমরা প্রত্যাশা করি?

২০১০ *হীনম্মন্যতার বিপক্ষে (২০১১)*

www.pathagar.com

শিক্ষা ও শিক্ষকতা প্রসঙ্গে দু-চার কথা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে ছেলেবেলা থেকেই 'কেবল স্মরণশক্তির ওপর সমস্ত ভর না দিয়ে' শিক্ষার্থীর জন্য 'চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার অবসর' সৃষ্টির কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায় 'নতুবা সে ছেলেই থাকিবে, মানুষ হইবে না।' দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের সমস্ত আয়োজন আজ যেন এই চিন্তা ও কল্পনাশক্তি বিকাশের পথ রুদ্ধ করার লক্ষ্যেই পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের দেশের একজন কৃতী শিক্ষক অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তাঁর শিক্ষকতা জীবনের স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'নিষ্ফলা মাঠের কৃষক'। তাতে তাঁর ক্ষুব্ধ মন্তব্য : 'যাদের বড় মানুষ করে গড়ে তুলব বলে একদিন সব ছেড়ে শিক্ষকতার জগতে এসে দাঁড়িয়েছিলাম তারা নিজেরাই তো এর বিরুদ্ধে। সারা দেশ এর বিরুদ্ধে। কেউ তো আজ আর সত্যিকার মানুষ হতে চাচ্ছে না। বড় স্বপ্ন, বড় মূল্যবোধসম্পন্ন হৃদয়বান আর সমৃদ্ধ মানুষ। সবাই তো বৈষয়িক ভবিষ্যত আর চাকরির হীন কুঠুরিতে নিজেকে সীমিত করে ফেলতে চাইছে।' দুঃখ করে তিনি আরও লিখেছেন, 'শিক্ষকতা আজ দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোচ্চসংখ্যক মানুষের সেই আলোকবিস্তারী পেশা, যে-পেশায় জ্ঞানচর্চার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি কিন্তু শিক্ষকদের মধ্যে তার আগ্রহ সবচেয়ে কম। ... শিক্ষকদের জীবনে জ্ঞানের চর্চা না-থাকায় ছাত্রের জীবনে তা স্বাভাবিকভাবেই সংক্রমিত হয় না।' আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ যখন একথাগুলো লিখেছিলেন তারপর এর মধ্যে আরও অনেকগুলো বছর গড়িয়ে গেছে। আমাদের শিক্ষার পরিবেশ-পরিস্থিতির অধিকতর অবনতি বৈ উন্নতি হয়নি।

বিদ্যামন্দির বলার তো প্রশ্নই ওঠে না, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আজ আর আমাদের দেশে যাকে বলে বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রও নয়। সম্ভাব্য অল্পসংখ্যক ব্যতিক্রম বাদে—সৌজন্যবশত যদি 'দোকান' শব্দটি পরিহার করি—হয়ে উঠেছে এক একটি বিদ্যাবিপণি। 'ফেলো কড়ি মাখো তেল' এই নীতিতেই সেগুলো পরিচালিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

ফল দাঁড়িয়েছে এই যে প্রাক-ভর্তি কোচিং, ভর্তি, শিক্ষকের কাছে 'ব্যাচে পড়া', নোট সংগ্রহ, তারপর পরীক্ষার ফরম ফিল-আপ থেকে ফলাফল প্রকাশ অবধি সর্বত্রই আজ অর্থের অবাধ দৌরাত্ম্য। আর কেবল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোই এর উদাহরণ নয়, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও যেন সে দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হচ্ছে। তারাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? সময় বা সমাজের চাহিদা, বিশ্বায়ন বা বাজার অর্থনীতির অজুহাত তো তারাও ব্যবহার করতে পারে! জেনেশুনেই আমরা যেন এই 'বাস্তবতা'কে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছি। সরকার বা সমাজ কোনো দিক থেকেই এর বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর প্রতিরোধের লক্ষণ আপাতত দৃষ্ট হচ্ছে না। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সর্বত্র এই বিদ্যাবাণিজ্য ক্রমে বীভৎস থেকে বীভৎসতর রূপ নিচ্ছে। আর এ বিষয়ে আমরা যে অসচেতন তা-ও বলা যাবে না। সভা-সেমিনার-গোলটেবিলে, পত্রিকার কলামে নিয়ত এ সম্পর্কে আমাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ব্যক্ত হচ্ছে। মহাজন কণ্ঠে ও কলমে নানা প্রস্তাব ও সুপারিশ উচ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব কার, একা সরকারের, নাকি শিক্ষক, অভিভাবক, সুশীল সমাজেরও এ ক্ষেত্রে কিছু করণীয় আছে, স্পষ্ট নয়। অন্তত ঘুরে দাঁড়াবার কোনো লক্ষণ অদূর ভবিষ্যতে দেখা যাচ্ছে না। একে অপরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বা পরস্পরের ওপর দোষারোপ করে আমরা প্রত্যেকেই যেন নিজের দায় এড়াতে চাইছি।

কথাটা পুরনো এবং হয়তো বহু-ব্যবহারে জীর্ণ হলেও, শিক্ষককে বলা হয় 'মানুষ গড়ার কারিগর'। আর এখানে মানুষ মানে উচ্চায়ত, আলোকিত, বিকশিত মানুষ। শুধু দু-পেয়ে জীব নয়; প্রকৃত সংবেদনশীল, ন্যায়নীতিবোধসম্পন্ন, সংস্কৃতিমান প্রাণী। শুধু সিলেবাস পড়িয়ে ও পরীক্ষা নিয়ে সে মানুষ গড়া সম্ভব নয়। এ জন্য শিক্ষকের ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আরও কিছু করণীয় আছে। সত্যি কথা বলতে কি, আজ শিক্ষাঙ্গনে এই মানুষ গড়ার কর্তব্যটিই সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত হচ্ছে। এবং বললে অত্যুক্তি হবে না, আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনাও সে কর্তব্য পালনকে ক্রমে দুরূহ থেকে দুরূহতর করে তুলছে। বই মুখস্থ করে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল হয়তো করা যায়, তবে সে ভালো ফলাফলকে মনুষ্যত্বের বা সুনাগরিকত্বের মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা যায় না। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের আর বইও পড়তে হয় না, বাছাই করা গোটা কয়েক প্রশ্নের নোট মুখস্থ করলেই চলে। তারপর বিদেশের অনুকরণে সম্প্রতি সেমিস্টার পদ্ধতির নামে একধরনের 'পিস-মিল' বিদ্যাচর্চাকে এদেশে দৃঢ় ভিত্তি দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা কোনো কিছুকেই আমরা যেন বিবেচনায় আনতে রাজি নই। স্লোগান একটাই : দুনিয়ার সঙ্গে তাল মেলাতে হবে! এমনিতেই ব্যবসা

www.pathagar.com

শিক্ষার প্রসার ও প্রতাপের মুখে দেশে আজ কলা বা মানবিক বিদ্যার তো বটেই, এমনকি বিজ্ঞান শিক্ষারও প্রায় পিছুহটা অবস্থা। বৈশ্বিক প্রবণতাটা যদিও সাধারণভাবে সে-মুখী, তবু সারা বিশ্বের সঙ্গে সমান্তরালভাবে যে আমাদের দেশে ব্যাপারটি ঘটছে তা বলা যাবে না। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন কিংবা বিজ্ঞান শিক্ষাকে উপেক্ষা করে বা তার গুরুত্বকে খাটো করে দেখে কোনো সত্যিকার আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও স্বাবলম্বী জাতি কি গড়ে উঠতে পারে? আর অন্তত মানবিক বিদ্যা বা বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে খণ্ডিত পাঠ যে কার্যত অর্ধশিক্ষা বা মূর্খতা প্রসারেরই নামান্তর, তা-ও কি কাউকে বলে বা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে হবে? এভাবে আমরা যে আসলে আমাদের জাতির জন্য এক নিশ্চিত বিপর্যয়কেই ত্বরান্বিত করছি, তা কি আমরা বুঝতে অক্ষম? নাকি জেনেশুনেই আমরা সঙ্কীর্ণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থে ব্যাপারটিকে উৎসাহিত করছি?

অন্য সব পেশার মতো শিক্ষকতাও একটা পেশা, ঠিকই। আর সেদিক থেকে এ পেশায়ও পেশাদারি মনোভাব ও দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই। তবে আর দশটা পেশার সঙ্গে শিক্ষকতা কিংবা চিকিৎসা পেশাকে এক করে দেখা ঠিক হবে না। এর সঙ্গে একটা মানবসেবার মনোভাব ও সামাজিক দায়বোধের সম্পর্ক আছে। বেশিদিন আগের কথা নয়, এদেশেই বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিক্যাল কলেজের সর্বোচ্চ ডিগ্রি ও কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল নিয়েও অনেকেই নিজ গ্রাম বা এলাকায় এসে শিক্ষকতা বা চিকিৎসা পেশায় আত্মনিয়োগ করতেন। পেশা সেদিন তাঁদের কাছে সেবাব্রতের নামান্তর ছিল। সেদিনও অন্য মনোবৃত্তির লোক যে এ পেশায় ছিলেন না, তেমন কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। সংখ্যায় ও হারেও হয়তো তাঁরা ন্যূন ছিলেন না। তবে আজকের মতো তাঁরা সেদিন নেতৃত্বে বা প্রাধান্যে আসতে পারেন নি।

কোনো রকম আদর্শবোধের প্রেরণায় নয়, নিতান্ত অনন্যোপায় হয়ে যাঁরা শিক্ষকতা পেশায় এসেছেন, শিক্ষক না হয়ে বরং পুলিশ বা শুল্ক কর্মকর্তা হতে পারলে যাঁরা হয়তো বর্তে যেতেন, কিংবা অর্থবিত্ত ও ক্ষমতার অধিকারী আত্মীয় বা প্রতিবেশী ব্যবসায়ী বা সরকারি কর্মকর্তাটির সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করে যাঁরা হীনম্মন্যতায় ভোগেন, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের ক্ষেত্রে তেমন লোকেরাই সম্ভবত একদিন অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু আজ পুরো দৃশ্যপটটি বলতে গেলে তাঁদের দখলে। এ অবস্থায় প্রকৃত সৎ, আদর্শবাদী ও বিদ্যাব্রতীদেরই যেন অসহায়, কোণঠাসা অবস্থা। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাস ও দুর্নীতির যে প্রকোপ বহুদিন যাবত লক্ষ করা যাচ্ছে, তার প্ররোচনা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রধানত শিক্ষাঙ্গনের বাইরে থেকে এলেও, নিজস্ব এলাকায় আমাদের শিক্ষকসমাজ কি

www.pathagar.com

প্রকৃত নীতিগত অবস্থান ও আত্মমর্যাদাবোধ থেকে কখনো এর মোকাবেলায় উদ্যোগী বা সচেষ্ট হয়েছেন, অন্তত সংঘবদ্ধভাবে? একথা কি সত্যি নয় যে, শিক্ষকসমাজের মধ্য থেকেও কেউ কেউ কখনো কখনো এসব নৈরাজ্য বা উচ্ছৃঙ্খলতার পেছনে উস্কানিদাতার ভূমিকা নেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে? সম্মান বা মর্যাদা তো আদায়ের বিষয় নয়। তা অর্জন করতে হয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক আজ আমাদের সমাজে যতটা না আন্তরিক বা হার্দিক, তার চেয়ে বেশি মনে হয় বাণিজ্যিক। এ অবস্থায় শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের যথার্থ শ্রদ্ধাবোধের অভাব কিংবা ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি নিয়ে আমরা আজ কেবল উদ্বেগই প্রকাশ করতে পারি। অবস্থার পরিবর্তনের জন্য দরকার যেমন রাষ্ট্র বা সমাজে, তেমনি শিক্ষাঙ্গনেও প্রকৃত আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিত্বের, দৃঢ়চরিত্র নেতৃত্বের। তা আমরা কবে ফিরে পাব? কিংবা আদৌ কখনো পাব কি? তাহলে শিক্ষার্থীরা কাদের দেখে শিখবে, উদ্বুদ্ধ হবে?

২০১০ *হীনম্মন্যতার বিপক্ষে (২০১১)*

www.pathagar.com

মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষাদর্শ

রমাঁ রঁলা লিখেছেন, তিনটি পেশার মানুষকে গান্ধী অপছন্দ করতেন : উকিল, ডাক্তার ও শিক্ষক। এর মধ্যে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ ছিল, তাঁরা এদেশের মানুষকে নিজেদের ভাষা ও চিন্তাকে ভুলতে শেখাচ্ছেন, শিশুদের ঘাড়ে এক জাতীয় অধঃপতনের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর আর একটি বড় অভিযোগ ছিল, শিক্ষকরা ছেলেমেয়েদের মন ও চরিত্রের দিকে আদৌ নজর দেন না, এবং তাঁরা কায়িক শ্রমকে অবহেলা করতে শেখান। তাঁর মতে, যে-দেশের শতকরা আশি ভাগ মানুষ কায়িক শ্রমে জীবিকা নির্বাহ করে, সে দেশে এটা অপরাধের শামিল। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কথাগুলো বলা হলেও, এখানে দোষটা মূলত শিক্ষাব্যবস্থার। আমরা আজ যাকে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা বলি, আর পাশ্চাত্যের আদর্শে ও আদলে যা গড়ে উঠেছে, গান্ধীর আপত্তিটা বলা বাহুল্য তার সম্পর্কে। যন্ত্রনির্ভর ও বস্তুতান্ত্রিক আধুনিক সভ্যতার প্রতি গান্ধীর বিরাগের ব্যাপারটি সর্বজনবিদিত। তাঁর মতে, যন্ত্র মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করে। তিনি এমনও বলেছেন, স্বাধীনতার ফলে যদি যন্ত্রের গোলামি করতে হয় তবে তার চেয়ে ইংরেজের গোলামি ভালো। এ প্রসঙ্গে 'হিন্দ স্বরাজ' গ্রন্থে তাঁর মন্তব্য : 'একজন ভারতীয় রকফেলার আমেরিকান রকফেলারের চেয়ে কোনো অংশে ভালো হবেন না।'

যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে গান্ধীর উপর্যুক্ত আপত্তির সঙ্গে আমরা সবাই হয়তো সর্বাংশে একমত হব না। স্বাধীনতার পর গান্ধীর প্রিয় শিষ্য নেহরুর নেতৃত্বে খোদ ভারত সরকার গান্ধী-প্রচারিত চরকার অর্থনীতি বা স্বনির্ভর গ্রামসমাজের ধারণাকে গ্রহণ না করে বরং উল্টো পথে অর্থাৎ ভারি যন্ত্রনির্ভর বৃহৎ শিল্প গড়ার দিকে অগ্রসর হয়। যে-প্রক্রিয়ায় ভারত আজ উন্নয়নশীল বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতির দেশগুলোর একটি। যদিও সেই ভারতে অসংখ্য মানুষ আজও চরম দারিদ্র্য—শোষণ বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার, বাস করছে তারা অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে। পুঁজিবাদী সমাজকাঠামো বজায় রেখে এ অবস্থার অবসান সম্ভব হবে বলেও মনে হয় না। পারমাণবিক বোমার অধিকারী হওয়ার চেয়ে দেশের সুষম

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটানো নিশ্চয় অনেক কঠিন। কঠিন মানব বিকাশের কাজটিও। আর এরই প্রাসঙ্গিকতায় গান্ধী বা রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষদের চিন্তার শরণাপন্ন হতে হয় আমাদের বারবার। এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও হতে হয়। পুঁজিবাদের সমালোচনা কখনো কখনো করলেও, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ দুজনের কেউই অবশ্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিবর্তন বা সমসমাজ কায়েমের কথা অন্তত সেভাবে বলেন নি। এমনকি এখানে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের নাম আমরা একসঙ্গে উচ্চারণ করলেও, এবং উভয়েই তাঁরা পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করলেও, রবীন্দ্রনাথও অনেক প্রশ্নে গান্ধীর সঙ্গে একমত হন নি। যেমন চরকা কাটাকে আর দশটা ছোটখাটো কাজের মতোই একটা কাজ বলেই যে তিনি শুধু মনে করেছেন, কিংবা বলেছেন চরকা কাটাতেই স্বরাজ আসবে না, তা-ই নয়; গান্ধীর অসহযোগের নীতির ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিমত প্রকাশ্যেই জানিয়েছেন। গান্ধীর অসহযোগের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা দেশে অসংখ্য ছাত্র ও শিক্ষক যখন গোলাম তৈরির কারখানা-জ্ঞানে ইংরেজের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে বেরিয়ে আসে, তখনও রবীন্দ্রনাথ তা সমর্থন করেন নি। যদিও পরবর্তীতে স্বদেশী শিক্ষার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে তিনি সহায়তা করেছেন। এখানে আমাদের আলোচ্য অবশ্য গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্ক নয়—গান্ধীর শিক্ষাচিন্তা।

গান্ধী তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় প্রধান গুরুত্ব দিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষার ওপর। তিনি এর নাম দিয়েছেন 'বুনিয়াদি শিক্ষা'। এটি তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনার—তিনি যার নামকরণ করেছেন 'নয়ী তালিম'—প্রাথমিক স্তর। এর মেয়াদ হবে সাত বছর। এই সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীরা প্রবেশিকা মানের শিক্ষা অর্জন করবে। তবে শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। আর অবৈতনিকভাবে এই শিক্ষা প্রদান করা হবে। শিক্ষার এই স্তরে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছাত্রদের স্বাস্থ্যজ্ঞান, খাদ্যতত্ত্ব এসব বিষয়েও ধারণা দেওয়া হবে। সবচেয়ে বড় কথা, এই শিক্ষা হবে কর্মমুখী। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছাত্রজীবনেই সবাইকে কোনো না কোনো কাজ করতে হবে। নিজের কাজ নিজে করতে শিখতে হবে। লেখাপড়ার পাশাপাশি পরিবারে বাবা-মার কাজে সাহায্য করতে হবে। গান্ধী লিখেছেন, 'সাত বছর শিক্ষার পর ছেলেমেয়েরা সকলেই উপার্জন করতে শিখবে, এটাই আমরা আশা করব।' আরও একধাপ এগিয়ে গান্ধী অবশ্য বলেছিলেন, কাজের বিনিময়ে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত অর্থেই বিদ্যালয়ের খরচ, শিক্ষকদের বেতন ইত্যাদি নির্বাহ করা হবে। তাঁর মতে, এর ফলে ছাত্রদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। তারা স্বাবলম্বী হয়ে বেড়ে উঠবে। সর্বোপরি জীবনের গোড়া থেকেই তারা শ্রমকে মর্যাদা দিতে শিখবে। ১৯৩৭ সালের নভেম্বরে মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে

www.pathagar.com

গান্ধী তাঁর এই শিক্ষা পরিকল্পনা তুলে ধরেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম প্রণয়নের জন্য সম্মেলনে ড. জাকির হোসেনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি উক্ত পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করার পর কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলোতে গান্ধীর প্রস্তাবিত বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ উদ্দেশ্যে প্রতি প্রদেশে সরকারিভাবে কিছু বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে দু-বছরের মাথায় দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সবকটি প্রদেশেই কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পদত্যাগের ফলে এই বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্তনের কাজ ব্যাহত হয়। ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়ও এই কার্যক্রম আবার বাধাগ্রস্ত হয়। তবে বিচ্ছিন্ন ও পরীক্ষামূলকভাবে সারা ভারতেই বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্তন প্রয়াস চালু থাকে। স্বাধীন ভারতে সরকারি খাতের বা মূলধারার শিক্ষায় মোটের ওপর পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ও অনুবর্তন চলতে থাকলেও, তারই পাশাপাশি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদীদের উদ্যোগে ও বেসরকারিভাবে গান্ধীর শিক্ষাদর্শের প্রয়োগ প্রচেষ্টাও লক্ষ করা যায়। ভারতের জাতীয় মানস ও চরিত্র নির্মাণে এই বিকল্প ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিরাট ভূমিকা রেখেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বাসকালে ডারবানে নিজের প্রতিষ্ঠিত 'টলস্টয় ফার্মে'ই গান্ধী তাঁর শিক্ষাদর্শের প্রথম প্রয়োগ ঘটান। পরবর্তীকালে ভারতে এসে প্রথমে প্রাথমিক স্তরে ও পরে প্রাক-প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরে তাঁর প্রচারিত 'বুনিয়াদি শিক্ষা'র ধারণাটিকে তিনি সম্প্রসারিত করেন। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য আমরা এখানে উদ্ধৃত করতে পারি : 'এখন থেকে আমাদের শিক্ষা আর ৭ থেকে ১৪ বছরের বালক-বালিকাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত জীবনই অতঃপর আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্র হবে। আর সমস্ত শিক্ষাই হবে বুনিয়াদি পদ্ধতিতে অর্থাৎ জীবনের সঙ্গে যোগ রেখে।' তাঁর প্রচারিত বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আহমেদাবাদে যে 'সত্যাগ্রহ আশ্রম' তিনি প্রতিষ্ঠা করেন, তাতে শিক্ষকদের জন্য কতগুলো ব্রত পালনের কথা বলা হয়। এর মধ্যে প্রথমটিই হল 'সত্যের ব্রত'। গান্ধীর মতে সাধারণভাবে সত্যাশ্রয়ী হওয়াই যথেষ্ট নয়। এমনকি দেশের জন্যও মিথ্যা বা প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া চলবে না। সত্যের জন্য বাবা-মা ও অন্য গুরুজনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে, তা-ও করতে হবে। দ্বিতীয় যে ব্রতটির কথা গান্ধী বলেছেন তা হল, অহিংসা। আর এ ক্ষেত্রেও কেবল জীবহত্যা না করাই যথেষ্ট নয়। এমনকি শত্রুকেও আঘাত করা যাবে না। প্রেম দিয়ে তাকে জয় করতে হবে। অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধ করতে হবে, তবে তা অহিংস পথে। প্রয়োজনে নিজের জীবন দিতেও তৈরি থাকতে হবে। তিন নম্বরে তিনি গুরুত্ব দিয়েছের কৌমার্য ব্রত পালনকে। কারণ গান্ধীর মতে, এ ছাড়া পূর্বোক্ত দুটি ব্রত পালন 'এক রকম অসম্ভব'। নারীকে কামনার চোখে না দেখাই যথেষ্ট নয়। নিজের ভেতরের

www.pathagar.com

পশুপ্রবৃত্তিগুলোকে দমন করতে হবে, এমনকি চিন্তার জগতেও তাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। বিবাহিত পুরুষকে স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুর মতো জীবনযাপন করতে হবে। চার নম্বরে গান্ধী রসনা সংযমের কথা বলেছেন। যেসব খাদ্য বা পানীয় মানুষের ভেতর পশুপ্রবৃত্তিকে উদ্রিক্ত করে কিংবা যা না খেলেও চলে, তা বর্জন করতে হবে। এরপর যে-দুটি ব্রতের কথা গান্ধী বলেছেন তা হল 'চৌর্য পরিহারের ব্রত' ও 'অধিকার ত্যাগের ব্রত'। চুরি বলতে আমরা সাধারণত অন্যের জিনিস না বলে গ্রহণ করাকেই বুঝি। কিন্তু গান্ধীর মতে যাতে আমাদের প্রয়োজন নেই কিংবা যা না হলেও আমাদের চলে তা গ্রহণ করাও এক রকম চুরি। দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার মতো জিনিস যা আমরা প্রকৃতির কাছ থেকে পাই, তার অতিরিক্ত সামান্য কিছুও গ্রহণ না করে সহজ-সরলভাবে জীবন নির্বাহ করতে হবে। এছাড়াও গান্ধী বিদেশী ও কলে তৈরি জিনিস পরিহার এবং স্বদেশী হস্তজাত পণ্য ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি নির্ভীকতার ওপর। গান্ধীর মতে, ভীরু লোক কখনো অহিংসব্রতী বা সত্যানুসারী হতে পারে না। প্রকৃত আদর্শবাদীকে রাজভয়, জনমত ও পরিবারের ভয়, মৃত্যুভয়সহ সকল রকম ভীতিকে জয় করতে হবে।

গান্ধীর অহিংসার আদর্শকে অনেকে ক্লীবের দর্শন বলে মনে করে। অথচ নির্ভীকতাকে গান্ধী সবার ওপর স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'একটা গোটা জাতির নির্বীর্যতা থেকে আমি বরং হিংসাকেই শ্রেয় জ্ঞান করব সহস্রবার। নিজেই নিজের অপমানের পঙ্গু সাক্ষী হয়ে ভারত বসে থাক, তার চেয়ে আমি অনেক বেশি পছন্দ করব যদি সে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে উদ্যত হয়।' অহিংস নীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'অন্যায়ের প্রতি ভালোমানুষের মতো আত্মসমর্পণের নাম অহিংসা নয়—অত্যাচারীর প্রবল ইচ্ছার বিরুদ্ধে অহিংসা দাঁড়ায় শুধু আত্মার শক্তিতে।'

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরও এই আত্মার শক্তিতে বলীয়ান হতে হবে।

২০১০ *হীনম্মন্যতার বিপক্ষে* (২০১১)

www.pathagar.com

ঔপনিবেশিক শিক্ষাদর্শের বিরোধিতায় রবীন্দ্রনাথ

"সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে। এতদিন আমরা ইস্কুল-কলেজে যে শিক্ষা লাভ করিতেছিলাম তাহাতে আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে। আমরা তাহা মুখস্থ করিয়াছি, আবৃত্তি করিয়াছি, শিক্ষালব্ধ বাঁধি বচনগুলিকে নিঃসংশয়ে চূড়ান্ত সত্য বলিয়া প্রচার করিতেছি। যে ইতিহাস ইংরেজি কেতাবে পড়িয়াছি তাহাই আমাদের একমাত্র ইতিহাসের বিদ্যা, যে পোলিটিক্যাল ইকনমি মুখস্থ করিয়াছি তাহাই আমাদের একমাত্র পোলিটিক্যাল ইকনমি। যাহা-কিছু পড়িয়াছি তাহা আমাদিগকে ভূতের মতো পাইয়া বসিয়াছে : সেই পড়া বিদ্যা আমাদের মুখ দিয়া কথা বলাইতেছে, বাহির হইতে মনে হইতেছে যেন আমরাই কথা বলিতেছি। আমরা মনে করিতেছি, পোলিটিক্যাল সভ্যতা ছাড়া সভ্যতার আর কোনো আকার হইতেই পারে না। আমরা স্থির করিয়াছি, য়ুরোপীয় ইতিহাসের মধ্য দিয়া যে পরিণাম প্রকাশ পাইয়াছে জাতিমাত্রেরই সেই একমাত্র সঙ্গতি। যাহা অন্য দেশের শাস্ত্রসম্মত তাহাকেই আমরা হিত বলিয়া জানি এবং আগাগোড়া অন্য দেশের প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা স্বদেশের হিতসাধন করিতে ব্যগ্র।" রবীন্দ্রনাথ কথাগুলো লিখেছেন তাঁর 'জাতীয় বিদ্যালয়' প্রবন্ধে। ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ২৯ শ্রাবণ কলকাতা টাউন হলের এক সভায় পঠিত এবং ওই বছরই *বঙ্গদর্শন*-এর ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত অভিভাষণটিতে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, "শিক্ষা আমাদিগকে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে"। 'অস্থিমজ্জার মধ্যে দাসখত বহন করে জন্মগ্রহণ করা', 'পরের দ্বারা তাড়িত না হয়ে' কিছু করতে অক্ষম, 'শিক্ষার নিচে চাপা পড়া' এ-অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন চিন্তা ও আপন শক্তির চরম বিকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন তিনি। জোর দিয়েছিলেন 'পাণ্ডিত্যের বিদেশী বেড়ি ভেঙে ফেলে পরিণত জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া'র আবশ্যকতার ওপর। এ-ও বলেছিলেন, "পাঠ্যপুস্তকটির সঙ্গে আমাদের যে কথাটি না মিলিবে তাহার জন্য আমরা যেন লজ্জিত না হই। এমন-কি আমরা

www.pathagar.com

ভুল করিতেও সংকোচ বোধ করিব না। কারণ ভুল করিবার অধিকার যাহার নাই সত্যকে আবিষ্কার করিবার অধিকারও সে পায় নাই। পরের শত শত ভুল জড়ভাবে মুখস্থ করিয়া রাখার চেয়ে সচেষ্টভাবে নিজে ভুল করা অনেক ভালো।" জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটিকে অভিনন্দিত করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "শিক্ষার দ্বারা আমরা যে পূর্ণপরিণত আমরাই হইব, আমরা যে ইংরেজি লেকচারের ফোনোগ্রাফ, বিলিতি অধ্যাপকের শিকল-বাঁধা দাঁড়ের পাখি হইব না, এই একান্ত আশ্বাস হৃদয়ে লইয়া আমি আমাদের নূতনপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যামন্দিরকে আজ প্রণাম করি।" এভাবে, সরাসরি 'উপনিবেশ' শব্দটি ব্যবহার না করেও, আমাদের মনোজগতে ঔপনিবেশিকতার প্রভাব এবং তা সৃষ্টিতে শিক্ষার মুখ্য ভূমিকা শনাক্ত ও তার সমালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বিভিন্ন রচনায়, বিশেষ করে শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলির ছত্রে ছত্রে যে সচেতনতার পরিচয় ছড়িয়ে আছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা যথাসম্ভব তাঁর নিজ জবানিতেই তাঁর শিক্ষাচিন্তার অপেক্ষাকৃত স্বল্প-আলোচিত এই পরিচয়টি তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

২

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার একটি মূলকথা হল, শিশুবয়স থেকেই শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের যোগ থাকতে হবে। আনন্দহীন শিক্ষা শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের অনুকূল নয়। তাঁর মতে, অত্যাবশ্যক শিক্ষার সঙ্গে স্বাধীন পাঠ না মিশালে ছেলে ছেলেই থেকে যায়, মানুষ হতে পারে না। আর আনন্দের সঙ্গে পড়তে পড়তে পড়বার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পায়। ('শিক্ষার হেরফের', ১২৯৯) চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে এ-দুটিকে অত্যাবশ্যক গণ্য ক'রে তিনি বলেছেন, শিশু বয়সেই শিক্ষার্থীদের ওপর বিদেশী ভাষার বোঝা চাপানোর ফলে আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রকৃতির সত্যরাজ্যে প্রবেশ করবার অবকাশ থাকে না, সাহিত্যের কল্পনারাজ্যে প্রবেশের দ্বারও তাদের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। (ঐ) তাঁর মতে, আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় 'স্মরণশক্তির ওপর সমস্ত ভর' দিতে গিয়ে 'চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার অবসর' সৃষ্টির কর্তব্যটি উপেক্ষিত হচ্ছে। আর তার ফল যা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "স্তূপ উঁচা করিতেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণ করিতেছি না। ... মাল-মশলা যাহা জড়ো হইতেছে তাহা প্রচুর ...। মানসিক অট্টালিকা নির্মাণের উপযুক্ত এত ইঁট-পাটকেল পূর্বে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। কিন্তু সংগ্রহ করিতে শিখিলেই যে নির্মাণ করিতে শেখা হইল ধরিয়া লওয়া হয়, সেইটেই একটা মস্ত ভুল।" (ঐ) আমাদের প্রচলিত মুখস্থবিদ্যানির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার বাহন' (১৩২২) প্রবন্ধে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি মন্তব্য করেছেন : "যে ছেলে

www.pathagar.com

পরীক্ষাশালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে খেদাইয়া দেওয়া হয়; আর যে ছেলে তার চেয়েও লুকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায়, সেই বা কম কী করিল?" মুখস্থ করে পাস করাকে চৌর্যবৃত্তির সঙ্গে তুলনা করে তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, "যারা বই মুখস্থ করিয়া পাস করে তারা অসভ্যরকমে চুরি করে, সভ্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তারাই?" বস্তুত আমাদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই এই নকলনবিশির দৌরাত্ম্য রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন।

একসময় আয়ারল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থাকে ইউরোপে আদর্শস্থানীয় গণ্য করা হত। নানা দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা আয়ারল্যান্ডে আসত পড়াশুনা করতে। সপ্তম থেকে মোটামুটি ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এই অবস্থাটা চালু ছিল। সে সময় আয়ারল্যান্ডের বিদ্যালয়গুলোতে গ্রিক, লাতিন, হিব্রু প্রভৃতি ক্লাসিক্যাল ভাষাও শেখানো হত । কিন্তু শেখানোর ভাষাটা অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যম ছিল আইরিশ। বিষয়টির উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষাসংস্কার' (১৩১২) প্রবন্ধে লিখেছেন, "গণিতজ্যোতিষ, ফলিতজ্যোতিষ এবং তখনকার কালে যে-সকল বিজ্ঞান প্রচলিত ছিল তাহা আইরিশ ভাষা দ্বারাই শেখানো হইত, সুতরাং এ ভাষায় পারিভাষিক শব্দের দৈন্য হইত না।" পরে যখন সেখানে ইংরেজি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হল তখন তার ফল দাঁড়াল এই যে, "মানসিক জড়তা সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া গেল। আইরিশভাষী ছেলেরা বুদ্ধি এবং জিজ্ঞাসা লইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল, আর বাহির হইল পঙ্গু মন এবং জ্ঞানের প্রতি বিতৃষ্ণা লইয়া।" রবীন্দ্রনাথের কাছে এই পরিণামটিকে মনে হয়েছে খুবই স্বাভাবিক, কারণ, "নিজে চিন্তা করিবে, নিজে কাজ করিবে, এমনতরো মানুষ তৈরি করিবার প্রণালী এক; আর পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না, ও পরের কাজের জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরির বিধান অন্যরূপ।" আয়ারল্যান্ডের ওই শিক্ষাসংকটের সঙ্গে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার 'একটা গভীর জায়গায় মিল' খুঁজে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। মিলটা হল "বিদ্যাশিক্ষায় আমাদেরও মন খাটিতেছে না, আমাদেরও শিক্ষাপ্রণালীতে কলের অংশ বেশি।" এই শিক্ষাপ্রণালির বৈশিষ্ট্য বা সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করে একই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন :

> এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীতে আমাদের মন যে অপরিণত থাকিয়া যায়, বুদ্ধি যে সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পায় না, সে কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের পাণ্ডিত্য অল্প কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়, আমাদের উদ্ভাবনা শক্তি শেষ পর্যন্ত পৌঁছে না। আমাদের ধারণাশক্তির বলিষ্ঠতা নাই। আমাদের ভাবাচিন্তা, আমাদের লেখাপড়ার মধ্যে সেই ছাত্র-অবস্থার ক্ষীণতাই বরাবর থাকিয়া যায় ; আমরা নকল করি, নজির খুঁজি, এবং স্বাধীন মত বলিয়া যাহা প্রচার করি তাহা হয় কোনো-না কোনো মুখস্থ বিদ্যার প্রতিধ্বনি, নয় একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার।

www.pathagar.com

সমাজের ভেতর থেকে তার নিজস্ব তাগিদে উঠে আসা পরিবেশানুকূল শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে স্রেফ পরানুকৃতি বা তার যান্ত্রিক প্রয়োগ, এর সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ অন্যত্রও, যেমন তাঁর 'শিক্ষাসমস্যা' (১৩১৩) প্রবন্ধেও করেছেন :

> ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল্। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন : ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপর মার্কা পড়িয়া যায়।

আর এই মার্কামারা শিক্ষার 'সুবিধা' ও অসুবিধার দিক উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য :

> কলের একটা সুবিধা, ঠিক মাপে, ঠিক ফর্মাশ-দেওয়া জিনিসটা পাওয়া যায় : এক-কলের সঙ্গে আর-এক-কলের উৎপন্ন সামগ্রীর বড়ো একটা তফাত থাকে না, মার্কা দিবার সুবিধা হয়।
>
> কিন্তু এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের অনেক তফাত। এমন-কি, একই মানুষের এক দিনের সঙ্গে আর-এক দিনের ইতর-বিশেষ ঘটে।
>
> তবু, মানুষের কাছ হইতে মানুষ যাহা পায় কলের কাছ হইতে তাহা পাইতে পারে না। ...
>
> ... বিদ্যাশিক্ষার কারখানা-ঘরে জগৎকে আমরা একটা যন্ত্র বলিয়াই শিখিতে পারি।

৩

অন্য সকল ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও অসহযোগ বা বর্জননীতিকে সমর্থন করতে না পারলেও, ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের পশ্চাৎ-উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে কোনো সংশয় ছিল না। স্পষ্টভাবেই তিনি লিখেছেন, "আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার যখন প্রথম পত্তন হইয়াছিল তখন তাহার লক্ষ্য ছিল এই যে, ব্রিটিশ ভারতের রাজ্যশাসন ও বাণিজ্যচালনের জন্য ইংরেজি-জানা দেশি কর্মচারী গড়িয়া তোলা।" ('অসন্তোষের কারণ', ১৩২৬) ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা তাদের নিজস্ব স্বার্থে প্রবর্তিত সেই শিক্ষাব্যবস্থার উত্তরাধিকারই আমরা অদ্যাবধি বহন করে চলেছি। রবীন্দ্রনাথের ভাষা অনুসরণ করেই বলা যায়, "গোড়ায় যাঁরা এ দেশে তাঁদের রাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন, দেখতে পাই, তাঁদেরও উত্তরাধিকারীরা বাইরের আসবাব এবং ইঁট-কাঠ-চুন-সুরকির প্যাটার্ন দেখিয়ে আমাদের ও নিজেদের ভোলোতে আনন্দ বোধ করেন।" ('শিক্ষার

www.pathagar.com

সাঙ্গীকরণ', ১৩৪২) রবীন্দ্রনাথের মতে, "সকল পরাশ্রয়তার চেয়ে ভয়াবহ শিক্ষায় পরধর্ম।" (ঐ) আর তাই হয়তো শিক্ষাসমস্যাকেই তাঁর কাছে আমাদের 'সর্বপ্রধান সমস্যা' বলে মনে হয়েছে। ('শিক্ষার মিলন', ১৩২৮)

যে-কথাটা রবীন্দ্রনাথ বারবারই বলেছেন তা হল, ইংরেজি আমাদের জন্য বিদেশি বা পর ভাষা। আর 'পরের ভাষায় গ্রহণ করাও শক্ত, প্রকাশ করাও কঠিন' ('ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ', ১৩১২)। তা 'আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা' হতে পারে, 'ভাবের ভাষা নয়' (শি. হে.) আর দেশের শিক্ষাবিস্তারের পথেও একে, অর্থাৎ ইংরেজিকে এই মাধ্যম বা বাহন করাটাকেই তিনি 'সর্বপ্রধান' বাধা হিসেবে দেখেছেন। এ বিষয়ে 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে তাঁর মন্তব্য : "বিদ্যাবিস্তারের কথাটাকে যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে তার বাহনটা ইংরেজি।" বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেছেন, "বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে, কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রফ্‌তানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা শহরেই আটকাইয়া পড়িয়া থাকিবে।" এ প্রসঙ্গে 'মুখে যাই বলি, মনের মধ্যে' শহরকেই আমাদের 'দেশ বলে ধরে' নেবার প্রবণতারও তিনি সমালোচনা করেছেন। (ঐ) শিক্ষায় 'মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধে'র সঙ্গে তুলনা করেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হননি। দেশের 'মনকে মানুষ' করার ক্ষেত্রেও তাকে অপরিহার্য বিবেচনা করেছেন। বলেছেন পরের ভাষায় তা 'কোনোমতেই সম্ভবপর নয়'। (ঐ) এ প্রসঙ্গে তাঁর আরও মন্তব্য : "আমরা লাভ করিব, কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না; আমরা চিন্তা করিব, কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে; আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না? সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কী হইতে পারে!" (ঐ) তাঁর মতে, 'সকলের চেয়ে অনর্থকর কৃপণতা' হল 'বিদ্যাকে বিদেশী ভাষার অন্তরালে দূরত্ব দান করা।' তিনি এর তুলনা করেছেন 'ফসলের বড়োমাঠকে বাইরে শুকিয়ে রেখে টবের গাছকে আঙিনায় এনে জলসেচন করা'র সঙ্গে। ('ছাত্রসম্ভাষণ') বিদ্যাকে, উচ্চশিক্ষাকে 'দেশের ভাষায় দেশের জিনিস' করে নেবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ জাপানের উদাহরণ দিয়েছেন, "পশ্চিম হইতে যা-কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল তার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তারা দেশি ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।" (শি. বা.) যদিও, তিনি বলেছেন, "জাপানি ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষার অপরিসীম।" (ঐ) বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা সম্ভব নয়, এ রকম বক্তব্যকেও তিনি 'অক্ষমের, ভীরুর ওজর' বলে বাতিল করে

www.pathagar.com

দিয়েছেন। (ঐ) স্বীকার করেছেন যে কাজটা কঠিন, আর তার জন্য 'কঠোর সংকল্প চাই'। (ঐ) 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধেই বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রশ্ন রেখেছেন :

ক. মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক্, সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল? ... মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?

খ. ... অধিকাংশ বাঙালি ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিম্বা অর্ধানশনই ব্যবস্থা, এ কথা কোন্ মুখে বলা যায়?

গ. ... যারা বাংলা জানে, ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাইবে না? এত বড়ো অস্বাভাবিক নির্মমতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও আছে?

ঘ. ভালোমত ইংরেজি শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপচয় করা হইতেছে না?

মৃত্যুর চার বছর আগেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "এ দেশে অনেক কাল জানিয়ে আসতে হয়েছে যে, পরভাষার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত শিক্ষায় বিদ্যার প্রাণিন পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়।" একে তিনি 'দুর্ভাগ্যদিনের সকলের চেয়ে দুঃসহ লক্ষণ' বলে অভিহিত করেছিলেন, যখন কিনা 'স্বতঃস্বীকার্য সত্যকেও বিরোধের কণ্ঠে জানাতে হয়'। তিনি বলেছিলেন, "ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেই শিক্ষার ভাষা ও শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়-বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না। ... বর্তমান কালে চীন জাপান পারস্য আরব তুরস্কে প্রাচ্যজাতীয়দের মধ্যে সর্বত্র এই ব্যর্থতাজনক আত্মবিচ্ছিন্নতার প্রতিকার হয়েছে, হয় নি কেবলমাত্র আমাদেরই দেশে।" ('ছাত্রসম্ভাষণ', ১৩৪৩)। বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা স্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের প্রশ্নে যে (ক) উপযুক্ত অর্থাৎ মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক এবং (খ) প্রয়োজনীয় পরিভাষার অভাবের অজুহাত তোলা হয় তাকে নাকচ করে দিয়ে 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য : (ক) "শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে? ... শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার যোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পালা, এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীতে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।" এবং (খ) "দেশে এই পরিভাষা-তৈরির তাগিদ কোথায়? ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন বা সুযোগ কই? দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাঁকশাল চলিতেই থাকিবে, এমন আবদার করি কোন্ লজ্জায়?"

www.pathagar.com

আধুনিক বা পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশে বিদ্যার সঙ্গে জীবনের যথার্থ যোগ ঘটাতে পারেনি। কিন্তু যাঁরা মনে করেন এর একমাত্র কারণ বিদ্যাটা বিদেশী, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে একমত নন। স্পষ্টভাবেই তিনি বলেছেন, "এ কথা মানি না। যা সত্য তার জিয়োগ্রাফি নাই। ... বস্তুত, যদি এমন কোনো ভালো থাকে যা একমাত্র ভারতবর্ষেরই ভালো তবে তা ভালোই নয়, এ কথা জোর করিয়া বলিব।" (শি. বা.) 'আসল কথা', রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের 'আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায়নি।' (শি. বা.) ভাবের সঙ্গে ভাষার, শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সংযোগ বা সামঞ্জস্য ঘটাতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। (শি. হে.) আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রধান ত্রুটি, রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন, "বস্তুর সহিত বহির সহিত আমরা মিলাইয়া শিখিবার অবকাশ পাই না। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা যে-সকল দৃষ্টান্ত আশ্রয় করে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর নহে।" যেখানে "জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, যে বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানত তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে তবে সে জ্ঞান দুর্বল হইবেই।" এবং "আইডিয়া যত বড়োই হউক, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।" (ছা. প্র. স.)

আধুনিক শিক্ষার নামে যে ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির অনুকরণ এদেশে করা হয়েছে বা এখনও হচ্ছে তা কাঠামো বা খোলসের নকল মাত্র। আর নকল কেবল বহিরঙ্গেরই হতে পারে, অন্তর্বস্তুর হয় না। পাশ্চাত্য শিক্ষার ভালো দিকগুলোও যে-কারণে আমাদের জীবনে ফলবতী হতে পারে না, আমাদের ভেতরের সামগ্রী হয়ে উঠতে পারে না। উপরন্তু তা আমাদের ভারগ্রস্ত করে তোলে। এ প্রসঙ্গে 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য : "আমাদের বিলাতি বিদ্যাটা কেমন ইস্কুলের জিনিস হইয়া সাইনবোর্ডে টাঙানো থাকে, আমাদের জীবনের ভিতরের সামগ্রী হইয়া যায় না। তাই পশ্চিমের শিক্ষায় যে ভালো জিনিস আছে, তার অনেকখানি আমাদের নোট্‌বুকেই আছে; সে কি চিন্তায়, কি কাজে ফলিয়া উঠিতে চায় না।" 'শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধেও তিনি লিখেছেন :

> ... য়ুরোপের বিদ্যালয়ের অবিকল বাহ্য নকল করিলেই আমরা যে সেই একই জিনিস পাইব এমন নহে। এই নকলে সেই বেঞ্চি, সেই টেবিল, সেই প্রকার কার্যপ্রণালী সমস্তই ঠিক মিলাইয়া পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা আমাদের পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে।

আর এর অনিবার্য পরিণতি : "অধিকার লাভ করিতে গেলেই আমরা পরের কাছে হাত পাতি এবং গড়িয়া তুলিতে গেলেই আমরা নকল করিতে বসিয়া যাই— নিজের শক্তি এবং নিজের মনের দিকে, দেশের প্রকৃতি ও দেশের যথার্থ প্রয়োজনের দিকে তাকাই না, তাকাইতে সাহসই হয় না।" (ঐ)

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথের মতে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সহ পুরো শিক্ষাব্যবস্থাই আসলে বিদেশের ছাঁচে তৈরি। আর ডিগ্রি হল মানুষের 'নামের ওপর মার্কা মারার' একটা সিলমোহর। 'মানুষকে তৈরি করা নয়, মানুষকে চিহ্নিত করা তার কাজ'। (শি. বা.) তিনি লিখেছেন, "আমরা বিদ্যা পাই বা না পাই বিদ্যালয়ের একটা ছাঁচ পাইয়াছি।" (ঐ) বাঙালির একটি জাতিগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, "আমাদের মুশকিল এই যে আমরা চিরদিন ছাঁচের উপাসক। ... এই ছাঁচ-দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি আমাদের মজ্জাগত।" (ঐ) ফলে, তিনি মনে করেছেন, 'গোড়া হতে ছাঁচ বদল করা সহজ কাজ নয়'। এ অবস্থায় 'সংস্কারের একটিমাত্র উপায়ে'র কথা রবীন্দ্রনাথ ভেবেছেন; আর তা হল "এই ছাঁচের পাশে একটা সজীব জিনিসকে অল্প একটু স্থান দেওয়া।"(ঐ) বস্তুত শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পেছনে রবীন্দ্রনাথের এই উদ্দেশ্যই কাজ করেছিল।

৪

শিক্ষার আয়োজন বা ব্যবস্থাপনার নামে তার বাহ্যিক আড়ম্বর অর্থাৎ সভা-সমিতি-প্রস্তাব, ভবন ও আসবাবপত্রকে বড় করে না তুলে, শিক্ষাদানের বিষয় এবং শিক্ষার্থীর মানস-আকর্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ প্রসঙ্গে 'শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধে তাঁর মন্তব্য :

> ক. একটা বিজ্ঞান-সভা স্থাপন করা এক, আর দেশের লোকের চিত্তকে বিজ্ঞানশিক্ষায় নিবিষ্ট করা আর। সভা ফাঁদিলেই তাহার পরে দেশের লোক বিজ্ঞানী হইয়া উঠিবে, এরূপ মনে করা ঘোর কলিযুগের কল-নিষ্ঠার পরিচয়।
>
> ... কী শিখাইব তাহা ভাবিবার বটে, কিন্তু যাহাকে শিখাইব তাহার সমস্ত মনটা কী করিয়া পাওয়া যাইতে পারে সেও কম কথা নয়।
>
> অনাবশ্যককে যে পরিমাণে অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিব সেই পরিমাণে আমাদের শক্তির অপব্যয় ঘটিবে। ... ধনী য়ুরোপের মতো আমাদের সম্বল নাই; তাহার পক্ষে যাহা সহজ আমাদের পক্ষে তাহা ভার। কোনো একটা সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিতে গেলেই গোড়াতে ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্রের হিসাব খতাইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়। এই হিসাবের মধ্যে অনাবশ্যকের দৌরাত্ম্য বারো-আনা। ... কিন্তু যে দেশে শক্তির সীমা নাই, যে দেশে ধন কানায় কানায় ভরিয়া উপচিয়া পড়িতেছে, সেই দেশের আদর্শে সমস্ত কাজের পত্তন না করিলে আমাদের লজ্জা দূর হয় না, আমাদের কল্পনা তৃপ্ত হয় না। ইহাতে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির অধিকাংশই আয়োজনে নিঃশেষিত হইয়া যায়, আসল জিনিসকে খোরাক জোগাইতে পারি না।
>
> এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, যেখানে মুষলধারায় চাঁদার টাকা আসিয়া পড়ে সেইখানেই যে শিক্ষা বেশি করিয়া জমা হইতে থাকে তাহা নহে,

www.pathagar.com

মনুষ্যত্ব টাকায় কেনা যায় না; যেখানে কমিটির নিয়মধারা অহরহ বর্ষিত হয় সেইখানেই যে শিক্ষাকল্পলতা তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠে তাহাও নহে—শুদ্ধমাত্র নিয়মাবলী অতি উত্তম হইলেও তাহা মানুষের মনকে খাদ্য দান করে না।

আমাদের জীবনযাত্রা যেখানে গরিবের সেখানে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই 'বাহ্যাড়ম্বরে'র তুলনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'টাকা ফুঁকে দিয়ে টাকার থলি' তৈরি করার সঙ্গে। (শি. বা.) তাঁর মতে 'মেদ যেখানে প্রচুর, মজ্জা সেখানে দুর্বল'। (ঐ) ইউরোপ-আমেরিকায় রাষ্ট্রীয় সহায়তায় শিক্ষা যেখানে প্রায় অবৈতনিক সেখানে ভারতবর্ষে শিক্ষার ব্যয়বাহুল্যের সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "পশ্চিমের পোষ্যপুত্র তার বিলিতি বাপকেও ছাড়াইয়া চলে।" (ঐ)

প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগের কথা সর্বজনবিদিত। তাঁর শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পেছনে এটাই প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল বলে আমরা জানি। তিনি নিজেও বিভিন্ন সময় তাঁর রচনা ও ভাষণে একথা বলেছেন। তো সেই তপোবন শিক্ষার ব্যাপারটা কেমন ছিল? রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে লিখেছেন : "এক দিন তপোবনে ভারতবর্ষের গুরুগৃহ ছিল, এইরূপ একটা পুরাণকথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। অবশ্য তপোবনের যে একটা পরিষ্কার ছবি আমাদের মনে আছে তাহা নহে এবং তাহা অনেক অলৌকিকতার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।" ('শিক্ষাসমস্যা') তাহলেও ধারণা হিসেবে তপোবন শিক্ষার যে-দিকটি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে তা হল, সেখানে 'সাধনা ও শিক্ষা একত্র মিলিত হয়েছিল' ('ধর্মশিক্ষা', ১৩১৮), সেখানে বিদ্যাদানের কাজটি করতেন গুরু, শিক্ষক নয়—মানুষ, কল নয় ("শিক্ষক কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই জোটে, কিন্তু গুরু তো ফর্মাশ দিলেই পাওয়া যায় না।" 'শিক্ষাসমস্যা')। এবং "সেখানে জীবনযাত্রা নিতান্ত সাদাসিধা; বৈষয়িকতা বিলাসিতা মনকে টানাছেঁড়া করিতে পারে না, সুতরাং শিক্ষাটা একেবারে স্বভাবের সঙ্গে মিল খাইবার সময় ও সুবিধা পায়।" (ঐ) যদিও রবীন্দ্রনাথ সচেতন যে, "তখন আমাদের শিক্ষার বিষয় এত বিচিত্র ও বিস্তৃত ছিল না এবং তখন আমাদের সমাজে-প্রচলিত ভাব ও মতের সঙ্গে পুঁথির শিক্ষার কোনো বিরোধ ছিল না। ঠিক সে দিনকে আজ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে সে একটা নকল হইবে মাত্র, তাহার বাহ্য আয়োজন বোঝা হইয়া উঠিবে, কোনো কাজেই লাগিবে না।" (ঐ) আসলে রবীন্দ্রনাথ যা চেয়েছেন তা হল 'যাতে পাঠ্য বিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশতে পারে' এবং বিদ্যালয় 'যাতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয়মনকে গড়িয়া তোলা দুই ভারই' গ্রহণ করে। (ঐ) এদিক থেকে তাঁর কাছে 'বিলেতের নজির একেবারে'ই পরিত্যাজ্য বলে মনে হয়েছে। যেহেতু 'বিলাতের ইতিহাস, বিলাতের সমাজ আমাদের নয়'। (ঐ) আর এ সত্যটি

www.pathagar.com

উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে, রবীন্দ্রনাথ ঠিকই লক্ষ করেছেন, "আমরা ন্যাশনাল পতাকাটাকে উচ্চে তুলিয়া যখন স্বাধীন চেষ্টায় কাজ করিব বলিয়া কোমর বাঁধিয়া বসি তখনও বিলাতের বেড়ি কোমরবন্ধ হইয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলে, আমাদিগকে নজিরের বাহিরে নড়িতে দেয় না।" (ঐ) শিক্ষার্থীর জন্য ব্রহ্মচর্য পালনের আবশ্যকতার কথাও যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সে-ও বলা বাহুল্য বৈরাগ্য-সাধনার প্রতি তাঁর কোনো অনুরাগ থেকে নয়, কারণ 'বৈরাগ্যের নামে শূন্য ঝুলি' তিনি সমর্থন করেন না (শিক্ষার মিলন, ১৩২৮) ; এজন্য যে তাঁর মনে হয়েছে, "জীবনের আরম্ভকালে বিকৃতির সমস্ত কৃত্রিম কারণ হইতে স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ রাখা নিতান্তই আবশ্যক।" ('শিক্ষাসমস্যা') আর তাঁর মতে ব্রহ্মচর্য পালন 'প্রবৃত্তির অকাল-বোধন ও বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা থেকে মনুষ্যত্বের নবোদ্গমের অবস্থাকে স্নিগ্ধ করে রাখে'। (ঐ) শিক্ষার্থীকে কেবল উপদেশ দিয়ে বা নীতিকথা শুনিয়ে সে উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব নয়। স্পষ্ট করেই বলেছেন, "জীবনের আরম্ভে মনকে চরিত্রকে গড়িয়া তুলিবার সময়, উপদেশ নহে, অনুকূল অবস্থা ও অনুকূল নিয়মই সকলের চেয়ে বেশি আবশ্যক।" (ঐ) বস্তুত বিদ্যালয়কে যাঁরা নীতিশিক্ষাদানের স্থান হিসেবে গণ্য করেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে একমত নন। এ প্রসঙ্গে 'শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধে প্রায় ব্যঙ্গ করেই বলেছেন, "আজকাল নীতিপাঠের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যে-কোনো উপলক্ষে ছাত্রদিগকে নীতি-উপদেশ দিতে হইবে, দেশের অভিভাবকদের এইরূপ অভিপ্রায়।" এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য আমরা এখানে প্রবন্ধটি থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি :

> নীতি-উপদেশ জিনিসটা একটা বিরোধ। ইহা কোনোমতেই মনোরম হইতে পারে না। যাহাকে উপদেশ দেওয়া হয় তাহাকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। উপদেশ হয় তাহার মাথা ডিঙাইয়া চলিয়া যায় নয় তাহাকে আঘাত করে। ইহাতে যে কেবল চেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহা নয়, অনেক সময় অনিষ্ট করে। সৎ কথাকে বিরস ও বিফল করিয়া তোলা মনুষ্যসমাজের যেমন ক্ষতিকর এমন আর-কিছুই নয়—অথচ অনেক লোক এই কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, ইহা দেখিয়া মনে আশঙ্কা হয়।
>
> সংসারে কৃত্রিম জীবনযাত্রায় হাজার রকমের অসত্য ও বিকৃতি যেখানে প্রতি মুহূর্তে রুচি নষ্ট করিয়া দিতেছে সেখানে ইস্কুলে দশটা-চারটের মধ্যে কতক পুঁথির বচনে সমস্ত সংশোধন করিয়া দিবে ইহা আশা করা যায় না। ইহাতে কেবল ভূরি ভূরি ভানের সৃষ্টি হয় এবং নৈতিক জ্যাঠামি, যাহা সকল জ্যাঠামির অধম, তাহা সুবুদ্ধির স্বাভাবিকতা ও সৌকুমার্য নষ্ট করিয়া দেয়।

শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকের ভূমিকাকেই রবীন্দ্রনাথ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে সে শিক্ষক বলতে তিনি, বলা বাহুল্য, আমাদের আজকের প্রচলিত অর্থে শিক্ষককে বোঝাননি। তিনি এ-প্রসঙ্গে 'গুরু' শব্দটি ব্যবহার করেছেন; 'শিক্ষাবিধি'

www.pathagar.com

(১৩১৯) প্রবন্ধে লিখেছেন, "আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সেই গুরু খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন।" শিক্ষক যেন 'শিক্ষার ছাঁচ' বা 'নোটের বোঝার বাহন' না হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে শিশুশিক্ষার বেলায় এই সজীবতার প্রয়োজনটা রবীন্দ্রনাথ অধিক অনুভব করেছেন। যেহেতু, "শিশুবয়সে নির্জীব শিক্ষার মতো ভয়ংকর ভার আর কিছুই নাই, তাহা মনকে যতটা দেয় তাহার চেয়ে পিষিয়া বাহির করে অনেক বেশি।" (ঐ) এবং "মরা মন নিয়েও পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর ঊর্ধ্বশিখরে ওঠা যায়, আমাদের দেশে প্রত্যহ তার পরিচয় পাই। দেখা যায় অতি ভালো কলেজি ছেলেরা পদবী অধিকার করে, বিশ্ব অধিকার করে না।" ('আশ্রমের শিক্ষা')

৫

মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে চিন্তার স্বাধীনতা, যুক্তি-বিচার ও পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের দ্বারা সবকিছুকে যাচাই করে নেবার ক্ষমতা এমনকি ভুল করবার সাহসকেও রবীন্দ্রনাথ অপরিহার্য বলে মনে করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'লক্ষ্য ও শিক্ষা' প্রবন্ধে (১৩১৯) তাঁর বক্তব্য :

> মানুষ যেখানে কোনো জিনিসকেই পরখ করিয়া লইতে দেয় না, ছোটো বড়ো সকল জিনিসকেই বাঁধা বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে ও বাঁধা নিয়মের দ্বারা ব্যবহার করিতে বলে, সেখানে অবস্থা যতই অনুকূল হউক-না কেন মনুষ্যত্বকে শীর্ণ হইতেই হইবে। ...মানবপ্রকৃতির উপর ভরসা নাই বলিয়া এ কথা একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছি যে, মানুষকে ভুল করিতে না দিলে মানুষকে শিক্ষা করিতে দেওয়া হয় না। মানুষকে সাহস করিয়া ভালো হইয়া উঠিবার প্রশস্ত অধিকার দিব না, তাহাকে সনাতন নিয়মে সকল দিকেই খর্ব করিয়া ভালো-মানুষির জেলখানায় চিরজীবন কারাদণ্ড বিধান করিয়া রাখিব, এমনতরো যাহাদের ব্যবস্থা তাহারা যতক্ষণ নিজের বেড়ি নিজে খুলিয়া না ফেলিবে এবং বেড়িটাকেই নিজের হাত-পায়ের চেয়ে পবিত্র ও পরমধন বলিয়া পূজা করা পরিত্যাগ না করিবে ততক্ষণ ভাগ্যবিধাতার কোনো বদান্যতায় তাহাদের কোনো স্থায়ী উপকার হইতে পারিবে না।

শিক্ষার মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো। আর রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মনুষ্যত্বের অন্যতম প্রধান অভিব্যক্তি, মানুষ প্রশ্ন করে, বিদ্রোহ করে। অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে এখানেই তার পার্থক্য। এ প্রসঙ্গে 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

> জন্তুরা আহার পায় বাঁচে, আঘাত পায় মরে, যেটাকে পায় সেটাকেই বিনা তর্কে মেনে নেয়। কিন্তু মানুষের সবচেয়ে বড়ো স্বভাব হচ্ছে মেনে না নেওয়া। জন্তুরা বিদ্রোহী নয়, মানুষ বিদ্রোহী। বাইরে থেকে যা ঘটে, যাতে তার নিজের কোনো

www.pathagar.com

হাত নেই, কোনো সায় নেই, সেই ঘটনাকে মানুষ একেবারে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করে নি বলেই জীবের ইতিহাসে সে আজ এত বড়ো গৌরবের পদ দখল করে বসেছে। আসল কথা, মানুষ একেবারেই ভালোমানুষ নয়। ইতিহাসের আদিকাল থেকে মানুষ বলেছে, বিশ্বঘটনার উপরে সে কর্তৃত্ব করবে। কেমন করে করবে? না, ঘটনার পিছনে যে প্রেরণা আছে, যার থেকে ঘটনাগুলো বেরিয়ে এসেছে, তারই সঙ্গে কোনোমতে যদি রফা করতে বা তাকে বাধ্য করতে পারে তা হলেই সে আর ঘটনার দলে থাকবে না, ঘটয়িতার দলে গিয়ে ভর্তি হবে।

৬

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তা বৈষম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এবং একই সঙ্গে তা বৈষম্য সৃষ্টির সহায়কও। মানুষে মানুষে মিল বা ঐক্য ঘটাবার পরিবর্তে তা বিভেদের প্রাচীর তৈরি করে, কিংবা যে বিভেদটি আছে তাকে পাকাপোক্ত করে তোলে। যেখানে রবীন্দ্রনাথের মতে 'জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য' এবং 'আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়'। (শি. বা.) 'শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ধনীর ছেলে এবং দরিদ্রের ছেলে কোনো প্রভেদ লইয়া আসে না। জন্মের পরদিন হইতে মানুষ সেই প্রভেদ নিজের হাতে তৈরি করিয়া তুলিতে থাকে।" এভাবে ধনীর সন্তানটি "সম্পূর্ণরূপে মানবসন্তান হইতে শিখিবার পূর্বেই ধনীর সন্তান হইয়া উঠে।" আর পিতামাতা বা অভিভাবকদের মতো আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাও এক্ষেত্রে সহায়ক এমনকি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে। এদেশের ধনীর সন্তানদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য : "জগতে এত বড়ো বন্দী, এত বড়ো পঙ্গু আর কেহ নাই।" (ঐ) তাঁর মতে "অনায়াসে-প্রয়োজন-জোগানোর দ্বারা ছেলেদের মনটাকে আদুরে করে তোলা তাদের নষ্ট করা।" ('আশ্রমের শিক্ষা', ১৩৪৩) আর সেই কাজটিই এদেশে করা হয়, "বাল্যকাল থেকেই ব্যবহারসামগ্রী সুনিয়ন্ত্রিত করবার আত্মশক্তিমূলক শিক্ষা আমাদের দেশে অত্যন্ত উপেক্ষিত হয়।" (ঐ)

রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধটি ১৩২২ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা *সবুজপত্র*-এ প্রকাশিত হয়। তখন তাতে তিনি লিখেছিলেন, "বিদ্যাশিক্ষার উপায় ভারতবর্ষে কিছু কিছু হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যাবিস্তারের বাধা এখানে মস্ত বেশি।" প্রসঙ্গত ব্রিটিশ-ভারতে মহাত্মা গোপালকৃষ্ণ গোখলের (১৮৬৬-১৯১৫) উদ্যোগে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের যে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তার ব্যর্থতার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য : "যে সর্বজনীন শিক্ষা দেশের উচ্চশিক্ষার শিকড়ে রস জোগাইবে কোথাও তার সাড়া পাওয়া গেল না"। আর এ ব্যাপারে বাঙলা দেশেই যে 'সব চেয়ে বাধা'র সম্মুখীন হতে হয়েছিল সে-কথাটাও রবীন্দ্রনাথ তাঁর একাধিক

www.pathagar.com

প্রবন্ধে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

> বাংলাদেশে শুভবুদ্ধির ক্ষেত্রে আজকাল হঠাৎ সকল দিক হইতেই একটা অদ্ভুত মহামারীর হাওয়া বহিয়াছে। ভূতের পা পিছন দিকে, বাংলাদেশে সামাজিক সকল চেষ্টারই পা পিছনে ফিরিয়াছে। আমরা ঠিক করিয়াছি, সংসারে চলিবার পথে আমরা পিছন মুখে চলিব, কেবল রাষ্ট্রীয় সাধনার আকাশে উড়িবার পথে আমরা সামনের দিকে উড়িব; আমাদের পা যে দিকে আমাদের ডানা ঠিক তার উল্টা দিকে গজাইবে।

এ বিষয়ে এদেশীয় মানস-প্রবণতার সমালোচনা করে একই প্রবন্ধে তিনি আরও লিখেছেন :

> দেশের অন্ন, দেশের বিদ্যা, দেশের স্বাস্থ্য আমরা তেমন করিয়া চাই নাই। পরের কাছে চাহিয়াছি, নিজের কাছে নহে। ওজর করিয়া বলি, আমাদের সাধ্য কম : কিন্তু আমাদের সাধনা তার চেয়েও অনেক কম।
>
> ... শিক্ষার জন্য আমরা আবদার করিয়াছি, গরজ করি নাই। শিক্ষাবিস্তারে আমাদের গা নাই। তার মানে শিক্ষার ভোজে নিজেরা বসিয়া যাইব, পাতের প্রসাদটুকু পর্যন্ত আর-কোনো ক্ষুধিত পায় বা না পায় সে দিকে খেয়ালই নাই। ... 'জনসাধারণকে লেখাপড়া শেখাইলে আমাদের চাকর জুটিবে না' এ কথা যদি সত্য হয় তবে আমরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদেরও দাস্যভাবের ব্যাঘাত হইবে এ আশঙ্কাও মিথ্যা নহে।

বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার প্রশ্নেও দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর নেতিবাচক মনোভাব বা প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করে ১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত তাঁর 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> আমাদের দেশে মাতৃভাষায় একদা যখন শিক্ষার আসন প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব ওঠে তখন অধিকাংশ ইংরেজি জানা বিদ্বান আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। সমস্ত দেশের সামান্য যে-কয়জন লোক ইংরেজি ভাষাটাকে কোনোমতে ব্যবহার করবার সুযোগ পাচ্ছে তাদের ভাগে উক্ত ভাষার অধিকারে পাছে লেশমাত্র কমতি ঘটে এই ছিল তাদের ভয়। হায় রে, দরিদ্রের আকাঙ্ক্ষাও দরিদ্র!

এমনকি পরাধীন ভারতবর্ষে তিনি যে লিখেছিলেন 'এমন মানুষ আজও দেশে আছে যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলাভাষার আসনে বসালে তার মূল্য যাবে কমে' ('শিক্ষার বিকিরণ', ১৯৩৩), আমাদের আজকের প্রেক্ষাপটেও তা বেশি বৈ কম সত্যি নয়।

শিক্ষা যদি না তা শিক্ষার্থীদের মনে জাতীয় গৌরববোধ, আত্মমর্যাদা, আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করতে পারে, তাদেরকে সত্যিকার মনুষ্যত্ব সাধনায় উদ্বুদ্ধ

www.pathagar.com

করতে পারে, বরং তা যদি তাদের মধ্যে হীনম্মন্যতার জন্ম দেয়, তবে তার চূড়ান্ত ফল এই হতে পারে যে দেশে ভূরি ভূরি শিক্ষিত এমনকি জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিত লোক জন্ম নেবেন কিন্তু জাতীয় মনীষা সৃষ্টিতে তাঁরা কোনো সমষ্টিগত অবদান রাখতে পারবেন না। উপনিবেশ-উত্তর আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বাস্তবতা ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির এই কুফলকেই তুলে ধরছে। দেশে মননচর্চার পরিবেশ সৃষ্টিতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার শোচনীয় ব্যর্থতার দিকটির উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জাতীয় বিদ্যালয়' প্রবন্ধে লিখেছেন :

> যে দেশে জলাশয় নাই সে দেশে আকাশের বৃষ্টিপাত ব্যর্থ হইয়া যায়। জল ধরিবার স্থান না থাকিলে বৃষ্টিধারার অধিকাংশ ব্যবহার নষ্ট হইতে থাকে। আমাদের দেশে যে জ্ঞানী, গুণী, ক্ষমতাসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করেন না তাহা নহে; কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান, গুণ ও ক্ষমতা ধরিয়া রাখিবার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই। তাঁহারা চাকরি করেন, ব্যবসা করেন, রোজগার করেন, পরের হুকুম মানিয়া চলেন, তাহার পরে পেন্সন লইয়া ভাবিয়া পান না কেমন করিয়া দিন কাটিবে।

শিক্ষা প্রসঙ্গে জাতীয় গন্তব্য বা লক্ষ্য নির্ধারণের বিষয়টিকেও রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'লক্ষ্য ও শিক্ষা' (১৩১৯) প্রবন্ধে তাঁর মন্তব্য : "আমরা কী হইব এবং আমরা কী শিখিব এই দুটা কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যত বড়ো জল তাহার চেয়ে বেশি ধরে না।" এবং "আশা করিবার ক্ষেত্র বড়ো হইলেই মানুষের শক্তিও বড়ো হইয়া বাড়িয়া ওঠে। শক্তি তখন স্পষ্ট করিয়া পথ দেখিতে পায় এবং জোর করিয়া পা ফেলিয়া চলে।" রবীন্দ্রনাথের মতে, 'কোনো সমাজ সকলের চেয়ে বড় জিনিস যা মানুষকে দিতে পারে' তা হল 'সকলের চেয়ে বড় আশা'। (ঐ) এ প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, "যাহার বিশেষ কোনো একটা বন্দর নাই তাহার অতীতই বা কী আর ভবিষ্যতই বা কী?" জনসংখ্যাকে আমরা শক্তি বা সম্পদ হিসেবে গণ্য করে থাকি। আপ্তবাক্যের মতো প্রায়শ কথাটা আওড়াই। কিন্তু কখন জনসংখ্যা সম্পদ? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "লোকসংখ্যার কোনো মূল্য নাই; কিন্তু সমাজে যতগুলি লোক আছে তাহাদের অধিকাংশের যথাসম্ভব শক্তি-সম্পদ কাজে খাটিতেছে, মাটিতে পোঁতা নাই, ইহাই সমৃদ্ধি। শক্তি যেখানে গতিশীল হইয়া আছে সেইখানেই মঙ্গল, ধন যেখানে সজীব হইয়া খাটিতেছে সেইখানেই ঐশ্বর্য।" (ঐ)

রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও/বা সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরবশ্যতা বা পরনির্ভরতার নীতি আমাদের মধ্যে যে মানসিক দৌর্বল্য বা হীনম্মন্যতার জন্ম দেয় তার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য : "যাহারা আমাদের খাঁচার দরজা এক মুহূর্তের জন্য খুলিয়া দেয় না তাহারাই রাত্রিদিন বলে 'তোমাদের উড়িবার শক্তি নাই'। পাখির ছানা তো বি.এ. পাশ করিয়া উড়িতে শেখে না; উড়িতে পায় বলিয়াই উড়িতে শেখে। ...

www.pathagar.com

উড়িতে পারা যে সম্ভব এ সম্বন্ধে কোনোদিন তাহার মনে সন্দেহ আসিয়া তাহাকে দুর্বল করিয়া দেয় না। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, অপরে আমাদের শক্তি সম্বন্ধে সর্বদা সন্দেহ প্রকাশ করে বলিয়াই এবং সেই সন্দেহকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার কোনো ক্ষেত্র পাই না বলিয়াই অন্তরে অন্তরে নিজের সম্বন্ধে একটা সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া যায়।" (ঐ) জাতীয় জীবনে যেমন তেমনি ব্যক্তি-মানুষের বেলায়ও এই হীনম্মন্যতার অবসান ঘটিয়ে তার মধ্যে আত্মশক্তিতে আস্থা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হিসেবে নির্দেশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'লক্ষ্য ও শিক্ষা' প্রবন্ধেই তাঁর বক্তব্য :

> 'তুমি কেরানির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি মুন্‌সেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা কিছু শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুলমাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্সনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে' এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে।

আর রবীন্দ্রনাথের মতে, "এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড় মূঢ়তা। আমাদের সমাজ একথা আমাদিগকে বোঝায় না, আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই।" এবং "আমরা যে কী হইতে পারি, কতদূর আশা করিতে পারি, তাহা মোটা লাইনে বড়ো রেখায় দেশের কোথাও আঁকা নাই।" পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় যে-কোনো পরিবর্তনের গোড়ার কথা, রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, "আমরা কোথায় আছি, কোন দিকে চলিতেছি তাহা সুস্পষ্ট করিয়া জানা চাই।" কারণ "জীবনের কোনো লক্ষ্য নাই অথচ শিক্ষা আছে, ইহার কোনো অর্থই নাই।" (ঐ)

উপরে যে জাতিগত দৌর্বল্য বা হীনম্মন্যতার কথা বলা হল তার সবটাই আরোপিত বা পরাধীনতার ফল রবীন্দ্রনাথ এমনও মনে করেন না। তাঁর মতে, এটি 'ভিতরকারই ব্যাধি'। লিখেছেন, "দোষ বাহিরের নহে, তাহার রক্ত দূষিত হইয়াছে; নহিলে এমন সাংঘাতিক দুর্বলতা, এমন মোহাবিষ্ট জড়তা মানুষকে এত দীর্ঘকাল এমন করিয়া সকল বিষয়ে পরাভূত করিয়া রাখিতে পারে না।" (ঐ)

রবীন্দ্রনাথের মতে, আমরা শিক্ষাকে জীবনের বাহন করে না তুলে বিদেশের নকল করা শিক্ষার ভার বহন করে চলেছি। আর তার পরিণতি, 'অসন্তোষের কারণ' (১৩২৬) প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "ভয়ে ভয়ে ইংরেজের ডাক্তার ছাত্র পুঁথি মিলাইয়া ডাক্তারি করিয়া চলিল, কিন্তু শারীরবিদ্যায় বা চিকিৎসাশাস্ত্রে একটা-কোনো নূতন তত্ত্ব বা তথ্য যোগ করিল না। ইংরেজের এঞ্জিনিয়ার ছাত্র সতর্কতার সহিত পুঁথি মিলাইয়া এঞ্জিনিয়ারি করিয়া পেন্সন লইতেছে, কিন্তু যন্ত্রতত্ত্বে বা যন্ত্র-উদ্ভাবনায় মনে রাখিবার মতো কিছুই করিতেছে না।" 'শিক্ষাপ্রণালীটাই যে আমাদের

www.pathagar.com

ব্যর্থতা'র, 'শিক্ষার এই শক্তিহীনতা'র কারণ, রবীন্দ্রনাথের মতে, "অভ্যাসগত অন্ধ মমতার মোহে সেটা আমরা কিছুতেই মনে ভাবিতে পারি না।" (ঐ) ফলে "প্রণালী বদল করিবার কথা মনেই আসে না; ... নূতনের ঢালাই করিতেছি সেই পুরাতনের ছাঁচে।" বলেছেন, "অনেক কাল এমনি করিয়া কাটিল, আর সময় নষ্ট করা চলিবে না।" এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রায় শত বছরের ব্যবধানে এবং দু-দুবার রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পরও, সেই প্রণালি, পুরাতনের ছাঁচ বদলের পথে আমরা কতটা অগ্রসর হয়েছি? জ্ঞান-বিদ্যার কোনো ক্ষেত্রেই আমরা যে বিশেষ মৌলিকত্ব প্রদর্শন করতে পারিনি, রবীন্দ্রনাথের মতে তারও কারণ, বিদেশ থেকে পাওয়া বিদ্যাটাকে 'নিজের বিচার খাটিয়ে ও তেজের সঙ্গে' ব্যবহারের ভরসা আমরা পাই না। আর এই না-পারার কারণ, 'বিদ্যার যাচাই' (১৩২৬) প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "বিদ্যাটাও যেখান হইতে ধার করিয়া লইতেছি বুদ্ধিটাও সেখান হইতে ধার-করা।" এ-প্রসঙ্গে তাঁর আরও মন্তব্য : "আদালতটাই আমাদের এখানে নাই, কাজেই বিদেশের বিচারের নকল আনাইয়া আমাদিগকে বড়ো সাবধানে কাজ চালাইতে হয়।" আর রবীন্দ্রনাথের মতে, "নিজের বুদ্ধিবিভাগে যে লোক কর্তাভজা পোলিটিক্যাল বিভাগেও কর্তাভজা হওয়া ছাড়া তার আর গতি নেই।" (শি. মি.)

৭

শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারটি অনেককাল ধরেই আমাদের কাছে এক প্রধান উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠার বিষয়। তো প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রদের দ্বারা ইংরেজ অধ্যাপক ওটেনের লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাটিতে (যাকে কেন্দ্র করে সুভাষচন্দ্র বসুকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল) আপন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে লেখা তাঁর 'ছাত্রশাসনতন্ত্র' (১৩২২) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত যুক্তিবাদী ও ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টিকে বিবেচনা করেছেন। এ রচনাটিতেও তাঁর ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী মনোভাব খুব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর মতে, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বটি কেবল শিক্ষার্থীদের নয়, এ ব্যাপারে শিক্ষকদেরও দায়িত্ব আছে। ছাত্রদের 'জেলের কয়েদি বা ফৌজের সিপাই' মনে না করে তাদেরকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কর্তব্যটির ওপর জোর দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যাদের উচিত ছিল জেলের দারোগা বা ড্রিল সার্জেন্ট বা ভূতের ওঝা হওয়া' তাদের কোনোমতেই ছাত্রদের মানুষ করার দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয়। একইভাবে সম্মান ব্যাপারটিও তাঁর মতে একতরফা নয়। তিনি লিখেছেন, "ছাত্রদিগকে যারা স্বভাবতই শ্রদ্ধা করিতে না পারে ছাত্রদের নিকট হইতে ভক্তি তারা সহজে পাইতে পারিবে না।" এবং "শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করিলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেখানে সেই শ্রদ্ধার সম্পর্ক নাই সেখানে আদানপ্রদানের সম্বন্ধ কলুষিত হইয়া উঠে। জেলখানার কয়েদিরা হাতে বেড়ি

www.pathagar.com

পরিয়া যে অন্ন খাইতে বসে তাকে যজ্ঞের ভোজ বলা বিদ্রূপ করা। জ্ঞানের ভোজ আনন্দের ভোজ।" সনাতনী নীতিবাদী দৃষ্টিকোণ কিংবা, অন্যভাবে বললে, 'প্রবীণ পরম-পাকা'দের অবস্থান থেকে তরুণদের আচরণকে বিচারের প্রবণতারও তিনি সমালোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "সুবুদ্ধির কথা চিরকাল খাটে না; মানবপ্রকৃতি সুবুদ্ধির পাকা ভিতের উপরে পাথরে গাঁথিয়া তৈরি হয় নাই। তাকে বাড়িতে হইবে, এইজন্যই সে কাঁচা। এইজন্যই কৃত্রিম ঘেরটাকে সে খানিকটা দূর পর্যন্ত সহ্য করে; তার পরে প্রাণের বাড় আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, একদিন হঠাৎ বেড়া ফাটিয়া ভাঙিয়া পড়ে। যে প্রাণ কচি তাহারই জয় হয়, যে বাঁধন পাকা সে টেঁকে না।" বয়ঃসন্ধিকালে, যখন শিক্ষার্থীরা 'শাসনের সীমানা থেকে স্বাধীনতার এলাকায় প্রথম পা বাড়ায়', তখন তাদের পক্ষে সহজে এমনকি অনেক সময় অকারণেও উত্তেজনা প্রকাশ স্বাভাবিক গণ্য করে রবীন্দ্রনাথের অভিমত : "যেখানে ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপকের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সেখানে এই-সকল উৎপাতকে জোয়ারের জলের জঞ্জালের মতো ভাসিয়া যাইতে দেওয়া হয়"। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন, "এই বয়ঃসন্ধিকালটিই বেদনাকাতরতায় ভরা। এই সময়েই অল্পমাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিঁধিয়া থাকে এবং আভাসমাত্র প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে।" এবং "এই বয়সে ছাত্রগণ শিক্ষার উদ্যোগপর্ব শেষ করিয়া মনুষ্যত্বের সার জিনিসগুলিকে আত্মসাৎ করিবার পালা আরম্ভ করে; ... চিবাইয়া খাইবার বয়স আসিলে বেশ একটু জানান দিয়া দাঁত ওঠে, তেমনি মনুষ্যত্বলাভের যখন বয়স আসে তখন আত্মসম্মানবোধটা একটু ঘটা করিয়াই দেখা দেয়।" এ প্রসঙ্গে পৃথিবীর অন্য (স্বাধীন) দেশ বা সেখানকার অবস্থার সঙ্গে (পরাধীন) ভারতবর্ষ বা বাঙলার অবস্থা ও এ দেশের ছাত্রদের আচরণের তুলনাকে তিনি সঙ্গত মনে করেননি। বলেছেন, "বাংলাদেশের ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব যে বিধাতার একটা খাপছাড়া খেয়াল একথা মানি না।" এবং "আমাদের দেশ ইংলন্ড্ নয়, ইটালি নয়, আমেরিকা নয় : সেখানকার মাপে কোনোমতেই আমাদের ইতিহাসকে ছাঁটা চলিবে না।" শিক্ষক পদে আসীন থেকে বা তার সুযোগ নিয়ে কেউ উপনিবেশবাদী মনোবৃত্তির পরিচয় দেবেন, সঙ্কীর্ণ জাত্যভিমান বা অন্ধ জাতিবিদ্বেষ প্রচার করবেন, অথচ ছাত্রদের সে অপমান মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হবে, আর এভাবেই তাদেরকে তাদের গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে, রবীন্দ্রনাথের কাছে একে মোটেও সমর্থনযোগ্য মনে হয়নি। এ সম্পর্কে 'ছাত্রশাসনতন্ত্র' প্রবন্ধেই তিনি বেশ তীব্র ভাষায়ই তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন :

> ... আমার কথা এই, ছেলেরা যা খুশি তাই কখনো করিবে না। তারা ঠিক পথেই চলিবে, যদি তাহাদের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করা হয়। যদি তাহাদিগকে অপমান কর, তাহাদের জাতি বা ধর্ম বা আচারকে গালি দাও, যদি দেখে তাহাদের পক্ষে সুবিচার পাইবার আশা নাই, যদি অনুভব করে যোগ্যতাসত্ত্বেও

www.pathagar.com

তাহাদের স্বদেশীয় অধ্যাপকেরা অযোগ্যের কাছে মাথা হেঁট করিতে বাধ্য, তবে ক্ষণে ক্ষণে তারা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেই; যদি না করে তবে আমরা সেটাকে লজ্জা এবং দুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করিব।

এবং

... আজ আমাদের ছাত্রেরা কেবলমাত্র ইংরেজি কেতাবের ইংরেজি নোট কুড়ানোর উঞ্ছবৃত্তিতেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে না, আজ তারা আত্মসম্মানকে বজায় রাখিতে চাহিবেই; আজ তারা নিজেকে কলের পুতুল বলিয়া ভুল করিতে পারিবে না; আজ তারা জেলের দারোগাকে নিজের গুরু বলিয়া মানিয়া শাসনের চোটে তাকে গুরুভক্তি দেখাইতে রাজি হইবে না।

৮

শিক্ষাক্ষেত্রে বিদেশী ছাঁচের নকলের তিনি যেমন বিরোধিতা করেছেন, একই রকম দৃঢ়তা নিয়ে জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে যে-কোনো রকম সঙ্কীর্ণতা বা একদেশদর্শিতার বিরুদ্ধেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। জোর দিয়েছেন বিদ্যাসমবায়ের ওপর। এ প্রসঙ্গে 'বিদ্যাসমবায়' (১৩২৬) প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য : "জাতিগত বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যকে একান্তভাবে লালন করিবার দিন আজ আর নাই। আজ বিদ্যাসমবায়ের যুগ আসিয়াছে। সেই সমবায়ে যে বিদ্যা যোগ দিবে না, সে বিদ্যা কৌলীন্যের অভিমানে অনূঢ়া হইয়া থাকিবে। সে নিষ্ফল হইয়া মরিবে।" তিনি লিখেছেন, "দীর্ঘকাল আমাদের বিদ্যাকে আমরা একঘরে করিয়া রাখিয়াছিলাম। দুই রকম করিয়া একঘরে করা যায়? এক অবজ্ঞার দ্বারা, আর-এক অতিসম্মানের দ্বারা।" রবীন্দ্রনাথের মতে, "দুইয়েরই ফল এক। দুইয়েতেই তেজ নষ্ট করে।" আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় 'আমাদের নিজ দেশের বিদ্যার স্থান নেই, অথবা তার স্থান সব-পিছনে', এটা যেমন তাঁর কাছে ক্ষতিকর মনে হয়েছে, তেমনি বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যকেও তিনি মূঢ়তার পরিচায়ক বলে মনে করেছেন। প্রথম বিচ্ছেদটিকে তিনি বলেছেন 'অজ্ঞানের, সুতরাং মার্জনীয়' কিন্তু পরবর্তী বিচ্ছেদটি তাঁর মতে 'শিক্ষিত মূঢ়তার, সুতরাং হাস্যকর ও ততোধিক অনিষ্টকর'। এ অবস্থায় বিদ্যাসমবায়ের এমন একটি বড় ক্ষেত্রের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছেন 'যেখানে বিদ্যার আদান প্রদান ও তুলনা হবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রেখে বিচার' করা হবে। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা বলা বাহুল্য সে আকাঙ্ক্ষা বা তাগিদ থেকেই। এ প্রসঙ্গে পলিটিকাল ঐক্যের চেয়ে 'গভীরতর উচ্চতর মহত্তর যে ঐক্য চিত্তের ঐক্য আত্মার ঐক্য তাকে বড় বলে জানা'র প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন তিনি। (ঐ) পশ্চিমের বিদ্যার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে তার সঙ্গে শয়তানিও আছে সত্যি। তাই বলে "পশ্চিমের লোকে যে বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেছে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ

www.pathagar.com

কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে।" ('শিক্ষার মিলন')। কারণ বিদ্যা সত্য, শয়তানি সত্য নয়। (ঐ) অন্ধবিশ্বাস ও নিয়তিনির্ভরতা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করার শিক্ষাটা কিন্তু আমরা পাশ্চাত্যের কাছ থেকেই পেয়েছি। আর "মানুষের বুদ্ধিকে ভূতের উপদ্রব এবং অদ্ভুতের শাসন থেকে মুক্তি দেবার ভার যে পেয়েছে তার বাসাটা পূর্বেই হোক আর পশ্চিমেই হোক তাকে ওস্তাদ বলে কবুল করতে হবে।" (ঐ) এ প্রসঙ্গে আমাদের অবস্থার উল্লেখ করে তিনি বলেছেন : "এখনো যারা বিশ্বব্যাপারে জাদুকে অস্বীকার করতে ভয় পায় এবং দায়ে ঠেকলে জাদুর শরণাপন্ন হবার জন্যে যাদের মন ঝোঁকে, বাইরের বিশ্বে তারা সকল দিকেই মার খেয়ে মরছে, তারা আর কর্তৃত্ব পেল না।" এবং "বিশ্বব্যাপারে যে মানুষ আকস্মিতাকে মানে সে নিজেকে মানতে সাহস করে না, সে যখন-তখন যাকে-তাকে মেনে বসে; শরণাগত হবার জন্যে সে একেবারে ব্যাকুল।" (ঐ) তবে পশ্চিমের শয়তানি রূপটা সম্পর্কেও সচেতনতার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছেন। বলেছেন, 'ওই শয়তানির যোগেই তাদের মরণ'। (ঐ) পশ্চিমের শক্তিরূপ তাঁকে তৃপ্তি দেয়নি। বরং যে সাত মাস তিনি আমেরিকার, তাঁর ভাষায়, 'ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে' ছিলেন সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছেন, আনন্দের নয়। (ঐ) তুলনায় প্রাচীন জাপানের রূপ তাঁকে 'গভীর তৃপ্তি' দিয়েছে। সেখানে যে-জিনিসটি তিনি লক্ষ করেছেন তা হল পূর্ণতা; 'অর্থহীন বহুলতা তার বাহন নয়'। (ঐ) আর তাঁর মতে 'একান্ত রিক্ততাও নিরর্থক, একান্ত বহুলতাও তেমনি'। (ঐ)

রবীন্দ্রনাথের মতে এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির সম্বন্ধ 'অনুকরণ-অনুসরণের নয়, আদান প্রদানে'র ('তপোবন')। জবরদস্তির দ্বারা অন্যের আদর্শের অনুগত হওয়ার প্রয়াস এক্ষেত্রে কেবল বিকৃতিরই জন্ম দিতে পারে। (ঐ) 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "শিক্ষার বিষয়কে আমরা অন্য জায়গা হইতে লইতে পারি, কিন্তু মেজাজটাকে সুদ্ধ লইতে হইবে সে যে বিষম জুলুম।" 'শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধে "শিক্ষা-দোকানদারির নীচতা হইতে দেশের শিক্ষাকে ও ছাত্রগণকে আমরা কি রক্ষা করিব না?" বলে যে-আর্তি তিনি সেদিন প্রকাশ করেছিলেন তা যেমন, তেমনি 'শিক্ষাসংস্কার' প্রবন্ধে তাঁর "আমরা বিদ্যালয়ের সাহায্যে এ দেশে তাঁবেদারির চিরস্থায়ী ভিত্তিপত্তন করিতে কিছুতেই রাজি হইতে পারি না" কথাটাও শতাব্দীকাল পরে ভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক প্রেক্ষাপটেও আজ আমাদের কাছে বেশি বৈ কম গুরুত্ব বা তাৎপর্য বহন করে না।

২০০৯ *রবীন্দ্রনাথ : অন্য আলোয় (২০১১)*

www.pathagar.com

রোকেয়া : শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষাচিন্তক

একটি জনপ্রিয় ধারণা হল বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে পথিকৃৎ ভূমিকাটি রোকেয়ার। যখন আমরা একথা বলি তখন আমাদের মানোযোগে থাকে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল, যার প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন রোকেয়া। যদিও তথ্য আমাদের জানাচ্ছে, সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রায় চল্লিশ বছর, আর রোকেয়ার জন্মের সাত বছর আগে বাঙলার এই অংশে কুমিল্লায় প্রতিষ্ঠিত হয় ফয়জুন্নেসা গার্লস স্কুল। এই বিদ্যালয়টিরও প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন একজন মহিলা, নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী (১৮৩৪-১৯০৩)। তারপরও এটি একমাত্র উদাহরণ নয়। বিহারের ভাগলপুরের খলিফাবাগে প্রথম প্রয়াস (১৯০৯) ব্যর্থ হবার পর রোকেয়া যখন কলকাতায় এসে দ্বিতীয়বার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন (১৯১১) তখন ওই শহরে মুসলমান মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য আরও অন্তত দুটি বিদ্যালয় চালু ছিল। যার একটির প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন (মুর্শিদাবাদের) নবাব ফেরদৌস মহল এবং অপরটির খুজিস্তা আখতার বানু (সোহরাওয়ার্দি)। এমনকি উনিশ শতকের প্রায় গোড়ার দিকে, এদেশে মিশনারিদের উদ্যোগে নারীশিক্ষা বিস্তারের সেই সূচনাপর্বে, ১৮২২ সালের এপ্রিলে, যখন বাঙালি হিন্দু সমাজও নারীশিক্ষার প্রশ্নে তার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে পারেনি, নাম না-জানা 'একজন মুসলমান মহিলা' মিশনারিদের প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কলকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শুধু তা-ই নয়, রোকয়ারই মতো তিনি নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্রী যোগাড় করতেন। প্রিসিলা চ্যাপম্যানের *হিন্দু ফিমেল এডুকেশন*-এর (১৮৩৯) সূত্র উদ্ধৃত করে বিনয় ঘোষ তাঁর *বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ* গ্রন্থে (১৯৭৩) এ তথ্য দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য :

> একজন মুসলমান মহিলার পক্ষে ১৮২২ সালে স্ত্রীশিক্ষার জন্য এই ধরনের উৎসাহ প্রকাশ করা অনেকের কাছে নিশ্চয়ই বিস্ময়কর বলে মনে হবে। কলকাতা শহরের মুসলমান পুরুষরাই যখন ইংরেজদের প্রবর্তিত নতুন

www.pathagar.com

> শিক্ষাদীক্ষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখায়নি, তখন একজন মুসলমান মহিলার পক্ষে একজন খ্রীস্টান মহিলা প্রচারিত স্ত্রীশিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া নিশ্চয় একটি বিস্ময়কর ঘটনা। ... এছাড়া মির্জাপুর, এন্টালি, জানবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের স্থানীয় মুসলমানরাও দেখা যায়, মিস কুকের (মিসেস উইলসনের) স্ত্রীশিক্ষার আদর্শে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং এইসব অঞ্চলে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছিলেন। এগুলি সবই সত্য ঘটনা, কিন্তু এদেশে শিক্ষার ইতিহাসের বিশাল বিশাল মহাগ্রন্থের পৃষ্ঠায় কোথাও এদের স্থান হয়নি। তা যদি দেওয়া হত, তা হলে বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাসে মুসলমানদের প্রকৃত ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের অনেক ধারণা বদলে ফেলে আবার নতুন করে চিন্তা করতে হবে, যখন এই ধরনের সব সত্য ঘটনা আঞ্চলিক ইতিহাসের জীবন্ত জনস্তর থেকে নতুন করে আবিষ্কৃত হবে।[১]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে নারীশিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টায় নিবেদিতপ্রাণ আরেকজন মুসলমান মহিলার নাম আমরা জানতে পারি। তিনি খায়রন্নেসা খাতুন (১৮৭৪/৬-১৯১০)। রোকেয়া যখন কলকাতায় তাঁর বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন তারও পনেরো বছর আগে, ১৮৯৫ সালে, এই বাঙলায় সিরাজগঞ্জের প্রত্যন্ত এক গ্রাম হোসেনপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা ও তাতে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত হন তিনি। মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা এই নারী আমৃত্যু উক্ত প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। জানা যায়, বিদ্যালয়ের খরচ যোগাতে তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুষ্টিচাল সংগ্রহ করতেন। 'সতীর পতিভক্তি' (১৯০৮) নামক একটি উপদেশমূলক গ্রন্থ ছাড়াও তিনি পত্রপত্রিকায় শিক্ষাসমস্যা ও রাজনৈতিক বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। শিক্ষা বিষয়ে তাঁর এমনি একটি প্রবন্ধের নাম 'আমাদের শিক্ষার অন্তরায়'। *সতীর পতিভক্তি* ও 'আমাদের শিক্ষার অন্তরায়' উভয় রচনায়ই খায়রন্নেসা নারীশিক্ষার অত্যাবশ্যকতার কথা বলেছেন। 'আমাদের শিক্ষার অন্তরায়' (১৯০৪) প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন : "শিক্ষার মূলগত অসুবিধা ও বাধাবিঘ্ন দূর না করিয়া শত সহস্র বক্তৃতা ও শত শত প্রবন্ধ দ্বারাও কখনও এ শিক্ষার যে বিস্তৃতি হইবে না, তাহা কি আর বলিতে হইবে?"[২] খায়রন্নেসা যখন নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন তখন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের নারীদের জন্যই তা বলেছেন। আর এর সপক্ষে তিনি উভয় ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ থেকেই উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[৩] তাঁর নিজ বিদ্যালয়েও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েরাই পড়াশুনা করত। যদিও, বাস্তব কারণেই, হিন্দু মেয়েদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল।

---

১. বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, কলকাতা : ১৯৭৩, পৃ. ২১৩-১৪।

২. উদ্ধৃত : সৈয়দ আবুল মকসুদ, *পথিকৃৎ নারীবাদী খায়রন্নেসা খাতুন*, ঢাকা : ১৯৯২, পৃ. ৩৬।

৩. দেখুন : ঐ, পৃ. ৩৬।

www.pathagar.com

কাজেই, ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর (১৮৮২) ব্যবস্থাপনায় মুসলমান মেয়েদের মধ্যে গৃহশিক্ষাদান কর্মসূচির কথা যদি বাদও দিই, প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষা উদ্যোগের ক্ষেত্রেও প্রথমের শিরোপা রোকেয়ার প্রাপ্য নয়। কিন্তু প্রথম না হয়েও তিনি পথিকৃৎ, পুরোধা। তবে তা অন্য বিবেচনায়।

২

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা ও তাকে চালু রাখতে গিয়ে রোকেয়াকে তাঁর নিজ সমাজের কাছ থেকে কতখানি বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়, কী রকম অপবাদ ও লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়, আমরা কমবেশি জানি। রোকেয়া নিজেও তাঁর রচনায়, বইয়ের উৎসর্গলিপিতে এবং চিঠিপত্রে তার উল্লেখ করেছেন। তবে কেবল রোকেয়ার বেলায়ই এমনটি ঘটেনি, কিংবা বাঙালি মুসলমান সমাজের একক বৈশিষ্ট্য হিসেবেও একে দেখা ঠিক হবে না। একশো বছর আগে বাঙালি হিন্দু সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারের প্রথম প্রচেষ্টাকালেও উদ্যোক্তাদের প্রায় একই ধরনের আপত্তি ও প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করতে হয়। পর্দাপ্রথা ও বাল্যবিবাহ সেদিনও এক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দেখা দেয়। এছাড়া ছিল স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে সমাজে চালু নানা অপবিশ্বাস ও অপপ্রচার। যেমন মনে করা হত মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা বা অসতী হয়। বস্তুত উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাঙালি হিন্দু সমাজে এই কুসংস্কার দৃঢ়মূল ছিল। বলা বাহুল্য, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে শাস্ত্রবচনের সমর্থন নিয়ে বা অপব্যাখ্যা দিয়ে সমাজপতিরাই স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধী ধারণা প্রচার করতেন।[৪] উল্টো দিকে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতীদেরও তাঁদের মতের সমর্থনে একইভাবে শাস্ত্রের দোহাই দিতে হয়েছে। দূর অতীত থেকে মৈত্রেয়ী, লীলাবতী, খনা কিংবা সমসাময়িক কালের রানী ভবানী, হটী বিদ্যালঙ্কারের মতো বিদূষীদের উদাহরণ দেখাতে হয়েছে। অনুরূপভাবে বাঙালি মুসলমান সমাজেও নারীশিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টায়, আমরা দেখি, রোকেয়াসহ

---

৪. নমুনা হিসেবে আমরা এখানে *সমাচার দর্পণ*-এর ২৬ মে ১৮৩৮ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করতে পারি। একই পত্রিকায় ইতিপূর্বে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে লেখা একটি চিঠির বক্তব্যের বিরোধিতা করে মুর্শিদাবাদের কৈলাশচন্দ্র সেন তাঁর পত্রে লেখেন :

> ... লেখক মহাশয় নারীগণের বিদ্যাভ্যাস না হওয়াতে দেশীয় সৌষ্ঠবের বিলম্ব হইতেছে লিখিয়াছেন। হায় কি অপূর্ব্ব কথা অঙ্গনারা বিদ্যাশিক্ষা করিলে দেশের যে কিসে উপকার দর্শিত তাহা আমার বোধগম্য হয়না যেহেতুক স্ত্রীলোককে সর্ব্বশাস্ত্রেই অবিশ্বাসী ও খল কহিয়াছেন তাহার এক প্রমাণ বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্য স্ত্রীষু রাজকলেষু চ। ... লেখক আরো লেখেন যে স্ত্রীরা বিদ্যা বুদ্ধিহীন প্রযুক্ত পুরুষেরা তাঁহারদের সংসর্গে সভ্যতা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। হায় লেখক কি গূঢ় কথা প্রকাশ করিয়াছেন তিনি কি ইহা জানেন না যে স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী শাস্ত্রে কহে। ... [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ২য় খণ্ড, কলকাতা : ১৪০১, পৃ. ১০১]

www.pathagar.com

উদ্যোক্তারা কোরান-হাদিসের এতদ্‌সংক্রান্ত উদ্ধৃতি এবং ইসলামের ইতিহাস ও সমসাময়িক মুসলিম জগত থেকে বিদূষী নারীদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

উনিশ শতকের গোড়ায় বাঙালি হিন্দু সমাজে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রথম উদ্যোগটি আসে খ্রিস্টান মিশনারিদের তরফ থেকে। প্রথমে 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' (১৮১৯) ও পরে 'বেঙ্গল লেডিজ সোসাইটি' (১৮২৪) প্রতিষ্ঠা এবং তার আওতাধীনে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে। কয়েকজন ইংরেজ মহিলার আর্থিক সহায়তায় এই বিদ্যালয়গুলো স্থাপিত হয়। তবে তথাকথিত ভদ্র বা সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনো মেয়ে এসব বিদ্যালয়ে পড়তে আসত না। বর্ণ ও শ্রেণিতে সমাজের একেবারে নিম্নস্তরে যাদের অবস্থান তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ, তা-ও যতটা না বিদ্যালাভের জন্য তার চেয়ে বেশি পুরস্কার-পারিতোষিকের আকর্ষণে, এসব বিদ্যালয়ে ভর্তি হত। এ সম্পর্কে *সমাচার দর্পণ*-এর ৩ মার্চ ১৮৩৮ সংখ্যায় 'কস্যচিৎ ব্রাহ্মণস্য। চুঁচুড়া' পরিচয়ে একজন পত্রলেখক লেখেন : "কএক জন হিতৈষি সাহেব লোক ও বিবি সাহেবেরা স্ত্রীলোকেরদের বিদ্যা শিক্ষার্থে পাঠশালা স্থাপনার্থ উদ্যোগী হইয়াছেন কিন্তু দুই এক স্থানে অতি নীচ জাতীয় কএক জন বালিকা বস্ত্র ও অন্যান্য পারিতোষিকের নিমিত্ত তাঁহারদের পাঠশালাতে গমন করে কিন্তু অন্যান্য স্থানে তাঁহারদের ঐ উদ্যোগ বিফলই হইয়াছে।"[৫] মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত এসব বিদ্যালয়ে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বাইবেল পড়ানো হত, সম্ভবত এটাও একটা বড় কারণ যেজন্য এমনকি স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী বর্ণহিন্দুরাও তাদের পরিবারের মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে চাইত না। একই কারণে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ব্রিটিশ এ্যান্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি যখন মিস মেরি অ্যান কুককে কলকাতায় পাঠায় (১৮২১) তখন রাজা রাধাকান্তদেবসহ হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁকে কোনো রকম সাহায্য-সহযোগিতা করতে রাজি হননি। এ ব্যাপারে রেভারেন্ড পিয়ার্সকে লেখা এক চিঠিতে রাধাকান্তদেব বলেছিলেন, কোনো ভালো বা সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারই মিস কুককে তাদের অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার দেবে না বা তাঁর বিদ্যালয়ে মেয়েদের পাঠাবে না। তিনি বরং মিস কুককে 'if required' মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোতে ও 'poor classes of Native females'দের মধ্যেই তাঁর শিক্ষাদান কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৬] এ পর্যায়ে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের অন্তঃপুরে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করতেই রাধাকান্তদেবরা বরং উৎসাহী ছিলেন। সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের মেয়েদের প্রকাশ্য শিক্ষাদানের লক্ষ্যে ১৮৪৭ সালে প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র, নবীনকৃষ্ণ মিত্র প্রমুখের উদ্যোগে

---

৫. উদ্ধৃত : স্বপন বসু (সম্পা), *উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা*, 'ভূমিকা', কলকাতা : ১৪১২, পৃ. ১২-১৩।
৬. স্বপন বসু (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

www.pathagar.com

বারাসাতে যদি বা একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তা সমাজে কোনো সাড়া জাগাতে পারেনি। বরং উদ্যোক্তারা সমাজের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হন, একঘরে করা হয় তাঁদেরকে। অবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুল (তখন যার নাম ছিল ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠালগ্নেই শর্ত করা হয়, এই বিদ্যালয়ে কেবল সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের মেয়েরাই ভর্তি হতে পারবে, অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোনো মেয়েকে ইংরেজি শেখানো হবে না, মেয়েদের স্কুলে আনা-নেওয়ার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা থাকবে, ইত্যাদি। তারপরও প্রথমদিকে যাঁরা এ বিদ্যালয়ে মেয়েদের পড়তে পাঠিয়েছিলেন, এ ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদেরকে সমাজের প্রবল বাধা ও অনেক নিন্দা-সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়। যেমন নিজ মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর 'অপরাধে' মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে দীর্ঘদিন সমাজচ্যুত করে রাখা হয়। গোবিন্দচন্দ্র গুপ্তের স্কুল-পড়ুয়া মেয়ে ও ভাগ্নির বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যায়।[৭] স্কুলে ভর্তি করেও সমাজের চাপে বা বিরূপ সমালোচনার মুখে অনেকে তাঁদের মেয়েদের ছাড়িয়ে নিতেন। এভাবে ২১টি মেয়ে নিয়ে যার যাত্রারম্ভ, ১৮৬৭ সালে অর্থাৎ প্রায় দুই দশকে, সেই বেথুন বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা বেড়ে-কমে দাঁড়ায় ৩০-এ।[৮] বেথুন স্কুলের সেক্রেটারি (অবৈতনিক) হিসেবে বিদ্যাসাগর ১৮৬২ সালে স্কুল সম্পর্কে সরকারকে যে-প্রতিবেদনটি পাঠান তাতেও তিনি মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর ব্যাপারে বিত্তবান শ্রেণির দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উল্লেখ করেন।[৯] ইয়ং বেঙ্গলদের আবির্ভাব এবং ব্রাহ্মসমাজের কিছু নেতৃস্থানীয় পুরুষের উদ্যোগ, তাঁদের লেখালেখি, বক্তব্য-বিবৃতির প্রভাব স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে বাঙালি হিন্দুর বিরুদ্ধতা হ্রাস কিংবা ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টিতে অবদান রাখলেও, সমাজের সামগ্রিক চালচিত্রে তা সামান্যই পরিবর্তন আনতে পারে। নব্য ইংরেজি শিক্ষিতরাও যে সবাই নারীশিক্ষার প্রশ্নে একই রকম বা অন্তত অনুকূল মনোভাব পোষণ করতেন মোটেও তা নয়। চিত্রের একদিকে যদি থাকেন রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্রের মতো নারীশিক্ষার উৎসাহী সমর্থকরা তো অন্যদিকে ছিলেন কাশীপ্রসাদ ঘোষের মতো ব্যক্তিও। হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র (সকল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী) ও *হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার* পত্রিকার সম্পাদক কাশীপ্রসাদ শুধু তাঁর নারীশিক্ষা বিরোধী, রক্ষণশীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই পরিচিত ছিলেন না, তাঁর পরিবারে অবরোধপ্রথার কড়াকড়িও সেদিন একটি আলোচিত বিষয় ছিল (গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তাঁর *সম্বাদভাস্কর* পত্রিকার পাতায়

---

৭. স্বপন বসু (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

৮. বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮।

৯. ঐ, পৃ. ২২৬।

www.pathagar.com

এ নিয়ে কাশীপ্রসাদকে তীব্র বাক্যবাণে বিদ্ধ করেন[১০])। এমনকি রচনায়-ভাষণে যাঁরা ছিলেন নারীশিক্ষার প্রবল সমর্থক, আপন পরিবারের মেয়েদের বেলায় তাঁরাও অনেকে ছিলেন ভিন্ন নীতির অনুসারী। অর্থাৎ মধ্যবিত্তসুলভ স্ববিরোধ বা সীমাবদ্ধতা—সংস্কার, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাঁরাও কাটিয়ে উঠতে পারেননি। মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজন ও অধিকার যেখানে স্বীকৃত, সেখানেও কী ধরনের শিক্ষা তাদের জন্য উপযোগী, তাদের ভালো গৃহিণী বা মা হতে সাহায্য করবে বা করবে না, উচ্চশিক্ষা তাদের নিজেদের বা সমাজের জন্য কতটা হিতকর হবে বা হবে না, তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক তো ছিলই। এমনকি শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর ব্রাহ্মসমাজেও এ নিয়ে আলোড়ন-বিলোড়ন কম হয়নি। পরবর্তী শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের উত্থানের কালেও, নারীশিক্ষা প্রশ্নে একই রকম দ্বিধাগ্রস্ত মনোভঙ্গির সাক্ষাৎ পাই আমরা।

বালিকা বিদ্যালয়গুলোর জন্য দেশীয় শিক্ষিকা তৈরির উদ্দেশ্যে ১৮৬৭ সালে মিস মেরি কার্পেন্টার কলকাতায় একটি ফিমেল নর্মাল স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ নিলে বিদ্যাসাগরের মতো নারীশিক্ষার অত বড়ো প্রবক্তা তাতে সম্মতি দেননি। তাঁর আপত্তিটা অবশ্য নীতিগত ছিল না। সামাজিক বাস্তবতা বিবেচনায় সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা না দেখতে পেয়েই তিনি এ ব্যাপারে তাঁর দ্বিমতের কথা সরকারকে জানিয়েছিলেন। আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, পর্দা বা অবরোধপ্রথার কড়াকড়ির[১১] জন্য সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের কোনো বয়স্থা মেয়েকে এই কাজে পাওয়া যাবে না। তাঁর সে যুক্তি বা আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণ করে প্রায় তিন বছরের মাথায় শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ স্কুলটি চালুর চেষ্টা ছোটলাটের নির্দেশে তখনকার মতো পরিত্যক্ত হয়।

অন্য উদাহরণে আসি। ১৮৭৮ সালে, অর্থাৎ রোকেয়ার জন্মের মাত্র দু'বছর আগে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। বাঙলার নারীশিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এটি একটি বড় ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এর মধ্য দিয়ে বাঙালি নারীদের উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। আর তা সম্ভব হয়েছিল কয়েকজন আলোকপ্রাপ্ত পুরুষ—দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখের চেষ্টা বা আন্দোলনের ফলে। এঁরা সবাই ছিলেন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। তো *তত্ত্ববোধিনী*র মতো পত্রিকা সেদিন এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে লিখেছিল, "আমরা বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের

---

১০. দেখা যেতে পারে : বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০-২১।

১১. সমস্যার তীব্রতা আমরা বুঝতে পারব *বামাবোধিনী* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে স্কুল ইন্সপেক্টর উড্রোকে ইঙ্গিত করে লেখা এই মন্তব্যে : "আমরা সাহেবকে বিশেষরূপে অনুরোধ করি তিনি যেন এদেশে প্রত্যাবর্তন সময়ে ২।৩টী বিবি-সহিস ও বিবি-গাড়য়ান লইয়া আসেন।" [উদ্ধৃত : বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫]

www.pathagar.com

উপাধিধারিণী হওয়া বঙ্গদেশের বিশেষ মঙ্গলের ও উন্নতির চিহ্ন বিবেচনা করি না।"[১২] না করার কারণ, "আমাদিগের সম্পূর্ণ আশঙ্কা হইতেছে যে, বঙ্গীয় স্ত্রীলোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী অনুসারে শিক্ষিতা হইলে বঙ্গীয় শিক্ষিত পুরুষদিগের ন্যায় তাঁহারা ধর্ম্মে বিশ্বাসশূন্য ও সুনীতিবিচ্যুত হইবেন।"[১৩] এ-প্রসঙ্গে আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য পত্রিকাটি করেছিল। স্ত্রী ও পুরুষের প্রকৃতির প্রথমটিকে 'স্বভাবত হৃদয়-প্রধান' ও দ্বিতীয়টিকে 'স্বভাবত বুদ্ধি-প্রধান' হিসেবে চিহ্নিত করে *তত্ত্ববোধিনী* লিখেছিল, "স্ত্রী ও পুরুষজাতির প্রকৃতির বিভিন্নতার নিমিত্ত দুইয়ের পক্ষে একপ্রকার শিক্ষার উপযোগিতা অসম্ভব।"[১৪] প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে (১৩২২) রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে কি একই মতের প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই না, যখন তিনি লেখেন : "শিক্ষা প্রণালীতে মেয়ে পুরুষে কোথাও কোনো ভেদ থাকিবে না, এ কথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়। ... মেয়েদের শরীরের এবং মনের প্রকৃতি পুরুষের হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই তাহাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র স্বভাবতই স্বতন্ত্র হইয়াছে।..." ইত্যাদি?[১৫] ('স্ত্রীশিক্ষা') ইংলন্ড-আমেরিকায়ও এমনকি উনিশ শতক পর্যন্ত নারীর উচ্চশিক্ষার যৌক্তিকতা নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত ছিল। বিংশ শতাব্দীর ৬০-এর দশকে এসেও আমরা দেখি বাঙালি মুসলমান সমাজে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতো শিক্ষাবিদ-চিন্তকরা নারী-পুরুষের জন্য একই ধরনের শিক্ষার বিরোধিতা করেছেন।[১৬] শুধু তা-ই নয়, সমাজের অনেক অনিষ্টের জন্য তাঁদের অনেকে নারীর পুরুষের মতো একই ধরনের শিক্ষা গ্রহণকে দায়ী করেন। আজকের বাংলাদেশেও এই দৃষ্টিভঙ্গি তার শেকড় হারিয়েছে বলা যাবে না। তো এই পুরুষতন্ত্রী ধারণার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রোকেয়া সেই ১৯০৪ সালে এমনকি বোরকার সপক্ষে লেখা তাঁর একটি প্রবন্ধে মত ব্যক্ত করেন : "আমরা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে সমাজও উন্নত হইবে না। যতদিন আমরা আধ্যাত্মিক-জগতে পুরুষদের সমকক্ষ না হই, ততদিন পর্যন্ত উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। আমাদিগকে সকল প্রকার জ্ঞানচর্চা করিতে হইবে।"[১৭] ('বোরকা') 'আধ্যাত্মিক' কথাটাকে রোকেয়া এখানে 'spiritual' নয় 'intellectual' অর্থে ব্যবহার করেছেন।

শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষাচিন্তক হিসেবে রোকেয়ার কৃতিত্ব বা অবদান বিচারে এদেশের নারীশিক্ষা বিস্তার আন্দোলনের উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক পটভূমিটি আমাদের

---

১২. উদ্ধৃত : বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।
১৩. উদ্ধৃত : ঐ, পৃ. ২৩৭।
১৪. ঐ, পৃ. ২৩৭।
১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শিক্ষা*, কলকাতা : ১৩৯৭, পৃ. ১৩৯।
১৬. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *ইসলাম প্রসঙ্গ*, ঢাকা : ২০০০, পৃ. ৩৫।
১৭. আবদুল কাদির (সম্পা.), *রোকেয়া রচনাবলী*, ঢাকা : ১৯৭৩, পৃ. ৬১।

www.pathagar.com

মনে রাখতে হবে। নারীমুক্তিসহ সামাজিক অগ্রগতির পথে প্রতিটি সমাজকেই আগেপরে একই ধরনের অভিজ্ঞতা ও কমবেশি বাধাবিপত্তির মোকাবেলা করতে হয়। এক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌গমনের দৃষ্টান্তও দুর্লক্ষ্য নয়। ইংল্যান্ডে প্রথম এলিজাবেথের মতো একজন বিদূষী রানীর মৃত্যুর পর রাজা প্রথম জেমস যখন ক্ষমতায় আসেন নিজের কন্যাকে ধ্রুপদী সাহিত্য পাঠের সুযোগ দানের একটি প্রস্তাব তিনি এই বলে নাকচ করে দেন : 'To make women learned and foxes tame has the same effect—to make them more cunning.' রক্ষণশীলতা, কুসংস্কার বা গোঁড়ামি কোনো সমাজের একক বা একান্ত বৈশিষ্ট্য নয়। তেমন ধারণা করলে সেক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তন বা অচলায়তন ভাঙার কাজটিই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

৩

দুটি ক্লাস, দু'খানা বেঞ্চ ও আটজন মাত্র ছাত্রী নিয়ে ১৯১১ সালে কলকাতার অলিউল্লাহ লেনের একটি ছোট্ট ভাড়া বাড়িতে রোকেয়া যখন দ্বিতীয়বার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল চালু করেন, তারপর প্রতিবছরই বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা বেড়েছে। ১৯১২ : ২৭ জন, ১৯১৩ : ৩০ জন, ১৯১৪ : ৩৯ জন, ১৯১৫ : ৮৪ জন, ১৯১৬ : ১০০ জনের বেশি, এভাবে।[১৮] সুতরাং ছাত্রী পাওয়া যায়নি বলা যাবে না (যদিও এজন্য রোকেয়াকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রীদের অভিভাবকদের বোঝাতে হয়েছে)। বরং স্থান সঙ্কুলানের অভাব, বেঞ্চের অভাব, ছাত্রীদের আনা-নেওয়ার জন্য গাড়ির অভাবে রোকেয়াকেই মাঝখানে কয়েক বছর নতুন ছাত্রীভর্তি বন্ধ রাখতে হয়।[১৯] জীবনে এক দিনের জন্যও যাঁর কোনো পাঠশালা বা স্কুলে পড়ার সুযোগ হয়নি, প্রথমবার স্কুল স্থাপনের সময় যিনি ভেবে পাননি কিভাবে একজন মাত্র শিক্ষয়িত্রীর পক্ষে একসঙ্গে কয়েকজন ছাত্রীকে পাঠদান করা সম্ভব; বেথুন, গোখলে মেমোরিয়ালসহ কলকাতার নামী বালিকা বিদ্যালয়গুলো ঘুরে ঘুরে তাঁকে বিদ্যালয় পরিচালনার অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে হয়েছে, এমনকি ক্লাস চলার সময় ছাত্রীদের সঙ্গে শ্রেণিকক্ষের একপাশে বসেও থাকতেন তিনি।[২০] কলকাতায় তাঁর কোনো আলাদা বাসস্থান ছিল না, আমৃত্যু স্কুল বাড়িরই একটি কক্ষে তিনি থেকেছেন।[২১] বিদ্যালয় থেকে বেতন হিসেবে যা পেতেন তারও প্রায় সবটাই ব্যয়িত হত বিদ্যালয় ও ছাত্রীদের পেছনে।[২২] বিদ্যালয়ের জন্য সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত একটানা

---

১৮. সেরিনা জাহান, *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন*, কলকাতা : ১৯৯৮, পৃ. ২৫-২৬।

১৯. মুহম্মদ শামসুল আলম, *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্য*, ঢাকা : ১৯৮৯, পৃ. ১১৯।

২০. সেরিনা জাহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

২১. ঐ, পৃ. ২৭।

২২. মোতাহার হোসেন সুফী, *বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য*, ঢাকা : ১৯৮৬, পৃ. ৪৩।

www.pathagar.com

পরিশ্রম করেছেন, মৃত্যুর দিনও যার ব্যতিক্রম হয়নি। স্বাস্থ্যগত কারণে ও চিকিৎসকের পরামর্শে বিদ্যালয়ের ছুটিতেও কয়েকদিনের জন্য কলকাতার বাইরে যেতে পারেননি, কিংবা যেবার গেছেন, সেখানে বসেও তাঁকে বিদ্যালয়ের কাজ করতে হয়েছে, মন পড়ে থেকেছে কলকাতার স্কুলগৃহে।[২৩] শুধু ছাত্রী পড়ানো বা বিদ্যালয় পরিচালনা নয়, সন্ধেবেলা সহিসেরা ঠিকমতো ঘোড়া মলে কি না তার তদারকিও তাঁকেই করতে হয়েছে।[২৪] স্কুলের জন্য উপযুক্ত শিক্ষিকা খুঁজতে তাঁকে সারা দেশ ঘুরে বেড়াতে হয়েছে।[২৫] মুসলমান সমাজের দানশীল নারী-পুরুষদের কেউ কেউ নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে বিদ্যালয়কে অর্থসাহায্য করেছেন, কেউ বা একটি ঘোড়া কিনে দিয়েছেন,[২৬] কারো সহায়তায় হয়তো একটি নতুন গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সাহায্যের এই পরিমাণ ছিল খুবই কম, তা-ও সময়মতো পাওয়া যায়নি। ১৯২৭ সাল থেকে প্রতিবছর বিদ্যালয়ের একটি করে ক্লাসের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে, ১৯৩০ সালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়,[২৭] ১৯৩১ সালে, অর্থাৎ রোকেয়ার মৃত্যুর আগের বছর বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা প্রথমবারের মতো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অংশ নেয়।[২৮] কিন্তু বিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব বাড়ির স্বপ্ন রোকেয়ার শেষ পর্যন্ত পূরণ হয়নি।[২৯] চিঠিপত্রে বারবার এ নিয়ে নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করেছেন তিনি।[৩০] সমাজের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সহায়তা পাননি, উল্টো তাঁর দিকে নিন্দা-অপবাদের বাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে, এমনও বলা হয়েছে, 'যুবতী বিধবা স্কুল স্থাপন করে রূপ ও যৌবনের বিজ্ঞাপন প্রচার করছে'।[৩১] বহু চেষ্টা-তদবির সত্ত্বেও সরকারি সাহায্যের আশ্বাস বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি, চালু অনুদান পাওয়ার বেলায়ও তাঁর বিদ্যালয়টি চরম বঞ্চনা-বৈষম্যের শিকার হয়েছে।[৩২] এছাড়াও মোকাবেলা করতে হয়েছে আরও নানা সমস্যা-সঙ্কট, যেমন ব্যাংক দেওলিয়া হওয়ায় একবার স্কুল ফান্ডের ৩০ হাজার ও পরের বার ২০ হাজার টাকা গচ্চা গেছে।[৩৩] তারপরও রোকেয়া নিরুদ্যম হননি।

---

২৩. মোশ্‌ফেকা মাহমুদ, *পত্রে রোকেয়া পরিচিতি*, ঢাকা : ১৯৯৬, পৃ. ২৪-২৫ ও ২৮।
২৪. ঐ, পৃ. ১৪।
২৫. মুহম্মদ শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।
২৬. সেরিনা জাহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।
২৭. মোশ্‌ফেকা মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯ ও ২০।
২৮. মুহম্মদ শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।
২৯. মোশ্‌ফেকা মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।
৩০. ঐ, পৃ. ২৫ ও ২৮।
৩১. উদ্ধৃত : সেরিনা জাহান, প্রাগুক্ত, ৩১।
৩২. মুহম্মদ শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।
৩৩. সেরিনা জাহান, প্রাগুক্ত, ২৪।

www.pathagar.com

বিদ্যালয়ের জন্য রোকেয়া কেবল ত্যাগই স্বীকার করেননি। বিদ্যালয়টি টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তাঁকে অনেক রকম আপসও করতে হয়েছে, অন্য অর্থে যা হয়তো ত্যাগেরই নামান্তর। যেমন *অবরোধবাসিনীর* রচয়িত্রী এবং অবরোধপ্রথাকে যিনি 'প্রাণঘাতক কার্বনিক এসিডে'র সঙ্গে তুলনা করেছেন,[৩৪] ব্যক্তিগতভাবে আজীবন পর্দার কড়াকড়ি মেনে চলেছেন। পাছে তাঁর বেপর্দা চলাফেরার অজুহাত তুলে বিরুদ্ধবাদীরা হৈ-চৈ তোলে, আর তাতে বিদ্যালয়ের ক্ষতি হয়। একই কারণে প্রথম সংখ্যা থেকে *সওগাত*-এর নিয়মিত ও একজন প্রধান লেখক হওয়া সত্ত্বেও, পত্রিকার বিশেষ মহিলা সংখ্যার জন্য তিনি নিজের ছবি ছাপতে দিতে রাজি হননি। এ সম্পর্কে *সওগাত* সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনকে বলেছিলেন, "আমার স্কুলটা আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। একে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমি সমাজের অযৌক্তিক নিয়মকানুনগুলিও পালন করছি। ... স্কুলের জন্য আমি সমাজের সব অবিচার, অত্যাচার সহ্য করে চলেছি।"[৩৫] আশা করেছেন একদিন সমাজ থেকে এসব কুসংস্কার দূর হবে।[৩৬] একমাত্র শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই যে তা সম্ভব সেটা রোকেয়া জানতেন। আর তাঁর জীবন তো ছিল সে লক্ষ্যেই উৎসর্গীকৃত।

সমাজ ও নিকটজনদের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ ও অভিমান ছিল, কখনো কখনো তীব্র ভাষায় তা প্রকাশও করেছেন। বিদ্যালয়কে টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁর হাড়ভাঙা খাটুনির বিনিময়ে সমাজের কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্তি, তিনি বলেছেন, 'ভাঁড় লিপকে হাত কালা'।[৩৭] ইসলামিয়া কলেজের জন্য যাঁরা হাজার হাজার টাকা চাঁদা দিতে পারেন বালিকা বিদ্যালয়ের বেলায় তাঁদেরই অনীহা তাঁকে হতাশ ও আহত করেছে,[৩৮] সামান্য কাসন্দ উপহারের জন্য নিকটাত্মীয়াকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়েও লিখেছেন, "তুমি কাসন্দ না দিয়ে যদি স্কুল ফাণ্ডে চার পাঁচটা টাকা পাঠাতে তাতে আমি বেশী সুখী হতাম।"[৩৯] দুঃখে-হতাশায় একবার বিদ্যালয়ের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিও চেয়েছিলেন তিনি, যদিও কমিটি তাঁর সে পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেনি।[৪০] বিদ্যালয়ের নাম থেকে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল' কথাটা বাদ দিয়ে, এমনকি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের শর্তে হলেও বিদ্যালয়ের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছেন রোকেয়া।[৪১] এ সম্পর্কে মৃত্যুর কিছুদিন আগে লেখা 'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম'

---

৩৪. আবদুল কাদির (সম্পা.), *রো.র.*, পৃ. ২৮২।
৩৫. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *বেগম রোকেয়া*, ঢাকা : ১৯৯৬, পৃ. ১১৭।
৩৬. ঐ, পৃ. ১১৭।
৩৭. মোশ্‌ফেকা মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।
৩৮. আবদুল কাদির (সম্পা.), *রো.র.*, পৃ. ২৮৩।
৩৯. মোশ্‌ফেকা মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।
৪০. সেরিনা জাহান, প্রাগুক্ত, ৩৫।
৪১. মোশ্‌ফেকা মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১।

www.pathagar.com

প্রবন্ধে তাঁর মন্তব্য : "এই স্কুল সম্বন্ধে মাথাব্যথায় আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই। যাঁদের বংশধর আছে, যাঁদের ভবিষ্যৎ আছে, তাঁরা যদি সমাজটাকে রক্ষা করতে চান, তবে সমাজের মাতৃস্থানীয়রা এই বালিকা স্কুলটাকে একটা আদর্শ বিদ্যালয়রূপে গঠিত করুন।"[৪২] সমাজের প্রতি ক্ষোভ বা মনোবেদনা থেকে উৎসারিত এই কথাগুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে কঠিন নয়। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল রোকেয়ার কাছে কলকাতার মুসলমান মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা দানের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয় মাত্র ছিল না। ছিল অনেক বড় কিছু। এক বিশাল সামাজিক ব্রত সাধনের অঙ্গ, উপায়। নিজের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিদ্যালয়টিকে তিনি এ উদ্দেশ্যে একটা মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

৪

মৃত্যুর মাস ছয়েক আগে তৎকালীন বাঙলার সহকারী জনশিক্ষা পরিচালক তোসাদ্দক আহমদকে এক চিঠিতে রোকেয়া লিখেছিলেন, "চিরকাল আমি স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য কিছু করবার চেষ্টা করেছি, আর আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহ্ এতে আমাকে সাহায্য করবেন এবং একমাত্র আল্লাহই আমার ভরসা।"[৪৩] রোকেয়ার শিক্ষাচিন্তার বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য এবং শিক্ষাব্রতী হিসেবে তাঁর সাফল্য-ব্যর্থতা বিচারের ক্ষেত্রে তাঁর এই নারী স্বাধীনতার প্রবক্তা পরিচয়টিকে আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে। তাঁর সাহিত্যসাধনা ও শিক্ষাব্রত উভয় ক্ষেত্রেই এই নারীমুক্তির স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষাই মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। অর্থাৎ, আমরা যা বলতে চাইছি, শিক্ষা রোকেয়ার কাছে লক্ষ্য মাত্র ছিল না। লক্ষ্য ছিল নারী বা বৃহত্তর অর্থে মানবমুক্তি। শিক্ষা বিস্তারকে তিনি দেখেছেন সে লক্ষ্য অর্জনের অত্যাবশ্যকীয় উপায়, অবিকল্প পথ হিসেবে। নারীকে শিক্ষাবঞ্চিত করে পুরুষতন্ত্র যে আসলে তাকে স্বাধীনতা ও সমানাধিকার থেকেই বঞ্চিত করতে চায় সে সম্পর্কে রোকেয়ার স্পষ্ট ধারণা প্রকাশ পায় যখন তিনি লেখেন :

> শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি। অদূরদর্শী পুরুষেরা ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য এতদিন আমাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতেন।[৪৪]
>
> ('বোরকা', *মতিচূর*, ১ম খণ্ড)

নারীকে শিক্ষার অধিকারবঞ্চিত করার পেছনে পুরুষতন্ত্রের এই স্বার্থবোধ বা ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় যে বাঙালি নারী সমাজে রোকেয়ার আগে আর

---

৪২. আবদুল কাদির (সম্পা.), *রো.র.*, পৃ. ৩০১-২।
৪৩. মোশ্‌ফেকা মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।
৪৪. আবদুল কাদির (সম্পা.), *রো.র.*, পৃ. ৬১।

www.pathagar.com

কেউ দেননি তা নয়, দিয়েছেন, যেমন রোকেয়ার জন্মের প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে কৈলাসবাসিনী দেবী (জ. আনু. ১৮৩৭) তাঁর *হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি* গ্রন্থে (১৮৬৫) লিখেছিলেন :

> কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, সকল জাতীয় সাস্ত্রেই [য.প্রা.] কথিত আছে যে পত্নী পতির অর্দ্ধ অঙ্গস্বরূপ এবং সুখদুঃখের সমভাগী, কিন্তু ভারতবর্ষীয়েরা সেই শাস্ত্রোক্ত বাক্যের অর্দ্ধেক প্রতিপালন ও অপরার্দ্ধের পরিত্যাগ করিতেন অর্থাৎ দুঃখের অংশটি বিলক্ষণ রূপে প্রদান করিতেন কিন্তু সুখের অংশটী দিতে অতিশয় কাতর হইতেন, নচেৎ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিবেন কেন? তাঁহারা বনিতাগণকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্বে রাখিবার অভিপ্রায়েই তাহাদিগকে বিদ্যারসের সুধাময় মাধুর্য্য আস্বাদন করাইতে ইচ্ছা করিতেন না অথবা পাছে তাহারা বিদ্যাবলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া পুরুষগণকে অগ্রাহ্য করে কিম্বা গৃহকার্য্যে উপেক্ষা করতঃ কেবল শাস্ত্রালাপেই রত থাকে ও অন্তঃপুর বহির্গতা হইতে ইচ্ছা করে অথবা পত্রদ্বারা আমন্ত্রণ করত অন্য পুরুষকে বরণ করিতে অভিলাষিনী হয়, এই প্রকার বিবিধ আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া তাহারা স্ত্রীগণকে নিতান্ত নির্ব্বোধ ও বিদ্দ্যাভ্যাসে অশক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। তাঁহারা কহিতেন যে অবলাগণকে ঈশ্বর স্বভাবতই নির্ব্বোধ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, আর উহাদিগের বিদ্দ্যাভ্যাসের প্রয়োজনই বা কি আছে, কারণ উহাদিগের ত অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবেক না, উহারা গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে, গৃহকর্ম্মে বিদ্যার কি আবশ্যক ...।[৪৫]

কৈলাসবাসিনীর বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত বিয়ের পর, স্বামীগৃহে, পুস্তক ব্যবসায়ী স্বামীর আগ্রহাতিশয্যে। পূর্বসূরি বামাসুন্দরী দেবীর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে 'হাঁড়ি-বেড়ি ধরা হাতে লেখনি ধারণ'[৪৬] করলেও, এবং বামাসুন্দরীর মতোই কিংবা তাঁর চেয়েও জোর দিয়ে নারীশিক্ষার অপরিহার্যতার কথা বললেও, কৈলাসবাসিনী কিন্তু মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ তাঁর মনে হয়েছে, এ ধরনের বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের ফলে বালিকারা "বিদ্যার পরিবর্ত্তে প্রগলভতায় সুনিপুণ হইয়া উঠে, তাহারা প্রথমত হিন্দুদিগের রীতিনীত্যাদির প্রতি অতিশয় বিরক্তি প্রকাশ ও পুরুষদিগের ন্যায় উন্নত ভাব* ধারণ করে।"[৪৭] মত প্রকাশ করেছেন, "যে কাল পর্য্যন্ত বালিকাগণের পাঠোপযোগী হিন্দু অন্তঃপুর তুল্য বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাবৎকাল আর

---

৪৫. স্বপন বসু (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩।

৪৬. উদ্ধৃত : স্বপন বসু (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

* ছাপার ভুল যদি না হয়ে থাকে, 'উন্নত' শব্দটিকে কৈলাসবাসিনী এখানে 'উদ্ধত'-এর সমার্থে ব্যবহার করেছেন।

৪৭. স্বপন বসু (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।

www.pathagar.com

তাহাদিগকে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা কখনই বিধেয় নহে।"[৪৮] নারীশিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী পুরুষদের বরং তিনি 'অবলাদের একবারে শৃঙ্খলমুক্ত করার অশুভ ফল' সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।[৪৯] মেয়েদের জন্য 'শুদ্ধ জ্ঞানগর্ভ ভূগোল ইতিহাস সাহিত্যাদি' পাঠেরও তিনি কোনো সার্থকতা খুঁজে পাননি।[৫০] মোটকথা নারীশিক্ষার সার্থকতা শেষ পর্যন্ত তিনিও খুঁজে পেয়েছেন তাদের ভালো বা উপযুক্ত গৃহিণী হওয়ার মধ্যে। নারীর জন্ম যে 'জ্ঞানবুদ্ধিহীনা হয়ে' শুধু 'দাসত্ব করার জন্য নয়', কিংবা 'পুরুষের ক্রীড়ার নিমিত্ত তারা গঠিত হয়নি', তার জীবনের যে অন্য সার্থকতা বা তাৎপর্য আছে (নারী "নিজের নিমিত্তও বাঁচিয়া থাকে"), কৃষ্ণভাবিনী দাস (১৮৬৪-১৯১৯) তাঁর একটি ক্ষুদ্র রচনায় ('শিক্ষিতা নারীর প্রতিবাদের উত্তর', *সাহিত্য*, মাঘ ১২৯৮) সেকথা বললেও, তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলায়* (১৮৮৫) তিনিও কিন্তু নারীর প্রধান কর্মক্ষেত্র হিসেবে গৃহকে এবং প্রধান কর্তব্য হিসেবে গৃহকর্মকে নির্দেশ করেছেন।[৫১] কৃষ্ণভাবিনীর মতো রোকেয়াও নারীর গৃহ-কর্তব্যকে, স্ত্রী ও মাতা হিসেবে তাঁর ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেও, তিনি বলেছেন, সুগৃহিণী হওয়ার জন্যই নারীর উচ্চশিক্ষা প্রয়োজন।[৫২] ('সুগৃহিণী') আর উচ্চশিক্ষা বলতে তিনি বুঝেছেন পুরুষ যা পেতে পারে, পায়, এমন সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ। লিখেছেন, "আমাদিগকে সকলপ্রকার জ্ঞানচর্চা করিতে হইবে।"[৫৩] ('বোরকা') নারীর দাসত্বমুক্তির উপায় বা তার ওপর পুরুষতন্ত্রের অত্যাচার নিবারণের 'মহৌষধ' বলেছেন তিনি একে।[৫৪] ('সুবেহ সাদেক') যদিও উচ্চশিক্ষা অর্থে তিনি কখনো কখনো 'উপযুক্ত শিক্ষা', 'প্রকৃত শিক্ষা', 'সুশিক্ষা' ইত্যাদি কথা ব্যবহার করেছেন, তবে নারীর জন্য উপযুক্ত/প্রকৃত শিক্ষা বলতে তিনি সেই শিক্ষাকেই বুঝিয়েছেন যা তাদের 'আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ গৃহিণী ও আদর্শ মাতা' রূপে গঠনের পাশাপাশি 'নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম',[৫৫] পুরুষের সমকক্ষ হতে সাহায্য করবে। লেখক জীবনের গোড়ায় লেখা তাঁর সুবিখ্যাত প্রবন্ধ 'স্ত্রীজাতির অবনতি'তে রোকেয়ার দ্ব্যর্থহীন উচ্চারণ : "পুরুষের সাথে সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয় তাহাই

---

৪৮. ঐ, পৃ. ১৪৪।
৪৯. ঐ, পৃ. ১৪৪।
৫০. ঐ, পৃ. ১৪৪।
৫১. গোলাম মুরশিদ, 'বঙ্গদেশে নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ : কৃষ্ণভাবিনী দাস', *জিজ্ঞাসা*, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯।
৫২. আবদুল কাদির (সম্পা.), *রো.র.*, পৃ. ৪৬।
৫৩. ঐ, পৃ. ৬১।
৫৪. ঐ, ২৯৯।
৫৫. আবদুল কাদির (সম্পা.), *রো.র.*, পৃ. ২৯৯।

www.pathagar.com

করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব।"[৫৬] আর মৃত্যুর বছর দুই আগে 'সুবেহ সাদেক' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "শিক্ষা অর্থে আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই বলি; গোটা কতক পুস্তক পাঠ করিতে বা দু'ছত্র কবিতা লিখিতে পারা শিক্ষা নয়। ... শিক্ষা মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ হওয়া চাই। তাহাদের [নারীদের— মো.শ.হা.] জানা উচিত যে, তাহারা ইহজগতে কেবল সুদৃশ্য শাড়ী, ক্লিপ ও বহুমূল্য রত্নালঙ্কার পরিয়া পুতুল সাজিবার জন্য আইসে নাই ; ... তাহাদের জীবন শুধু পতি-দেবতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উৎসর্গ হইবার বস্তু নহে! তাহারা যেন অন্নবস্ত্রের জন্য কাহারও গলগ্রহ না হয়।"[৫৭] যদিও অন্যান্য কিছু প্রশ্নে রোকেয়ার চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অসঙ্গতি বা স্ববিরোধের নমুনা খুঁজে পেতে কষ্ট হবে না; তবু দুই সময়ের এ দুটি উদ্ধৃতি থেকে অন্তত নারীর অধিকার এবং সে অধিকার অর্জনের উপায়, বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে তাঁর ধারণা নিয়ে কারো কোনো অস্পষ্টতা বা সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

নারীদের জন্য প্রকৃত বা উপযুক্ত শিক্ষা বলতে রোকেয়া এমন শিক্ষার কথাই বুঝিয়েছেন যা তাদেরকে আপন অধিকার সম্পর্কে সচেতন করবে, তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলবে, স্বাবলম্বন ও স্বাধীনতার প্রেরণা সঞ্চার করবে। যে-বিদ্যার বলে নারী আর কেবল নিজেকে পুরুষের উপর নির্ভরশীল বা তার অধস্তন অর্ধাঙ্গ হিসেবে নয়, বরং সমাজের একজন স্বাধীন ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে ভাবতে শিখবে, তেমন বিদ্যায় নারীদের সুশিক্ষিত বা সশস্ত্র করে তুলতে চেয়েছেন তিনি। কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভেও এই শিক্ষার সার্থকতা নয়। *পদ্মরাগ* উপন্যাসে তারিণী-ভবনের শিক্ষাব্যবস্থার যে-বিবরণ রোকেয়া দিয়েছেন তাতে তাঁর শিক্ষাচিন্তার একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিফলন ঘটেছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি :

> ...ছাত্রীদিগকে দুই পাতা পড়িতে শিখাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে ঢালিয়া বিলাসিতার পুত্তলিকা গঠিত করা হয় না। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, খগোল, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র—সবই শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু শিক্ষার প্রণালী ভিন্ন। মিথ্যা ইতিহাস কণ্ঠস্থ করাইয়া তাহাদিগকে নিজের দেশ এবং দেশবাসীকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না। নীতিশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, চরিত্র-গঠন প্রভৃতি বিষয়ে অধিক মনোযোগ দান করা হয়। বালিকাদিগকে অতি উচ্চ আদর্শের সুকন্যা, সুগৃহিণী ও সুমাতা হইতে এবং দেশ ও ধর্মকে প্রাণের অধিক

---

৫৬. ঐ, পৃ. ২৯।
৫৭. ঐ, পৃ. ২৯৯।

www.pathagar.com

ভালবাসিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষতঃ তাহারা আত্ম-নির্ভরশীলা হয় এবং ভবিষ্যৎ-জীবনে যেন কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ পিতা, ভ্রাতা বা স্বামী-পুত্রের গলগ্রহ না হয়, এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হয়।[৫৮]

(চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

সুলতানাজ ড্রিম বা 'সুলতানার স্বপ্ন'-এ রোকেয়া যে নারীস্থানের কল্পনা করেছেন সেখানে দেখা যায় জীবনের সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জয়-জয়কার। উন্নত সমাজ বলতে রোকেয়া বোঝেন বিজ্ঞানবিশ্বাসী সমাজকে। নারীস্থানের সকল সাফল্যের মূলে রয়েছে এই সত্যটি যে সেখানকার নারীরা বিজ্ঞান শিক্ষিত, প্রযুক্তি প্রশিক্ষিত।

নারীশিক্ষার ব্যাপারটিকে রোকেয়া নারীর আর পাঁচটি সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি ও তার প্রয়োগের প্রশ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। এ প্রসঙ্গে ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় নারীশিক্ষা সম্মেলনের একটি অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি যা বলেছিলেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : "যে পর্যন্ত পুরুষগণ শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য অধিকার দিতে স্বীকৃত না হয়, সে পর্যন্ত তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষাও দিবে না।"[৫৯] ওই একই ভাষণে তিনি আক্ষেপ ব্যক্ত করেন : "এখন স্ত্রীলোকেরা ভোট দানের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু মুসলিম মহিলাগণ এ অধিকারের সদ্ব্যবহারে স্বেচ্ছায় বঞ্চিতা রহিয়াছেন। গত ইলেক্‌শনের সময় দেখা গেল কলিকাতায় মাত্র ৪ জন স্ত্রীলোক ভোট দিয়াছে।"[৬০]

মাতৃভাষাই যে শিক্ষার আদর্শ মাধ্যম, আর প্রকৃত জীবন-উদ্বোধক শিক্ষা যে কেবল তার মাধ্যমেই সম্ভব, সে সম্পর্কে রোকেয়ার নিজের অন্তত কোনো সংশয় বা দ্বিধা ছিল না। তারপরও বাঙলার রাজধানীতে অবস্থিত তাঁর বিদ্যালয়টির শিক্ষার মাধ্যম ছিল প্রথমে উর্দু এবং পরে উর্দু ও ইংরেজি। নিঃসন্দেহে রোকেয়ার শিক্ষা-প্রয়াসের এ এক বড় সীমাবদ্ধতার দিক। রোকেয়া নিজেও এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কলকাতা তথা বাঙলার যেসব অভিজাত মুসলমান পরিবারের মেয়েরা তাঁর বিদ্যালয়ে পড়তে আসত, রোকেয়ার ভাষায় তাঁরা ছিলেন 'মাতৃহীন', 'অর্থাৎ তাদের মাতৃভাষা নেই',[৬১] তাদের পারিবারিক ভাষা ছিল উর্দু। অভিভাবকরা অনেকে রোকেয়াকে চিঠি লিখে অনুরোধ করতেন তাঁদের মেয়েদের যেন 'সামান্য

---

৫৮. ঐ, পৃ. ৩২৯।
৫৯. আবদুল কাদির (সম্পা.), *রো.র.*, পৃ. ২৮০।
৬০. ঐ, পৃ. ২৮০।
৬১. ঐ, ২৮২।

www.pathagar.com

উর্দু ও কোরআন শরিফ পাঠ ছাড়া আর কিছু' শেখানো না হয়।[৬২] বিদ্যালয়ের একটি বাংলা শাখা খোলার (১৯১৭) পরও, প্রয়োজনীয় ছাত্রীর অভাবে, রোকেয়া তা চালু রাখতে পারেননি। তবে, বাংলামাধ্যম না হলেও, পরবর্তীকালে কি সাহিত্যচর্চা কি শিক্ষাবিস্তার কি অন্য কোনোভাবে যাঁরা বাঙালি মুসলমান সমাজের নারী জাগরণে অগ্রণী বা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন, তাঁদের অনেকেই আগেপরে রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী বা শিক্ষিকা ছিলেন। সেদিক থেকে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের সঙ্গে পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক বাঙলার অন্য কোনো মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়েরই তুলনা চলে না। একমাত্র তুলনীয় হতে পারে বাঙালি হিন্দুর নারী প্রগতিতে বেথুন স্কুলের ভূমিকা। যদিও ইতিহাসের এ হয়তো এক প্রহেলিকাই যে, রানী ভবানীর (১৭১৫-১৮০২) মতো দু-একজনের আর্থিক সহায়তা বা পৃষ্ঠপোষকতার কথা বাদ দিলে, সূচনাপর্বে বাঙালি হিন্দুর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার আন্দোলনে কোনো নারীকে অন্তত সক্রিয় উদ্যোগী বা নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় দেখা যায় না। বাঙালি মুসলমান সমাজের বেলায় রোকেয়া যে দায়িত্বটি নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

২০০৮ *হীনম্মন্যতার বিপক্ষে (২০১১)*

www.pathagar.com

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা : অব্যবস্থার চালচিত্র

'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড' অতি-পুরাতন এই কথাটিকে আমরা যদি সত্যি বলে মানি তবে আমাদের বর্তমান দুরবস্থার কারণ উপলব্ধিতে কারোই বোধহয় অসুবিধা হবার কথা নয়। এমনিতে একটি দেশ বা জাতির গন্তব্য বা অভিমুখ নির্ধারণে তার শিক্ষাব্যবস্থাই মূল ভূমিকা পালন করে। সেদিক থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় আমরা একটি দিকদিশাহীন যাত্রায় রয়েছি। জাতিগঠন প্রচেষ্টায় সহায়তা করার পরিবর্তে আমাদের চালু শিক্ষাব্যবস্থা বরং তাকে বাধাগ্রস্তই করছে। সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই আমাদের শিক্ষাবিদ, লেখক, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদরা মাতৃভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে অভিন্নধারার শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে তাঁদের মত ব্যক্ত করে আসছেন। পুরো পাকিস্তান পর্বে শুধু যে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রাদর্শে বিশ্বাসীরাই এই মতের সমর্থনে বক্তব্য রেখেছেন তা নয়, এমনকি মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, ইব্রাহীম খাঁ, হাসান জামানের মতো পাকিস্তানবাদী বুদ্ধিজীবীরাও ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা রেখে অন্তত একটা স্তর পর্যন্ত একই ধারার শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে প্রচলিত মাদ্রাসাশিক্ষাকে যুগোপযোগী নয় বলে উল্লেখ করে এর ব্যাপক সংস্কার ও আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁরাও কমবেশি জোর দিয়েই বলেছেন। সেই সঙ্গে আর একটি দাবিও সকল মতের শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবীরা করেছেন, তা হল, শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া, আর এক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ অবসান। অন্যদিকে ১৯৬২ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত এদেশে সরকারি উদ্যোগে প্রণীত শিক্ষানীতিসমূহের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বারবার যে দাবিটি উঠে এসেছে তা হল একটি গণমুখী অসাম্প্রদায়িক বৈজ্ঞানিক বৈষম্যমুক্ত ও অভিন্নধারার শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন। ফলে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত দেশে স্বভাবতই আশা করা গিয়েছিল আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনায় এই দাবিটি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। আমাদের সংবিধানেও 'আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত' অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের পাশাপাশি, কিংবা বলা যায়

www.pathagar.com

তার চেয়েও অধিক গুরুত্ব দিয়ে, 'একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা'র প্রতি রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছে (১৭ নং ধারা)। কিন্তু সেই প্রথম থেকে কোনো সরকারই কি সত্যিকার অর্থে সাংবিধানিক এই অঙ্গীকারটি বাস্তবায়নে উদ্যোগী, সচেষ্ট হয়েছেন? এ ব্যাপারে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন?

স্বাধীনতার আগে এদেশে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা বলতে ছিল কিছু কিন্ডারগার্টেন ও কয়েকটি মাত্র ক্যাডেট কলেজ । মাদ্রাসার সংখ্যাও এত বেশি ছিল না। ফলে দৃঢ় অঙ্গীকারের সঙ্গে সুচিন্তিত প্রক্রিয়ার সমন্বয় ঘটলে সেদিন এই সাংবিধানিক অঙ্গীকারটি পালন করতে সরকারকে হয়তো খুব বেশি বেগ পেতে হত না। বস্তুত যে-মানসিক দোলাচল ও সুবিধাবাদী মনোভঙ্গি থেকে তাঁরা সেদিন ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা ও ক্যাডেট কলেজসমূহ বিলোপ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি, সেই অবস্থান থেকে মাদ্রাসাশিক্ষা তুলে দেওয়ার ব্যাপারেও কোনো স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এটা কি সত্যি নয় যে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই যখন এদেশে ক্যাডেট কলেজ পদ্ধতির শিক্ষা রদের কথা ওঠে, তখন সরকারের ভেতর থেকেই প্রথম এর বিরোধিতা করা হয়? মন্ত্রিসভার সদস্যদেরই কেউ এর বিরোধিতা করে প্রকাশ্যে বক্তব্য রেখেছিলেন? স্বাধীন দেশের প্রথম (কুদরাত-ই-খুদা) শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে (১৯৭৪) 'সমগ্র দেশে সরকারি ব্যয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত একই মৌলিক পাঠ্যসূচি ভিত্তিক এক এবং অভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন' এবং 'বর্তমানের সব মৌলিক পার্থক্য দূরীভূত করে' ১৯৮০ সালের মধ্যে তা বাস্তবায়নের কথা বলা হলেও (৭.৯ অনুচ্ছেদ), এমনকি উক্ত রিপোর্টেও সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা ও ক্যাডেট কলেজ পদ্ধতির শিক্ষা বজায় রাখার সুপারিশ করা হয়।

আমাদের শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা সভা-সেমিনার-সমাবেশে যাঁরা দিনের পর দিন মাতৃভাষা বা জাতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার অপরিহার্যতা সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন, বলেছেন যে জাতির মানস বিকাশ একমাত্র নিজস্ব ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব, এমনকি উচ্চশিক্ষার স্তরে বা বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও যাঁরা মাতৃভাষাকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলেছেন, আর তা যে সম্ভব তার পক্ষে বারবার জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও সত্যেন বোসের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদির উদাহরণ দিয়েছেন, তাঁরাও কি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে ছেলেমেয়ে বা নাতি-নাতনিদের শিক্ষার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাই চালিত হননি? কিংবা সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়-দায়িত্বটা স্ত্রী বা ছেলে-বউদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নির্বিকার সন্ত সাজার আপসী বা সুবিধাবাদী পথ গ্রহণ করেননি? 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাও' বা ইংরেজিতে বললে 'চ্যারিটি বিগিনস এ্যাট হোম' কথাটা ভুলে তাঁরা স্বজনদের জন্য এক ব্যবস্থা করেছেন ও

www.pathagar.com

বাকি দেশবাসীর জন্য ভিন্ন ব্যবস্থার কথা বলেছেন (সে কি এই ভাবনা থেকে যে উচ্চশিক্ষা সাধারণ পরিবারের সন্তানদের জন্য নয়?)। হতে পারে তাঁরা মুখে যা বলেছেন তা অন্তত পুরোপুরি বিশ্বাস করেননি, অথবা উচ্চতর শিক্ষা বা জ্ঞানচর্চার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার উপযোগিতা নিয়ে বরাবর তাঁদের মধ্যে একটা দ্বিধা-সংশয় ছিলই। মাতৃভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার কথা বললেও, স্বাধীন দেশে আমাদের কজন শিক্ষাবিদ-পণ্ডিত-বৈজ্ঞানিক বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা ও অনুবাদে উদ্যোগী হয়েছেন? কেন হননি? পাকিস্তান আমলেও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার যে প্রচেষ্টাটুকু ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলাম না কেন? কেন সে আমলে কাজী মোতাহার হোসেন, কুদরাত-ই-খুদা, আবদুল জাব্বার, শাহ ফজলুর রহমান, আবদুল্লাহ আল-মুতীরা যে-রকম বা যতটা কাজ করেছিলেন, পরবর্তীকালে সে ধারাবাহিকতা আমরা রক্ষা করতে পারলাম না? সে কি এজন্য যে মাতৃ বা জাতীয় ভাষায় জ্ঞানচর্চার জন্য বিদেশী বৃত্তি বা অনুদান পাওয়া যায় না, আর আমাদের বিদ্যাচর্চার পেছনেও মূল তাগিদটা আসলে বিদেশী চাকরি লাভের? আমাদের নীতিনির্ধারক ও চিন্তাবিদ-বুদ্ধিজীবীরাও তাঁদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে সেই ভবিষ্যত-ভাবনা বা 'দূরদর্শিতা'র দ্বারাই চালিত হয়েছেন। 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' বা 'বিশ্বায়নে'র দোহাই এক্ষেত্রে খাটে না। কারণ এসব স্লোগানের সঙ্গে পরিচয়ের অনেক আগেই আমরা উক্ত জাহাজে সওয়ার হয়েছি। এমনকি পাকিস্তান আমলেও যেখানে স্কুল-কলেজসহ পাবলিক ও সরকারি চাকরির পরীক্ষা বাংলা বিষয় দিয়ে আরম্ভ হত, সেখানে আজ তা শুরু করা হয় ইংরেজি দিয়ে। একটি স্বাধীন জাতির পক্ষে জাতীয় হীনম্মন্যতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে? তবে এ-ও কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। বাংলা যে-দেশটির রাষ্ট্রভাষা, তার জনপ্রশাসনের ভাষা কি ইংরেজি? প্রশাসকদের ইংরেজি জানতে হবে, ভালো কথা। কিন্তু তার জন্য তাঁদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী বা সমাপনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীর ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দেওয়াও কি জরুরি? কারা এসব সিদ্ধান্ত নেন? বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের সব যুক্তি ও চেষ্টা ব্যর্থ করে, আমাদের আইন-আদালতের ভাষা আজও ইংরেজিই রয়ে গেছে। দীর্ঘ-আকাঙ্ক্ষিত বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের সূচনা দিবসেই বিচার বিভাগ তাদের স্বাধীনতার প্রমাণ দেয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চলিখন ও ভাষণে (একমাত্র প্রধান উপদেষ্টার ভাষণটি ছাড়া) রাষ্ট্রভাষাকে বর্জন করে। এসব কি সংবিধানের স্পষ্ট বরখেলাপ নয়?

প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসের কয়েকদিন (মাঝখানে ভ্যালেন্টাইন ডে-র একদিনসহ) বইমেলায় বেড়াতে যাওয়া, হয়তো কিছু বাংলা বই কেনা, পয়লা বৈশাখ সকালে পাঞ্জাবি ও শাড়ি পরে রমনা বটমূলে হাজিরা, ইলিশ-পান্তা বা

www.pathagar.com

খই-মুড়ি খাওয়া—আমাদের বাঙালিত্ব আজ এর মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে বললে কি খুব ভুল বা অন্যায় হবে? পরাধীন আমলেও যেখানে সরকারি-বেসরকারি স্কুল-কলেজগুলোতে প্রতিবছর রবীন্দ্র-নজরুলজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হত, সেখানে আজ স্বাধীন বাংলাদেশে তা হয় না কেন? কটি স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ বার্ষিক সাহিত্য-সংস্কৃতি সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়, বার্ষিকী প্রকাশিত হয়? কেন হয় না? যদিও ভর্তির সময় অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এ বাবদে চাঁদা ঠিকই নেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই তহবিলটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, গুটিকয় শিক্ষক ও অফিস কর্মচারী এবং ছাত্র সংসদ বা ছাত্রনেতাদের মাঝে ভাগবাটোয়ারা হয়ে যায়। এ তথ্যটা আমাদের শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্রসমাজ তথা সচেতন নাগরিক কারো কি অজানা? কিন্তু জেনেও কেন তাঁরা প্রতিবাদে সোচ্চার হন না? সরকার বা প্রশাসনের কাছে এর প্রতিকার দাবি করেন না? সরকারেরও কি তাঁদের দিক থেকে এ ব্যাপারে কোনো করণীয় নেই?

২

দেশে প্রাথমিক স্তরে শিশুভর্তির হার সাম্প্রতিককালে বেড়েছে। সরকারি দাবি অনুযায়ী ঝরে পড়ার হারও কিছু কমেছে। কিন্তু এ হল নিতান্ত সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব। বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন এতে সত্যিসত্যি কতটা ঘটেছে তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ বরাবরের মতো রয়েই গেছে। একদিকে শিশুজরিপে ফাঁকি বা পরিকল্পিত কারচুপি এবং অন্যদিকে একই শিক্ষার্থীকে সরকারি বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও এনজিও শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি দেখিয়ে ছাত্রভর্তির হার বৃদ্ধি তথা প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির চিত্র নির্মাণের এই প্রবণতা হয়তো দাতা সংস্থাগুলোর চোখে ধুলো দিয়ে সাহায্যের প্রবাহ অব্যাহত রাখার তাগিদ থেকেই। তারপরও, সংখ্যাগত অগ্রগতির এই কর্তৃপক্ষীয় দাবিকে যদি মোটামুটি সত্যের নিকটবর্তী বলে মেনেও নিই, কি প্রাথমিক স্তরে কি মাধ্যমিক বা উচ্চস্তরে শিক্ষার মানের অধোগতি আজ সকল মহলেই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কারা বা কোন পরিস্থিতি এর জন্য দায়ী? শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শিক্ষা-প্রশাসন—কারা? শিক্ষক ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়িত্বহীনতা বা গাফিলতি, শিক্ষার্থীদের অমনোযোগ, শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি বা তার ধরন, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি—কোন বিষয়টিকে আমরা এর জন্য দায়ী করব? আলাদাভাবে এর কোনো একটি কি দায়ী? নাকি সবগুলো কারণই অল্পাধিক কাজ করছে? সরকার, দাতা সংস্থা, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও এনজিওদের তরফ থেকে নানা সভা-সেমিনার-কর্মশালায় শিক্ষার মানের এই অধোগতির কারণ অনুসন্ধানের প্রয়াস চলছে। কিন্তু কেউই মনে হয় সমস্যার মূলে পৌঁছাতে পারছেন না চাচ্ছেন না। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের দায়বদ্ধতার কথা যখন

www.pathagar.com

বলা হয় তখনও বোঝা যায় না সে দায়বদ্ধতাটা আসলে কার কাছে? মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা বা আমলাতন্ত্রের কাছে নাকি সমাজ বা দেশের কাছে? শিক্ষা কমিশনের সুপারিশে, সেমিনারে-আলোচনা সভায়, দাতাদের পরামর্শে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি ও স্থানীয় সরকারের ভূমিকার ওপর যত গুরুত্বই দেওয়া হোক না কেন, কার্যক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কেন্দ্রীভবন ও আমলাতন্ত্রের খবরদারি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেড়েছে বৈ কমেনি।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি বর্তমানে একটি ওপেন সিক্রেট। দেশের তৃণমূল পর্যায়েও এটি একটি সুপরিজ্ঞাত বিষয়। সম্ভবত ১৯৯০ সালে একবার (যেবার মৌখিক পরীক্ষা বাদ দেওয়া হয়েছিল) ছাড়া এ পর্যন্ত প্রতিবারই শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপকহারে টাকাপয়সার লেনদেন হয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রে যা-ও বা কঠোরতা বা গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়, স্থানীয় পর্যায়ে মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলে গিয়ে তার গুরুত্ব থাকে না। সেখানে নম্বরের কমবেশি করে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করা হয়। জেলা প্রশাসন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশে এই কারসাজি হয়ে থাকে। উপরন্তু রয়েছে রাজনৈতিক চাপ ও দলবাজি। সম্প্রতি দুর্নীতি ও দলীয়করণের অভিযোগে সরকার বিসিএস ও উপজেলা নির্বাচনী অফিসার নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল বাতিল করে পুনঃপরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার মতো একেবারে ভিত্তিস্তরে দেশের ভবিষ্যত নাগরিক গড়ে তোলার ভার যাঁদের ওপর সেই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি নিয়ে আমাদের যেন মাথাব্যথা নেই। না থাকার কারণটাও সহজে অনুমেয় : আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, আমলা, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক কারো সন্তানরা সাধারণত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে না।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের ফলে তাঁদের আর্থিক নিশ্চয়তার একটা ব্যবস্থা হয়েছে ঠিকই, আর সেটা নিশ্চয় খুব গুরুত্বপূর্ণ, তবে এভাবে সরকারি চাকুরে বানিয়ে তাঁদের শিক্ষক সত্তার ক্ষতিও কি করা হয়নি? তৃতীয় শ্রেণির সরকারি কর্মচারী হিসেবে তাঁদের মর্যাদা সরকারি অফিসের কেরানির সমপর্যায়ের। যদিও কার্যক্ষেত্রে থানা শিক্ষা অফিসের একজন পিয়নের যে গুরুত্ব তা-ও তাঁদের নেই। সরকারি চাকরির অনেক সুযোগসুবিধাও তাঁরা পান না। অন্যদিকে আবার সরকারি কর্মচারী হওয়ার কারণে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে নিজস্ব সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, আদর্শবোধ ইত্যাদি প্রয়োগের সুযোগ তাঁদের কম, বা একেবারে নেই বললেও চলে। সেখানে সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় সরকারি নিয়ম-বিধি-প্রজ্ঞাপন, এবং সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের তম্বি-তদারকি, খবরদারি, এমনকি খেয়ালখুশি দ্বারা। আমরা যখন আমাদের শৈশব

www.pathagar.com

ও কৈশোরের অভিজ্ঞতার নিরিখে তখনকার শিক্ষকদের আদর্শ, নিষ্ঠা ইত্যাদির সঙ্গে তুলনায় আজকের শিক্ষকদের মধ্যে তার অনুপস্থিতি নিয়ে আক্ষেপ করি, তখন এই বিষয়টি হয়তো আমাদের মনোযোগে থাকে না। উপরন্তু শিশু জরিপ ছাড়াও, তৃণমূল পর্যায়ের সরকারি কর্মচারী হিসেবে ভোটার তালিকা তৈরি, স্বাস্থ্যশিক্ষা, স্যানিটেশন প্রোগ্রামসহ এত সব কার্যক্রমে প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োজিত রাখা হয় যে শিক্ষকতার কাজটিই তাঁরা কম করতে পারেন। একে তো শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত আমাদের দেশে মোটেও আদর্শ পাঠদানের সহায়ক নয়, তারপর আবার বরাদ্দ পদের হিসাবেও রয়েছে শিক্ষক-স্বল্পতা (অনেক বিদ্যালয়ে দুজন এমনকি একজন শিক্ষক দিয়েও পাঁচটি ক্লাস ম্যানেজের খবর প্রায়ই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়)। শিক্ষকদের মধ্যে একজনকে আবার নিয়মিত কাগজপত্র নিয়ে শিক্ষা অফিসে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। তাছাড়া বছর জুড়ে, স্কুলে ও স্কুলের বাইরে, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় নানা প্রশিক্ষণ তো আছেই। দাতা সংস্থা ও বিদেশী পরামর্শক, সরকারি আমলা ও তথাকথিত কিছু শিক্ষা বিশেষজ্ঞের পরামর্শে ও উদ্যোগে উদ্ভাবিত এসব প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি শিক্ষক, শিক্ষার্থী তথা সামগ্রিক অর্থে প্রাথমিক শিক্ষা কার কতটা উপকারে আসে তা বলা বাহুল্য এক পৃথক গবেষণার বিষয় হতে পারে। বস্তুত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই-মূল্যায়ন ও উন্নততর পদ্ধতি প্রয়োগের নামে এবং নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণের স্বার্থে (যেহেতু সর্বাধিক বিদেশী অনুদান আকর্ষণকারী একটি খাত এটি) পুরো প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে যেন স্থায়ীভাবে গিনিপিগ করে রাখা হয়েছে।

দাতা সংস্থার প্রভাবের সূত্র ধরেই শিক্ষাব্যবস্থার ওপর আমলাতন্ত্রের খবরদারি স্বাধীনতা-উত্তরকালে ক্রমে প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে। পৃথিবীর খুব কম দেশেই সম্ভবত যার তুলনা পাওয়া যাবে। শিক্ষাসচিব থেকে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের পরিচালক পদ পর্যন্ত নিয়োগ-বদলি হয় সাধারণত দাতা সংস্থা বা তাদের স্থানীয় প্রতিনিধিদের পছন্দ-অপছন্দের নিরিখে। সাম্প্রতিককালে এমনকি শিক্ষামন্ত্রী পদেও, কোনো শিক্ষাবিদের পরিবর্তে, দাতা সংস্থার আস্থাভাজন আমলা বা সাবেক আমলাদের নিয়োগদানের প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। আর জাতীয় স্বার্থে নীতি প্রণয়ন ও তা কার্যকর করার পরিবর্তে এই পদে বসে তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে যে-কাজটি করেন তা হল দাতা সংস্থার পরামর্শ বাস্তবায়ন ও সে লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থার ওপর পূর্বোল্লিখিত আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা। বশংবদ কিছু লোক ছাড়া দেশের শিক্ষাবিদদের মতামতের কোনো মূল্য বা গুরুত্ব এই মন্ত্রী ও আমলাদের কাছে নেই। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা পদগুলোতে আগে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে প্রেষণে নিয়োগদান করা হত, কিন্তু বর্তমানে সেগুলোও একচেটিয়াভাবে আমলাদের দখলে।

www.pathagar.com

মানসম্মত শিক্ষার স্লোগানটা দেশে কিছুদিন যাবত বেশ জোরেশোরেই উচ্চারিত হচ্ছে। এ স্লোগানকে সামনে রেখে সেমিনার-কর্মশালা অনুষ্ঠান, দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ ও সমীক্ষা সফরের বিরতি নেই। থানা শিক্ষা অফিসার থেকে মন্ত্রণালয়ের সচিব পর্যন্ত সবাই যেন এক্ষেত্রে 'রিসোর্স পার্সন'* (হাতে গোনা ও মুখচেনা কয়েকজন শিক্ষক প্রতিনিধি ঘুরেফিরে এসব কর্মসূচির কোনো কোনোটিতে হয়তো অংশ নেওয়ার সুযোগ পান, কিন্তু দেশের ব্যাপকসংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, অভিভাবকের মতামত বা অংশগ্রহণ ছাড়া এই লক্ষ্য অর্জন কি সম্ভব?)। আসলেই দেশের সকল নাগরিকের জন্য মানসম্মত শিক্ষা কি আমাদের কাম্য? কিংবা 'শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার' একথা কি আমাদের নীতিনির্ধারক ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ সত্যিসত্যিই বিশ্বাস করেন? মানসম্মত শিক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন তা হল উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক ও উন্নত মানের পাঠ্যপুস্তক। এখন দেখা যাক এক্ষেত্রে আমাদের অবস্থাটা কী।

৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি, দলীয়করণ সাম্প্রতিককালে একটি বহু আলোচিত বিষয়। এর ফলে একদিকে যেমন ভালো ফলাফল ও অন্যান্য যোগ্যতা নিয়েও অনেকে বিশ্ববিদ্যলয়ের চাকরি লাভে ব্যর্থ হচ্ছেন কিংবা কেবল তদবির-তোষামোদের জোরে বা দলবাজির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হচ্ছেন, তেমনি আবার অন্যদিকে ফলাফল পরিবর্তন করে অযোগ্যজনকে যোগ্য করে তোলার অভিযোগও শোনা যায়। এ প্রসঙ্গে কোনো একজন অধ্যাপকেরই জবানিতে 'আমরা তো এখন আর টিচার নয়, ভোটার নিই' কথাটা বর্তমানে এক রকম প্রবাদ-প্রতিমতা লাভ করেছে। সিনেট তো বটেই, ডিন, সিন্ডিকেট সদস্য ও উপাচার্যের মতো পদগুলোতেও নিয়োগ হয় ভোটাভুটির মাধ্যমে। এই পরিবেশে বিদ্যানুরাগ, শিক্ষাদানের যোগ্যতা বা গবেষণাপ্রবৃত্তির চেয়ে ভোট সংগ্রহের যোগ্যতা, দলীয় আনুগত্য, তোষামোদ

---

* প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শনের বিষয় যাই হোক, বিদেশে পাঠাবার বেলায় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত না-করে কখনোই কোনো টিম গঠিত হয় না। এভাবে যে কর্মকর্তা মাধ্যমিক শিক্ষার কারিকুলাম-বিষয়ক প্রশিক্ষণ বা প্রাথমিক শিক্ষার সমীক্ষা সফর উপলক্ষে বিদেশ যাচ্ছেন, ফিরে আসার পর তাঁকেই হয়তো অর্থ, পশুসম্পদ বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ে পদায়ন করা হবে, কিংবা কলেজে তিনি তাঁর নিজ বিষয়ের শিক্ষকতায় ফিরে যাবেন। সেক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের বিদেশ দেখা, কিছু বাড়তি রোজগার ও কেনাকাটার সুযোগ দেওয়া ছাড়া এসব সফর আসলে দেশ বা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কোনো উপকারেই আসে না। দাতা দেশ ও সংস্থাগুলোও সে কথা জানে। মনে হয় জেনেশুনেই তারা এই অনুগ্রহ বিতরণ করে মূলত কর্মকর্তাদের তুষ্ট করার জন্য।

www.pathagar.com

দক্ষতার মতো ব্যাপারগুলোই যে অধিক গুরুত্ব পাবে, সে তো বলাই বাহুল্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন রক্ষার নামে শিক্ষকরা হয়তো যা চাইছেন তা হল এই ভোটাভুটির ব্যবস্থাটা টিকিয়ে রাখতে। শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা হয়তো বিষয়টি পছন্দ করেন না (নিশ্চয়ই এমন কেউ কেউ আছেন) তাঁরাও সমষ্টিস্বার্থে এর বিরুদ্ধে কথা বলতে চান না (কারণ, সংসদ সদস্যদের শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির সুবিধা দিয়ে সর্বসম্মতভাবে আইন পাসের মতো, বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট যখন সভা করে নিজেরাই শিক্ষকদের চাকরির বয়ঃসীমা বাড়িয়ে নেয় তখন তার ফলে লাভবান তাঁরাও হন) কিংবা হয়তো শিক্ষক-রাজনীতির কাছে তাঁরা সত্যিই অসহায়। পরাধীনতার কালে কিংবা স্বাধীনতার পরও স্বৈরাচারী আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেখানে মোটামুটি নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন (শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং তাদেরকে ভবিষ্যত নেতৃত্বের উপযুক্ত করে তোলার জন্য যার বিকল্প নেই) হয়েছে, সেখানে লক্ষ করার বিষয়, গত দেড় দশকের গণতান্ত্রিক শাসনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই (এবং অধিকাংশ কলেজে) ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা প্রতিবছর নীল-হলুদ-সাদা রঙের আড়ালে দলীয় ব্যানারে ভোটাভুটির উৎসবে মেতে ওঠেন। এই পরিবেশে, অর্থাৎ ভোটের ফলাফলই যেখানে নির্ধারক, সেখানে একজন শিক্ষক কেমন ক্লাস নেন, ঠিকমতো ক্লাস নেন কি না, ছাত্রছাত্রীদের কাছে তিনি কতটা গ্রহণযোগ্য, প্রিয় বা শ্রদ্ধার পাত্র, তাতে কী এসে যায়? ফলে আমাদের পাবলিক বা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আজ, তাঁদের মূল চাকরি বজায় রেখেই (সেখান থেকে ছুটি নিয়ে বা না-নিয়েও) কনসালটেন্সি, এনজিও পরিচালনা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লেখা, টিভির অনুষ্ঠান উপস্থাপনা বা তাতে অংশগ্রহণ ইত্যাদি সবকিছুই করতে পারেন বা করেন; কেবল মূল কর্মস্থলে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পাঠদান, সময়মতো পরীক্ষার খাতা দেখা, ফলাফল প্রকাশ ছাড়া। দেশে যে আজ ব্যাপকহারে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদেশে বা দেশের ভেতরেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পড়ার আগ্রহ লক্ষ করা যায় তার জন্য কেবল শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের দোষ দেওয়া কি ঠিক হবে? এ ব্যাপারে সন্ত্রাস, সেশনজট, ফল প্রকাশে বিলম্ব ও অনিয়ম প্রভৃতি যেসব কারণ দেখানো হয় তা তো ভিত্তিহীন নয়। তবে উল্টো দিক থেকে একথাও সত্যি যে, আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, উচ্চপদস্থ সরকারি আমলা, শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিক-ব্যবসায়ী তথা সমাজের নীতিনির্ধারক ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সন্তানরা যদি দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াশুনা করত তাহলে অভিভাবক হিসেবে তাঁদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-দায়িত্ববোধই নিশ্চিতভাবে দেশের শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ

www.pathagar.com

উন্নয়নে অবদান রাখত। বিশ্ববিদ্যালয় হল যে-কোনো দেশের জ্ঞান ও মননচর্চার প্রধান বা সর্বোচ্চ পীঠস্থান। অথচ শিক্ষা প্রশাসনে দলীয় রাজনীতির প্রভাবের ফলেই গত বেশ কিছু বছরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এমন দু-একজন উপাচার্যও আমরা পেয়েছি কি না সন্দেহ, নিজস্ব ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য বা বিদ্যাবত্তার জন্য কিংবা শিক্ষাবিদ হিসেবে যাঁদের আন্তর্জাতিক খ্যাতি বা পরিচিতি রয়েছে। একইভাবে প্রশ্ন তোলা যায়, সাম্প্রতিককালে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এমন কটি গবেষণা উপহার দিয়েছে যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি লাভের যোগ্য? সেমিনার-গোলটেবিলে অংশ নিয়ে, পত্রিকায় কলাম লিখে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা, নির্বাচন, দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্য. তেল-গ্যাস উত্তোলন, বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের খবরদারি ইত্যাদি তাবত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন; রাজনৈতিক বিষয়ে এ-পক্ষে কিংবা ও-পক্ষে বক্তব্য-বিবৃতি দেন (এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে তা তাঁরা করতেই পারেন)। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা-সঙ্কট সম্পর্কে ক্বচিৎ তাঁদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বা চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে সমাধানের পথ খুঁজতে—নিজেদের মত প্রকাশ করতে কিংবা অভিভাবক, শিক্ষার্থী, সচেতন নাগরিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করতে শিক্ষক সমিতিগুলো এ-যাবত কটি সেমিনার বা গোলটেবিলের আয়োজন করেছেন?

৪

দেশের কলেজ শিক্ষার দিকে সামান্য দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাব, সরকারি চাকরির অভিন্ন নীতির বদৌলতে সেখানে মানের ব্যাপারটিকেই সর্বাগ্রে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়েই একটিও প্রথম শ্রেণি/ বিভাগ নেই, কিংবা এক বা একাধিক তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ আছে, এম.ফিল বা পিএইচ.ডি ডিগ্রিও নেই, এমনকি দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে কখনোই অনার্স বা মাস্টার্স পর্যায়ে পাঠদান করেননি, নিজেও হয়তো অনার্স পড়েননি, এমন শিক্ষকও খুঁটি বা তদবিরের জোরে, দল বা সমিতি করার সুবাদে কিংবা নগদ নারায়ণের বিনিময়ে ভালো বা নামী কলেজে পোস্টিং পান। ফলে তাঁরা চাকরি করেন ঠিকই, কিন্তু ক্লাসে যেতে উৎসাহ বোধ করেন না, কিংবা গেলেও নোট বা গাইড বই পড়ে এমনকি হাতে নিয়েও ক্লাসে যান (অবিশ্বাস্য হলেও কথাটা সত্যি, যে-কেউ শুধু রাজধানীর কলেজগুলোতে একটু অনুসন্ধান করলেই বিষয়টা জানতে পারবেন)। এই বিদ্যা বা যোগ্যতা সম্বল করেই তাঁরা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মহলবিশেষের সঙ্গে সুসম্পর্কের জোরে, অনার্স-মাস্টার্স পরীক্ষার খাতা দেখেন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেন, মৌখিক পরীক্ষা নেন। পক্ষান্তরে ভালো একাডেমিক কেরিয়ার, উচ্চতর ডিগ্রি, প্রকাশনা এবং শিক্ষক হিসেবে সুনামের অধিকারী হয়েও, ওই খুঁটি বা তদবিরের

www.pathagar.com

অভাবে অনেকে প্রায় সারা জীবন ইন্টারমিডিয়েট বা ডিগ্রি কলেজে পড়ে থাকছেন। এভাবে দেশ ও জাতি তাঁদের মেধার সর্বোচ্চ ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ কর্তৃপক্ষ চাইলেই অনায়াসে চাকরিতে নিয়োগ ও পদোন্নতিকালীন পদায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে পারেন। মানসম্মত শিক্ষার স্বার্থেই সেটা জরুরি।

নারী বলেই কেউ শিক্ষক হিসেবে খারাপ হবেন একথা যেমন ঠিক নয় (যদিও শিক্ষা মনস্তত্ত্ব অনুয়ায়ী শিশু বা প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে নারীদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত) তেমনি আবার নারীরাই সব ভালো শিক্ষক, ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষকতার যোগ্যতা একমাত্র বা প্রধানত তাঁদেরই আছে, একথাও মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু বাংলাদেশের রাজধানী ও তার আশপাশের সরকারি কলেজগুলোর দিকে তাকালে সেটাকেই সত্যি বলে মনে হবে। দেশের নামীদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এক বড় অংশ রাজধানী শহরে অবস্থিত। সারা দেশ থেকে সেরা বা মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনার জন্য রাজধানীর সরকারি কলেজগুলোতে এসে ভর্তি হয়। কিন্তু সেখানে তারা কী ধরনের শিক্ষা পায়, কারা তাঁদের শিক্ষা দান করেন, তাঁদের সে শিক্ষাদানের যোগ্যতা আছে কি না, কিংবা কত ভাগের আছে, আমরা কি কখনো অনুসন্ধান করে দেখেছি? এ ব্যাপারে জরিপ চালালে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা তো আর এমনি এমনি প্রাইভেট কোচিং, নোট-গাইড, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়নির্ভর হয়ে উঠছে না। সরকারি কলেজগুলোর বিদ্যমান পরিস্থিতিও এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। আর বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে শিক্ষকের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার ভূমিকাই মুখ্য। অথচ আমাদের সরকারি কলেজ শিক্ষকদের অনেকেরই ক্লাসরুমে ছাত্রছাত্রীদের দেওয়ার মতো সময় বা যোগ্যতা কোনোটাই নেই। বিশেষ করে রাজধানীর কলেজগুলোতে কর্মরত শিক্ষকদের অনেকের বেলায় কথাটা সত্য। অপ্রিয় হলেও সত্যি, তাঁদের এক বিরাট অংশই আসলে নিজেদের নয়, মামা-চাচা, স্বামী বা দুলাভাইয়ের যোগ্যতায় চাকরি করেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও তাঁদেরকে কিছু বলার আগে কয়েকবার ভাবতে হয়। বিষয়টিকে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে এক করে দেখা নিশ্চয় ঠিক হবে না।

জাতীয়করণের নামে দেশের বেশকিছু ঐতিহ্যবাহী, নামী ও সচ্ছল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। এর সূচনা অবশ্য পাকিস্তান আমলেই (তখন বলা হত 'প্রাদেশিকীকরণ'*)। তবে তখনও যেমন তেমনি পরবর্তীকালেও

---

* ১৯৬৯-এ ছাত্রসমাজের 'এগারো দফা দাবি'র প্রথম দাবিটিই ছিল, 'সচ্ছল কলেজসমূহের প্রাদেশিকীকরণ নীতি পরিত্যাগ' ও ইতিমধ্যে 'প্রাদেশিকীকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা'-সংক্রান্ত।

www.pathagar.com

এই সিদ্ধান্তের পেছনে যতটা না শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্য তার চেয়ে বেশি মনে হয় কাজ করেছে রাজনৈতিক বিবেচনা। এভাবে শিক্ষার জাতীয়করণ ও শিক্ষকদের সরকারি কর্মচারীতে পরিণত করার ফলে শিক্ষকদের নিজস্ব লাভালাভ কতটা কী হয়েছে তা ভেবে দেখবার বিষয়। তবে শিক্ষার মানগত উন্নয়নে তা যে শেষপর্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারেনি, এ-যাবতকালের অভিজ্ঞতার নিরিখে তা এক রকম নির্দ্বিধায় বলা যায়। প্রথমত বেসরকারি কলেজগুলো জাতীয়করণের সময় আত্মীকরণ নীতিমালা অনুসারে পদের অবনয়ন ঘটায় বা সে আশঙ্কার মুখে, কিংবা সরকারি চাকরির প্রতি অনাগ্রহ থেকেও, সর্বত্রই কিছু অভিজ্ঞ ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক চাকরি ছেড়ে দেন, ফলে কলেজগুলো তাঁদের মূল্যবান সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে শিক্ষকদের চাকরি আত্মীকরণের নামে এত সব দুর্নীতি ও অনিয়ম হয়েছে যা কলেজ শিক্ষার বারোটা বাজাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এর ফলে কম যোগ্যতা ও চাকরিগত অভিজ্ঞতার অধিকারী আত্মীকৃত শিক্ষকরা অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি অর্থাৎ পিএসসি-র মাধ্যমে বা প্রতিযোগিতামূলক বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকদের চেয়ে বেতন-ভাতা ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে এগিয়ে আছেন। এই অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিকার আজও হয়নি। বোধহয় তা আর সম্ভবও নয়। বরং সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ও আত্মীকৃত শিক্ষকদের স্বার্থদ্বন্দ্ব ও তাকে কেন্দ্র করে আলাদা আলাদা শিক্ষক সংগঠনের অস্তিত্ব দেশের কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্ম দিয়েছে। বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে যখন যাঁরা ক্ষমতায় থাকেন তাঁরা ও সেই সঙ্গে কিছু কিছু আমলাও শিক্ষকদের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব জিইয়ে রাখার ব্যাপারে উৎসাহদাতার ভূমিকা নেন। এমনিতেই সরকারি চাকরির অন্যান্য ক্যাডার বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মতো সরকারি কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতি তাঁদের পূর্বপদে অবস্থানের মেয়াদ বা যোগ্যতার ভিত্তিতে হয় না। তা নির্ভর করে শূন্যপদ থাকার ওপর। ফলে কোনো বিষয়ের শিক্ষকের বেলায় যেমন অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি পদোন্নতি হয়, তেমনি অন্য কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে এই পদোন্নতির সুযোগ খুবই সীমিত বা একেবারে নেই বললেও চলে। অতীতে ঘটে যাওয়া অনিয়মের জের ধরে কোনো কোনো বিষয়ে এমনকি সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরাও ১৭-১৮ বছর কিংবা তারও বেশি সময় ধরে পদোন্নতি ছাড়া একই পদে পচে মরছেন। সিনিয়রদের বাদ দিয়ে জুনিয়রদের সিলেকশন গ্রেড দেওয়া হচ্ছে। তারপর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, সামরিক শাসনামলে একজন সামরিক কর্মকর্তার সুপারিশকৃত অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক পদকাঠামো অনুসরণ করতে গিয়ে দেশের কলেজ শিক্ষাকে বলতে গেলে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এনাম কমিটির এই সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে এক বিষয়ের শিক্ষক পরবর্তী কর্মজীবনে তাঁর ইন্টারমিডিয়েট বা ডিগ্রি

www.pathagar.com

পর্যায়ের ছাত্র বা ছাত্রীর (যদি শেষোক্তের পাঠদানের বিষয় ভিন্ন হয়) অধস্তন হয়ে পড়েন, সরকারি কলেজ শিক্ষকদের চাকরিতে এটি একটি সুলভদৃষ্ট ব্যাপার। পত্রিকা খুললে প্রায়ই দেখা যায়, প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে অনেক সরকারি কলেজেই শিক্ষাদানের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। অথচ বরাদ্দ পদের অভাবে সেখানে নতুন শিক্ষক নিয়োগদান সম্ভব হচ্ছে না। এত সব সমস্যার ওপর আছে শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি ও আমলাতান্ত্রিকতা, যার কাছে শিক্ষকরা ভীষণ অসহায়। এসব কারণে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে। তাঁরা পেশার প্রতি মনোযোগ ও নিষ্ঠা হারিয়ে ফেলছেন। মেধাবী তরুণরা আর শিক্ষকতার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে না। জাতির ভবিষ্যতের স্বার্থেই এই অবস্থার অবসান, পরিবেশের পরিবর্তন প্রয়োজন। শিক্ষার উন্নতির জন্য অন্য যত যা-ই আমরা করি না কেন, শিক্ষকতা পেশায় মেধা আকর্ষণের তো কোনো বিকল্প নেই।

পৃথিবীর সর্বত্র শিক্ষকতায় পদোন্নতি বা উচ্চতর বেতন-ভাতা প্রাপ্তির বিষয়টি গবেষণা ও প্রকাশনার সঙ্গে শর্তযুক্ত। বোধহয় বাংলাদেশই এর একমাত্র ব্যতিক্রম। এখানে শিক্ষকতার জন্য গবেষণা এমনকি বেশি লেখাপড়ারও প্রয়োজন হয় না (নমুনা জরিপ হিসেবে দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের গ্রন্থাগারসমূহের হাল-অবস্থা, বার্ষিক বই কেনার হিসাব ও পুস্তকতালিকা এবং সর্বোপরি শিক্ষকদের বই ইস্যুর রেজিস্টার পরীক্ষা করলেই এ ব্যাপারে একটি চমকপ্রদ তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে আমাদের ধারণা)। একবার কোনোমতে চাকরিতে ঢুকে পড়লেই হয়। এরপর সবকিছু নিজস্ব নিয়মে (বা নিয়মহীনতায়) আপনা-আপনিই হতে থাকবে। চাকরি ও পদোন্নতির শর্ত পূরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণার নামে সাম্প্রতিককালে যেসব কাজ হয়েছে বা হচ্ছে তা নিয়েও অনেক মজার মজার কথা শোনা যায়। অন্যের থিসিস চুরি করে নিজের নামে জমা দেওয়া, এম.ফিল থিসিস জমা দিয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ ইত্যাদি অভিযোগ তো রয়েছেই, ওয়াকেবহাল মহলের মতে, মানের দিক থেকে অধিকাংশ থিসিসই মৌলিকত্ব বা তাৎপর্যহীন, অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশের অযোগ্য, বড়জোর উন্নতমানের টিউটোরিয়াল বলা যায় সেগুলোকে। এরপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান যখন এম.ফিল ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রদান করবে তখন এক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা যে কী দাঁড়াবে তা বোধহয় কাউকে বলে বোঝাবার দরকার নেই। সরকারি কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতির জন্য এসিআর (বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন)-এর যে-ব্যবস্থা আছে তার ফরমে এমন কোনো ঘর নেই যা থেকে মনে হতে পারে, শিক্ষকতার চাকরির সঙ্গে পাঠদান বিষয়টিরও কোনো সম্পর্ক আছে। প্রশাসন, পুলিশ বা শুল্ক কর্মকর্তাদের সঙ্গে শিক্ষকদের এসিআর ফরমের কোনো তফাত থাকবে না? পৃথিবীর অন্য অনেক জায়গায় যেমন আছে, শিক্ষার্থীদের

www.pathagar.com

তরফে শিক্ষকদের যোগ্যতা বা দক্ষতা মূল্যায়নের কোনো ব্যবস্থা কি বিশ্ববিদ্যালয় কি কলেজ বা স্কুল কোনো পর্যায়েই আমাদের দেশে নেই।

সারা পৃথিবীতেই শিক্ষা বিভাগকে ভ্যাকেশন ডিপার্টমেন্ট হিসেবে গণ্য করা হয়। শিক্ষার্থীদের মতো শিক্ষকদেরও এই অবকাশটা দরকার। শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রীষ্মকালীন ও/বা বার্ষিক পরীক্ষা-পরবর্তী এই লম্বা ছুটির প্রয়োজন যাতে তারা এ সময় 'দেশের' বাড়িতে বেড়াতে যেতে, প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসতে, সিলেবাস-বহির্ভূত বইপুস্তক পড়তে এবং খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক বা চিত্তবিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে। শিক্ষার্থীদের এই ছুটি ইদানীং অনেক ক্ষেত্রে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিংবা একাডেমিক ক্যালেন্ডার এভাবে তৈরি করা হয় যাতে ছুটির পরই থাকে তাদের পরীক্ষা। এমনকি বার্ষিক পরীক্ষা দিয়েও তাদের অবসর নেই। কারণ তখন আবার রয়েছে নতুন শ্রেণিতে বা স্কুলে ভর্তির জন্য প্রাইভেট কোচিং। তার ওপর অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই খেলার মাঠ নেই, নেই লাইব্রেরি সুবিধা বা অনুষ্ঠান করার জায়গা। শহরাঞ্চল এমনকি গ্রামগঞ্জেও পুরনো বিদ্যালয়গুলোর মাঠ দখল করে সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে সাইনবোর্ড-সর্বস্ব কোনো কলেজ, কোচিং সেন্টার, শপিং কমপ্লেক্স কিংবা অন্য স্থাপনা। শিক্ষকদেরও দীর্ঘ অবকাশ দরকার পড়ালেখা, লাইব্রেরি ওয়ার্ক, গবেষণা, পাঠ-পরিকল্পনা, পরীক্ষার খাতা দেখা ইত্যাদির জন্য। এদেশে সেই ব্রিটিশ আমল থেকে বিচার বিভাগের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও এই অবকাশ-সুবিধাটা পেয়ে আসছে। কিন্তু অনেকেরই বোধহয় তা পছন্দ নয়। খোদ সরকারি কলেজ শিক্ষকদের তরফেই সাম্প্রতিককালে তাঁদের চাকরিকে ভ্যাকেশন ডিপার্টমেন্টের ক্যাটেগরিমুক্ত করার দাবি তোলা হয়েছে। আর এ ব্যাপারে তাঁদের তরফে যে-যুক্তিগুলো দেওয়া হয়, তার যথার্থ ভিত্তি থাকলেও (আসলে তাঁরা ছুটিটা ভোগ করতে পারেন না), এ অনেকটা মাথাব্যথায় মাথা কেটে ফেলার সমাধান দেওয়ার শামিল। আসলে এই সরকারি শিক্ষকরা অনেকে বা তাঁদের নেতারা নিজেদেরকে যতটা না শিক্ষক তার চেয়ে বেশি মনে হয় কর্মকর্তা ভাবতেই আগ্রহী বা পছন্দ করেন। শিক্ষকদের ক্যাডারভুক্তির মাধ্যমে তাঁদের তথা সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার এই সর্বনাশটাই করা হয়েছে! যদিও ক্যাডার সার্ভিসের পঙ্‌ক্তিভোজে সরকারি শিক্ষকদের স্থান বা মর্যাদা কোনোটাই সে অর্থে নেই।

শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত এ আলোচনায় আমরা ইতিপূর্বে অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতির কথা বলেছি। দুর্নীতিতে শীর্ষস্থান দখলকারী বাংলাদেশে সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে দুর্নীতির র‍্যাংকিংয়ে প্রথম সারিতেই রয়েছে শিক্ষা বিভাগ, এ তথ্যটুকু আমাদের সবার জানা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন, উন্নয়ন প্রকল্পভুক্তি, নির্মাণ ও সংস্কারকাজের ঠিকাদারি লাভ, এমপিওভুক্তি, শিক্ষক বদলি; বই, শিক্ষোপকরণ ও কম্পিউটার ক্রয় ও সরবরাহ ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই অনেকদিন

www.pathagar.com

যাবত টাকার হরিলুট চলে আসছে। আর এর বিষময় ফল স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষাব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ কথাটা মনে হয় আক্ষরিক অর্থেই দেশের বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে প্রযোজ্য। বস্তুত এই প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারী চক্রের কাছে পুরোপুরি জিম্মি। শিক্ষার্থী-অভিভাবক-শিক্ষক সকলেই এর ভুক্তভোগী। সার্টিফিকেট বা মার্কশিট তোলা, উত্তরপত্র যাচাই ইত্যাদি যে-কাজেই যাওয়া যাক না কেন হয়রানির শেষ নেই। অভিযোগ রয়েছে বাড়তি খরচ না করে সেখানে কোনো কাজই পাওয়া যায় না। এছাড়া প্রশ্নপত্র ফাঁস, উত্তরপত্র কেলেঙ্কারি, ফলাফলে কারচুপি এসব তো রয়েছেই। বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুর্নীতি ও অব্যবস্থা দূর করতে অতীতে যাঁরাই উদ্যোগী হয়েছেন, তাঁদেরকেই বরং নাকানিচুবানি খেয়ে শেষে আপসে আসতে বা বিদায় নিতে হয়েছে। শিক্ষা বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীর সঙ্গে সম্পর্কের সুবাদে যে-শিক্ষক যে-পত্র পড়ান না, হয়তো কোনোকালে পড়ান নি, কিংবা দীর্ঘদিন শিক্ষকতা বা পাঠদানের সঙ্গে যুক্ত নন, দেখা যায় প্রশ্ন করার, খাতা দেখার ক্ষেত্রে তিনিই অগ্রাধিকার পান। একজনের নামে খাতা নিয়ে অন্যকে দিয়ে দেখানো, দীর্ঘ সময় ফেলে রাখার পর তাগাদার মুখে শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়া করে কোনোমতে খাতা দেখে জমা দেওয়া, এমনকি খাতা না দেখেও নম্বর দেওয়া এসব নাকি খুব সাধারণ ব্যাপার।

বলা বাহুল্য, শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের রয়েছে একটা মুখ্য ভূমিকা। অথচ পাঠ্যপুস্তকের কথায় যদি আসি, আমাদের পাঠ্যপুস্তকগুলোর মান নিয়ে কি সত্যিই কারো কোনো মাথাব্যথা আছে? এক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র উদ্বেগ বা মনোযোগ যেন পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, তাতে স্বাধীনতার ঘোষণা-সংক্রান্ত তথ্যের অন্তর্ভুক্তি—রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাতে পরিবর্তন আনার ব্যস্ততা বা সংশোধনের দাবি—এই একটি বিষয়েই নিবদ্ধ। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এদেশে যাঁরা পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত তাঁরা কারা? এ ব্যাপারে তাঁদের সত্যিসত্যি কতটা যোগ্যতা রয়েছে? কিংবা তাঁরাই কি এক্ষেত্রে দেশের উপযুক্ততম ব্যক্তি? কারা কিভাবে এবং কোন যোগ্যতার মাপকাঠিতে তাঁদের নির্বাচন করেন? বরং অনুসন্ধানে জানা যায়, ঢাকার সরকারি কলেজসমূহে উপস্থিত শূন্যপদের অভাবে, কেবল ঢাকায় অবস্থান ও সরকারি বাসা ধরে রাখার প্রয়োজন থেকে এবং মন্ত্রী-আমলাদের সঙ্গে আত্মীয়তা, অর্থ বা তদবিরের জোরে, কোনো রকম বিশেষজ্ঞতা, অতিরিক্ত যোগ্যতা বা প্রাক-অভিজ্ঞতা ছাড়াই, কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ এমন কি টেক্সট বুক বোর্ডের মতো প্রতিষ্ঠানেও পোস্টিং নিয়ে প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত কারিকুলাম

www.pathagar.com

ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও সম্পাদনার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ফলাফল পাঠ্যপুস্তকের নিম্নমান, অজস্র ভুলভ্রান্তি। পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের উল্লিখিত কর্মকর্তারা ছাড়াও অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসহ অনেক নামীদামি ব্যক্তি পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থাকেন (বলা বাহুল্য যখন যাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকেন তাঁদের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিরাই সাধারণত এই সুযোগ পান)। আর এর জন্য তাঁদেরকে সম্মানীও দেওয়া হয়। দেশের সেরা পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের সারিতে তাঁদের অনেকের স্থান। কিন্তু এত সব ডক্টরেট ডিগ্রিধারী, অধ্যাপকদের দ্বারা কিংবা তাঁদের তত্ত্বাবধানে প্রণীত, সম্পাদিত এবং তারপর নানা সেমিনার-কর্মশালার মাধ্যমে যাচাই ও চূড়ান্তকৃত হওয়ার পরও কিভাবে জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পাঠ্যবইয়েও এত তথ্য, বাক্যগঠনগত এবং বানানের ভুল ও অসঙ্গতি রয়ে যায়? কে এসব প্রশ্নের জবাব দেবেন? পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বইয়ের বাইরে বা অতিরিক্ত যে-সব বই বিশেষ করে বেসরকারি বা এনজিও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পড়ানো হয় তারও মান যাচাই, নিয়ন্ত্রণ বা এ ব্যাপারে উপযুক্ত তদারকির কোনো ব্যবস্থা দেশে আছে কি? মাদ্রাসা বোর্ড কিংবা এনজিওসমূহের নিজস্ব উদ্যোগে প্রণীত এসব পাঠ্যপুস্তকের মান ও দৃষ্টিভঙ্গিও দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্য ও বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য অনেকাংশে দায়ী। অথচ এ নিয়ে কথাবার্তা বলতে কাউকে বড় একটা শোনা যায় না। কেন?

৫

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে শাসকরা প্রধানত একটা অনুগত কেরানিকুল তৈরির লক্ষ্যে যে-শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল, দু-দুবার স্বাধীনতা লাভের পরও এদেশে আমরা মোটের ওপর তা-ই চালু রেখেছি। শাসকশ্রেণির স্বার্থে একটা বশংবদ করিৎকর্মা সেবকগোষ্ঠী সৃষ্টিই আজও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে শিক্ষা পরিকল্পনায় মানবিকীকরণ প্রয়াসের গুরুত্বের কথাটা এসে পড়ে। তথাকথিত কেজো দক্ষতা সৃষ্টি কিংবা কর্মোপযোগী বা পেশামুখী শিক্ষার নামে, চিন্তা সৃজনশীলতা ও দেশপ্রেমবর্জিত এক বিশেষ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালুর চেষ্টা চলছে আমাদের দেশে। যেখানে মানুষ নয়, দেশের স্বাধীন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও দায়িত্বশীল নাগরিক নয়, আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের উপযোগী জনশক্তি উৎপাদন, বড়জোর দাতাদের গুণগ্রাহী সৃষ্টিই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

আজ অভিভাবকরাও চাচ্ছেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের চৌকস, চালু, চোখকান খোলা বংশধর হিসেবে গড়ে তুলতে, যাতে সব পরিস্থিতিতে সবকিছুর সঙ্গে তারা মানিয়ে চলতে পারে। আগামী দিনটা যে হবে একটা নীতিহীন, নিষ্ঠুর সময় সে-বিষয়ে তাঁদের কোনো সংশয় নেই। কাজেই গোড়া থেকেই যদি নিজের আখের

www.pathagar.com

গোছানো বা অন্য কথায় আপন ভালোমন্দ বোঝার এলেমে তাদের সশস্ত্র করে তোলা না যায়, তাহলে তো সবই বৃথা! শিক্ষাদর্শের মূল কথা আজ বলা হচ্ছে 'এডজাস্টমেন্ট', পরিবর্তিত সময় বা বিশ্বপরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে শেখা। বাস্তববাদী হওয়ার নামে আদর্শবাদী জীবনদৃষ্টি, জীবনাচরণকে আমাদের সমাজে, দেশে আমরা আজ উপহাস-অবজ্ঞার বিষয় করে তুলেছি। শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এই মনোভাবটাই আমরা ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত, দৃঢ়মূল করতে চাই। হয়তো এই কারণেই আমাদের শিক্ষাক্রমে এবং পাঠ্যপুস্তকে জীবনী, বীরত্বগাথা, আবিষ্কার ও অভিযান কাহিনির মতো বিষয়গুলোর স্থান ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। বোধের বদলে প্রাধান্য পাচ্ছে বুদ্ধি, বিজ্ঞানের বদলে প্রযুক্তি, মানবিকতার বদলে ম্যানার্স।

৬

আমরা জানি আমাদের দেশে এ মুহূর্তে প্রধানত তিন ধারার শিক্ষা চালু রয়েছে : সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসাশিক্ষা ও ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা। এর পাশাপাশি ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষারই আরেকটি ধারাও চালু আছে যাকে কোনোভাবে জাতীয় শিক্ষার অংশ হিসেবে গণ্য করা যায় না। বরং বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থারই এক সম্প্রসারিত বা অনুপ্রবিষ্ট অংশ বলা যায় একে। ও-লেভেল, এ-লেভেল, আইইএলটিএস শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে যা আসলে বিদেশী শিক্ষার পাইপলাইন হিসেবে কাজ করছে (শিক্ষায় ঔপনিবেশিকীকরণ নামে এক পৃথক প্রবন্ধ বা আলোচনার বিষয় হতে পারে এটি)। আমাদের সমাজের উচ্চবিত্ত তো বটেই, উচ্চমধ্যবিত্ত এমনকি মধ্যবিত্ত স্তরেও এই ধারাটির প্রভাব ও আকর্ষণ ক্রমে জোরালো বা দুর্নিবার হয়ে উঠছে।

বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা দেশকে মোটের ওপর একদল গোঁড়া, ধর্মান্ধ, জীবন ও জগতবিমুখ 'বান্দা' উপহার দিচ্ছে। অন্যদিকে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থা বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকেও বেরুচ্ছে একটি স্বার্থপর বা ভীষণ রকম আত্মকেন্দ্রিক, নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন, দেশপ্রেমের অনুভূতিবর্জিত ও সামাজিক দায়বোধহীন রোবট প্রজন্ম। দুয়ের মধ্যে কোনটি 'বেটার' বা কম মন্দ সে বিতর্কে না গিয়েও আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, দুই ব্যবস্থাই আমাদের জাতিগঠনের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করছে।

আমাদের দেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ একবার শহীদ মিনারে দাঁড়িয়ে বললেন, মাদ্রাসায় রগকাটা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাই মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেওয়া উচিত। তিনি ঠিক এভাবেই কথাটা বলেছিলেন কি না জানি না, তবে কোনো কোনো পত্রিকায় খবরটা এভাবেই এসেছিল। পাল্টা

www.pathagar.com

বক্তব্য দিতে গিয়ে আমাদের দেশের একজন প্রধান কবি কোনো পত্রিকায় লিখলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সন্ত্রাস ও অস্ত্রবাজি হয়, কাজেই একই যুক্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও বন্ধ করে দেওয়া উচিত। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষা নিয়েও এ রকম পাল্টাপাল্টিই চলছে অনেকদিন যাবত, হয়তো আরও অনেকদিন চলবে। অস্বীকার করব না দু'পক্ষের অভিযোগেই সত্যতা আছে, তবে তা আংশিক। আর আংশিক সত্য আসলে সত্য নয়, বরং তা অনেক সময় মিথ্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর। এভাবে পাল্টাপাল্টির মাধ্যমে তাঁরা যা করছেন তা হল যুক্তিহীনতার চর্চা।

অন্য অনেক বিষয়ের মতো দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়েও আমাদের একটা জাতীয় ঐকমত্যে আসা দরকার। আর বিদ্যমান বাস্তবতায় মনে হয় সকল পক্ষে কমবেশি ছাড় দিয়েই আমাদেরকে এই সমঝোতায় পৌঁছতে হবে। যদি ধরেও নিই যে আমাদের প্রচলিত মাদ্রাসা পদ্ধতির শিক্ষা থেকে যারা বেরুচ্ছে মসজিদে ইমামতি করা, আজান দেওয়া, জানাজা ও মিলাদ পড়ানো কিংবা বাচ্চাদের আরবি শেখানো ছাড়া তাদের আর কোনো কার্যোপযোগিতা নেই, তাহলেও এই কাজগুলো করার লোকের প্রয়োজন কি আমাদের সমাজে বা জীবনে ফুরিয়ে গেছে, কিংবা অদূর ভবিষ্যতে যাবে বলে মনে হয়? যদি তা না হয় তবে আমাদেরকে অবশ্যই এমন সম্ভাবনার কথা ভাবতে হবে যে-ব্যবস্থায় সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতি থেকেই আমরা পর্যাপ্তসংখ্যক এই কার্যদক্ষ আধুনিকমনস্ক ও উচ্চশিক্ষিত মানুষ পেতে পারি। দেশের গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত আমাদের মাদ্রাসাশিক্ষাকে রাতারাতি বন্ধ করে দেওয়া ভবিষ্যতের কোনো বিপ্লবী সরকারের পক্ষেও সম্ভব নয়। সেই ১৯৫০-এর দশকে ইব্রাহীম খাঁর মতো শিক্ষাবিদ যে লিখেছিলেন : "আমাদের ইংরেজি শিক্ষিত নেতাদের বেশিরভাগেরই মনোভাব সংস্কারের অনুকূল, কিন্তু সংস্কারে হাত দেওয়ার অনুকূল নয়। তাঁরা আলেম সমাজকে ভক্তির চোখে যতখানি দেখেন, ভয়ের চোখে দেখেন তার চেয়ে বেশি।" এবং তাঁরা 'ডেঙুরের চাকে ঢিল ছোড়ার' ঝুঁকি নেবেন না, সেকথা আজ ও আগামী দিনের জন্যও সত্যি। দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব অন্তত তাঁদের ক্ষমতার স্বার্থে যে সে রকম কোনো হঠকারী পদক্ষেপ নেবেন না শুধু তা-ই নয়, শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবীদেরও উচিত হবে না, কোনো রকম দায়িত্বহীন উক্তি করে বা পরামর্শ দিয়ে পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত বা জটিল করে তোলা, যা বরং সংস্কারকে দুরূহ করে তুলবে ।

মোটকথা, সেদিন ১৯৭২ সালে যা হয়তো সম্ভব হলেও হতে পারত, বলা বাহুল্য আজ আর তা সম্ভব নয়। বিদ্যমান বাস্তবতায় যা করণীয় তা হল, সাধারণ শিক্ষাকে মূলধারা গণ্য করেই, সতর্ক ও দূরদর্শী পরিকল্পনার মাধ্যমে, এর সঙ্গে প্রচলিত অন্য ধারাগুলোর ব্যবধান, সম্ভবের শেষ সীমা পর্যন্ত, কমিয়ে আনা। আর তার জন্য মাদ্রাসাশিক্ষার ব্যাপক সংস্কার—আধুনিকায়ন ও মানোন্নয়ন যেমন

www.pathagar.com

অত্যাবশ্যক, তেমনি সাধারণ ধারাতেও ধর্মীয় বা নীতিশিক্ষার সংস্থান (অন্তত যারা তা নিতে চায় তাদের জন্য) রাখতে হবে। অন্যদিকে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাপদ্ধতিকেও সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বা তদারকিতে এনে সেখানেও শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলকভাবে ও সমান গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় ভাষা শিক্ষা এবং জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটাতে হবে। পাশাপাশি দেশের সাধারণ শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং এই ধারায় পড়ালেখা করেও যাতে একজন শিক্ষার্থী যথেষ্ট ভালোভাবে ইংরেজি শিখতে পারে সেভাবে পুরো শিক্ষাব্যবস্থাটিকে ঢেলে সাজাতে হবে। তবে এগুলো একেবারে মোটা দাগের কথা। এ ব্যাপারে বিশদ ও খুঁটিনাটি সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ এবং অন্যান্য অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল লোকদের সঙ্গে আলোচনাক্রমেই নির্ধারণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে হাততালি-কুড়ানো মেঠো বা সেমিনারের বক্তৃতা যেমন কোনো কাজে আসবে না, তেমনি আমলাদের চাপিয়ে দেওয়া ব্যবস্থাও ফলপ্রসূ না হবারই কথা।

২০০৭ *বিশ্বায়নের কবলে বাংলা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (২০০৮)*

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ ব্যাকরণ শিক্ষা

আপন ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশের ছাত্র-তরুণরা একদিন লড়াই করেছিল, জীবন অর্ঘ দিয়েছিল। পৃথিবীর খুব কম জাতি বা জনগোষ্ঠীর ইতিহাসেই যার তুলনা পাওয়া যাবে। ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাধিকার রক্ষার সে সংগ্রামের ধারাবাহিকতায়ই পরবর্তীকালে এক সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার পরিচয়চিহ্নিত একটি রাষ্ট্র লাভ করেছি। আমাদের ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবহ তারিখটি আজ জাতিসংঘের উদ্যোগে সারা বিশ্বে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে। এ সবই নিশ্চয় আমাদের পরম গৌরব ও গর্বের বিষয়। কিন্তু এ হল চিত্রের একদিক। নিজস্ব ভাষার প্রতি ভালোবাসা বা তার মর্যাদা সংরক্ষণের প্রশ্নে আমাদের সাম্প্রতিক অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জবাবে খুব আশাবাদী লোকেরও বোধহয় নিরুত্তর থাকা ছাড়া উপায় নেই।

আমাদের ভাষাশিক্ষার বর্তমান শোচনীয় দশা নিয়ে কারো বোধহয় তেমন দ্বিমত নেই। আমাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী এমনকি উচ্চডিগ্রিধারী ব্যক্তিদেরও গড়পড়তা ভাষাজ্ঞান এই বাস্তবতাকে তুলে ধরে। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষার বেলায়ই কথাটা কমবেশি সত্যি। যদিও ইংরেজির ক্ষেত্রে বিষয়টি নিয়ে আমরা যতটা উদ্বিগ্ন বা বিচলিত, বাংলা ভাষার ব্যাপারে তার সামান্যও দেখা যায় না। ইদানীংকালে ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে আমাদের যা কিছু উদ্যোগ-আয়োজন, যত্ন বা সতর্কতা তা প্রধানত ইংরেজির ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ। মাতৃভাষার বেলায় আমাদের অধিকাংশই যেন বা 'ফ্রি-স্টাইল' নীতির অনুসারী। আমাদের উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তিদেরও অনেকের বাংলা উচ্চারণ ও বানানের নমুনা থেকে তা বোঝা যায়। যদিও এ নিয়ে কোনো রকম লজ্জা বা সঙ্কোচ তাঁদের পীড়িত করে না। আমাদের ঐতিহ্যিক হীনম্মন্যতা, সচেতনতার অভাব, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক-রাষ্ট্রিক ঔদাস্য-অবহেলা যাকেই এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী করি না কেন, এর পরিণতি যে জাতির জন্য

www.pathagar.com

শুভ হবে না সেটা এক রকম নির্দ্বিধায় বলা যায়। বস্তুত আমাদের চিন্তা বা মননচর্চার সাম্প্রতিক দৈন্যদশার জন্য নিজ ভাষার প্রতি এই অবহেলার মনোভাবও অনেকাংশে দায়ী।

একটি আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করছি না। বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তির বিকাশ, অর্থনৈতিক বাস্তবতা, অভিবাসনের ব্যাপকতা ইত্যাদি হয়তো একে আমাদের জন্য পূর্বের যে-কোনো সময়ের চেয়ে অত্যাবশকীয় করে তুলেছে। আর শুধু ইংরেজিই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য অন্তত প্রধান ভাষাগুলোও শিখতে আমরা আগ্রহী হব না কেন? তবে কোনো অবস্থায়ই আমাদের জন্য তা বাংলার বিকল্প হতে পারে না।

বাংলা শুধু আমাদের মাতৃভাষাই নয়, রাষ্ট্রভাষাও। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা প্রচলনের সাংবিধানিক অঙ্গীকারটিকে যদি আমরা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করি, অর্থাৎ তা যদি স্রেফ কথার কথা না হয়, তবে শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ভাষার পঠন-পাঠনের, অন্তত শিক্ষার্থীদের শুদ্ধভাবে বাংলা বলতে ও লিখতে শেখানোর বিষয়টিকে অবশ্যই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। অন্য কোনো প্রয়োজন বা অগ্রাধিকার বিবেচনায়ই এই কর্তব্যটিকে উপেক্ষা বা অবহেলা করা যায় না। তথাকথিত বিশ্বায়নের দোহাই দিয়েও আজ এর থেকে সরে আসার কোনো সুযোগ নেই।

রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে তুলনা করেছেন মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে, বলা বাহুল্য তা অবিকল্পতার অর্থে। না হলে অন্য যে-কোনো ভাষার মতো মাতৃভাষা আয়ত্তের ব্যাপারটিও আয়াসসাপেক্ষ। নবীন বয়সেই, অর্থাৎ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাতৃভাষা শিক্ষার ভিতটি পোক্ত করে না দিলে পরবর্তীতে এ ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ফল পাওয়ার সম্ভাবনা কম। আর এ ব্যাপারে, যোগ্য শিক্ষকের পাশাপাশি, ভালো ও নির্ভরযোগ্য ব্যাকরণ বইয়ের গুরুত্ব অত্যধিক। অবশ্য ব্যাকরণের নিয়মকানুনগুলো জানা থাকলেই এবং তার সঙ্গে, ধরা যাক, যদি কেউ এমনকি অভিধানও মুখস্থ করে ফেলেন, তিনি যে ভাষা সুন্দর করে বলতে বা লিখতে পারবেন, তা নয়। সেটি প্রতিভা ও অনুশীলনের ব্যাপার। তবে ভাষার শুদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য ব্যাকরণ পাঠের বিকল্প নেই।

চূড়ান্ত অর্থে ভাষা ব্যাকরণকে নয়, ব্যাকরণই বরং ভাষাকে অনুসরণ করে। ভাষাকে তুলনা করা হয় বহতা নদীর সঙ্গে। অনেক সময় কূল ভাসিয়ে পাড় ভেঙে সে এগিয়ে চলে। একথাও সত্যি যে প্রতিভাবান ও সৃষ্টিশীল লেখকরা কখনো ব্যাকরণের নিয়মকানুন কড়াক্কড় মেনে কলম চালনা করেন না। তাঁদের প্রয়াস যেমন ভাষার প্রবাহে গতি সঞ্চার করে তেমনি তাকে নতুন নতুন বাঁকও দেয়।

www.pathagar.com

ভাষার ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তো বটেই, নতুন বা অভিনব কিছু করার জন্যও ভাষার নিয়মকানুনগুলো জানা দরকার। প্রথা ভাঙতে হলেও প্রথা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হয়।

ভাষা পরিবর্তনশীল। ব্যাকরণের নিয়মকানুনগুলোও তাই স্থাণু নয়। ভাষার বিবর্তন বা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার নিয়মকানুনগুলোও অল্পাধিক পরিবর্তিত হয়। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো ব্যাকরণটিও হয়তো একসময় তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়, কিছু পরিমাণে সেকেলে হয়ে পড়ে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রতি যুগেই সে-যুগের উপযোগী একটি নতুন ব্যাকরণ বা তার নয়া সংস্করণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। পৃথিবীর অন্য যে-কোনো ভাষার মতো বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও কথাটা সত্যি।

২০০৬ *বিস্মৃত চিন্তানায়ক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (২০০৯)*

www.pathagar.com

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় ভাষার স্থান

বাংলাদেশে বর্তমানে অর্ধশতের অধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু আছে। এছাড়া মনে হয় প্রায় প্রতি মাসেই নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কার্যক্রম চালুর অনুমতি পচ্ছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট কয়েকটি মাত্র বিষয়ে পাঠদান করা হয়। যেমন : ব্যবসা প্রশাসন, কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তি, চিকিৎসাবিজ্ঞান, আইন, পরিবেশবিজ্ঞান ইত্যাদি। সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম হল ইংরেজি। এর বাইরে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সও চালু আছে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় হলেও এগুলোতে বাংলা ভাষার কোনো স্থান নেই। আমাদের জানা মতে, একটিমাত্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষণে বাংলা অনার্স ও মাস্টার্স পড়ার এবং অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একশ নম্বরের একটি বাংলা ঐচ্ছিক পত্র পড়ার সুযোগ রাখা হয়েছে।

সকলেই জানেন মূলত বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকেই এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বড় বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা তাঁদের আর পাঁচটা ব্যবসার মতোই এতে টাকা লগ্নি করেছেন। নিশ্চয়ই লাভের আশা নিয়েই তাঁরা তা করেছেন। ফলে খুবই স্বাভাবিক যে বাজার-চাহিদার দিকে লক্ষ রেখেই এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানের বিষয় নির্ধারিত হবে। উপরন্তু আমাদের সমাজের যে-সব পরিবারের সন্তানরা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসেন, তাঁদেরও লক্ষ্য বা স্বপ্ন হল একটি ডিগ্রি যোগাড় করে কোনোমতে বিদেশে পাড়ি জমানো। আর এক্ষেত্রে বাংলা ভাষার যে কোনো উপযোগিতা নেই, সে তো বলাই বাহুল্য। তা বিদ্যার এ মহা-বাণিজ্যে বিক্রেতা ও ক্রেতারা তাঁদের নিজ নিজ লাভালাভের হিসেব দ্বারা পরিচালিত হতেই পারেন। কিন্তু দেশের সরকার, যাঁরা নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ সাপেক্ষে এসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন, তাঁদের কি এ ব্যাপারে সত্যিসত্যি কোনো দায়িত্ব বা কর্তব্য নেই? একটি দেশের এতগুলো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশটির জাতীয় ভাষা শিক্ষাদানের কোনো ব্যবস্থা থাকবে না, এমনকি আজকের তথাকথিত বিশ্বায়নের যুগেও, এটি কি ভাবা যায়? কিংবা অপর কোনো দেশে কি এমনটি হওয়া সম্ভব ছিল? জানতে ভীষণই কৌতূহল হয়। তাছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের সবাই কি শেষপর্যন্ত তাঁদের প্রত্যাশা অনুযায়ী বিদেশে কিংবা দেশের অভ্যন্তরে কোনো না কোনো বিদেশী-বহুজাতিক সংস্থায় কর্মসংস্থানের

www.pathagar.com

সুযোগ করতে পারবেন? অনেককে কি তাঁদের এ দেশেই সরকারি-আধা সরকারি চাকরিও করতে হবে না? অদূর ভবিষ্যতে সরকারি কাজকর্মেও ইংরেজির 'সগৌরব' পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোনো চিন্তা-ভাবনা কি আমাদের প্রভাবশালী মহল করছেন? তা যদি না হয়, তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা এসব ছাত্রছাত্রী (পূর্ববর্তী পর্যায়েও যাঁরা হয়তো ইংরেজি মাধ্যমেই লেখাপড়া করেছেন) বাংলা ভাষাজ্ঞান ছাড়া তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধিকে কর্মক্ষেত্রে কিভাবে প্রয়োগ করবেন?

জাতীয় আত্মমর্যাদা, জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি দায়িত্ববোধ ইত্যাদির কথা যদি বাদও দিই (জানি যে আজকের পরিস্থিতিতে অনেকের কাছেই এগুলো নিতান্ত ছেঁদো কথা শোনাবে), তবু উপরিউক্ত বাস্তব বিবেচনা থেকেই সরকারি-বেসরকারি প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি বা অনার্স পর্যায়ে যে-কোনো বিষয়ের সঙ্গে একটি ২০০ নম্বরের আবশ্যিক বাংলা (ব্যবহারিক) পত্র অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। যে-যুক্তিতে আজ বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য পূর্ববর্তী পরীক্ষাসমূহে বাংলা ও ইংরেজিতে শতকরা ৪৫ ভাগ নম্বর পাওয়ার শর্ত নির্ধারণ করার কথা ভাবা হচ্ছে (আগামীতে হলেও তা করা উচিত বলে মনে করি), সেই একই যুক্তিতে অনার্স পর্যায়েও যে-কোনো বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা ও ইংরেজির একটি করে পত্র বাধ্যতামূলক করা উচিত। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতিকে অবশ্যই এই বাংলা আবশ্যিক পত্রের সঙ্গে শর্তযুক্ত করতে হবে।

সাম্প্রতিককালে দেশে ইংরেজি শিক্ষার মান নেমে গেছে বলে আমরা যারপরনাই উদ্বিগ্ন। এই অবস্থার প্রতিবিধানের জন্য সরকারি তরফে ইতিমধ্যে নানা পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে, হচ্ছে। তবে প্রকৃত ঘটনা হল, শুধু ইংরেজি শিক্ষারই নয়, বাংলা শিক্ষারও মান সাম্প্রতিককালে ভীষণ নেমে গেছে। দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া বা পাস করা (এমনকি বাংলায় অনার্স-মাস্টার্স ডিগ্রিধারী) তরুণদের গড়পড়তা ভাষাজ্ঞানের নমুনা থেকে সহজেই যা বোঝা যায়। তফাত হল, ইংরেজির মতো বাংলা ভাষা শিক্ষার মান নেমে যাওয়া নিয়ে আমাদের কোনো উদ্বেগ বা মাথাব্যথা নেই। কারণ এ দেশের যাঁরা নীতিনির্ধারক, প্রকৃত দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের সন্তানরা বাংলা মাধ্যমে পড়েন না, বাংলাও তেমন পড়েন না। কিংবা আজ যদি বা দায়ে পড়ে একটু-আধটু পড়তে হয়, আশা আছে, ভবিষ্যতে তারও প্রয়োজন হবে না। তথাকথিত জাতীয়তাবাদী কিংবা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী—রাজনীতিক, আমলা, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিমান নাগরিক সবার বেলায়ই একথা কমবেশি সত্যি। অন্যান্য আরও কিছুর মতো বাংলা না-পড়াটাও যেন আজ এদেশে জাতে-ওঠার সোপান হয়ে উঠেছে। জাতির ভবিষ্যত স্বার্থেই বিষয়টির প্রতি দেশের প্রকৃত চিন্তাশীল ও বিবেকসম্পন্ন মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

২০০৪ *বিশ্বায়নের কবলে বাংলা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (২০০৮)*

www.pathagar.com

রোকেয়া, তাঁর বিদ্যালয় এবং বাংলা-উর্দু বিতর্ক

রোকেয়ার নামের সঙ্গে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী—তাঁর এই পরিচয়টি পরবর্তীকালে অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেলেও, আমাদের মনে রাখতে হবে, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও আগে, একজন লেখক হিসেবেই তিনি খ্যাতি বা পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। সাখাওয়াত হোসেনের মৃত্যু-সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে *The Mussalman* পত্রিকায় তাঁর 'devoted wife Mrs. R. S. Hossain' সম্পর্কে লেখা হয় : "Whose name is familiar with those who have anything to do with modern Bengali literatute' [May 14, 1909]। রোকেয়ার দুটি প্রধান পুস্তক *মতিচূর* (প্রথম খণ্ড) ও *Sultana's Dream*সহ বেশকিছু উল্লেখযোগ্য রচনা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বা তাঁর স্বামীর মৃত্যুর আগেই প্রকাশিত হয়।

তা সত্ত্বেও, এটাও সত্য যে, ১৯১১ সালের পর তাঁর সকল মনোযোগ ও কর্ম-প্রয়াসের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় এই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল। যে-কোনো দিক থেকেই বিচার করি না কেন, রোকেয়ার জীবন ও কর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে সাখাওয়াত মেমোরিয়ালের গুরুত্ব অপরিসীম। বাঙালি মুসলমান সমাজের নারীদের জাগরণের ক্ষেত্রেও এই বিদ্যালয় এক সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রেখেছে। যদিও বিদ্যালয়টি প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ অস্বস্তির সঙ্গেই আমাদের উল্লেখ করতে হয় যে, (অবিভক্ত) বাঙলার রাজধানী কলকাতা শহরে অবস্থিত এবং বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ও লেখক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টি ছিল একটি উর্দু-মাধ্যম স্কুল। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন সামাজিক বাস্তবতার কথা আমাদের বিবেচনায় নিতে হয়। বিবেচনায় নিতে হয়েছিল রোকেয়াকেও। রোকেয়াকেও তাঁর সময়ে এ সম্পর্কে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। পত্রিকায় চিঠি লিখে এ ব্যাপারে নিজস্ব অবস্থান ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল। বুঝিয়ে বলতে হয়েছিল, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ধারণায় বিশ্বাসী হয়েও, কেন বা কোন পরিস্থিতিতে তিনি সাখাওয়াত মেমোরিয়ালকে উর্দু-মাধ্যম বিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন।

www.pathagar.com

The Mussalman পত্রিকার ২৫ মে ১৯১৭ সংখ্যায় 'Education of Bengali-speaking Moslem Girls' শিরোনামে 'আর' [রফিকুর] রহমানের একটি পত্র প্রকাশিত হয়। তাতে পত্র-লেখক কলকাতার বাংলাভাষী পরিবারের মেয়েরা (অর্থাৎ বাংলা যাদের মাতৃভাষা) যাতে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করতে পারে তার জন্য কলকাতায় একটি পৃথক বিদ্যালয় চালু কিংবা সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলেই তাদের জন্য বাংলা মাধ্যমে শিক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেছিলেন। তবে একটি নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা বিবেচনা করে তিনি সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলেই বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের বিষয়টির ওপর প্রাধান্য দেন। প্রসঙ্গত জনাব রহমান মন্তব্য করেছিলেন : যেহেতু বাঙলা দেশের শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশি মুসলমান বাংলাভাষী সেহেতু স্বভাবতই রোকেয়া পরিচালিত বিদ্যালয়টির ওপর তাদের দাবি উর্দুভাষীদের চেয়ে বেশি। অবশ্য একই চিঠিতে জনাব রহমান পরিষ্কার করে জানিয়েছিলেন, উর্দুভাষী মেয়েদের উর্দুর মাধ্যমে শিক্ষাদানে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। তাঁর মূল আপত্তিটা হল, প্রেসিডেন্সি বিভাগ যেখানকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাংলাভাষী, সেখানে মুসলমান মেয়েদের জন্য এমন একটিও বিদ্যালয় নেই যাতে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। *Mussalman* সম্পাদক মৌলভি মুজিবুর রহমান—যিনি সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিরও একজন সদস্য ছিলেন—তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত আবেদন রেখে জনাব রহমান বলেন, 'আপনি যে কিনা সবসময় বাংলা মাধ্যমের সপক্ষে ওকালতি করে এসেছেন, দুঃখের বিষয় যে, এ যাবত ব্যাপারটি তাঁরও মনোযোগ এড়িয়ে গেছে।' চিঠিটি শেষ করেন জনাব রহমান একথাগুলো বলে : "I also regret that Mrs. R. S. Hossein, a daughter of Bengal, of whom the people of Bengal was proud and who has devoted her life to the cause of female education, has been doing very little for the education of Bengali-speaking sisters."

জনাব রহমানের এই পত্রের প্রতিক্রিয়ায় নওশের আলী খান ইউসফজী রোকেয়ার পরিচালিত বিদ্যালয়ের বিদ্যমান উর্দু-মাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থাকেই সমর্থন করে একটি পত্র লেখেন, 'Urdu and Bengali' শিরোনামে একই পত্রিকার ৮ জুন ১৯১৭ সংখ্যায় যা ছাপা হয়। হ্যাঁ, ইনিই সেই নওশের আলী খান ইউসফজী, রোকেয়ার 'আমাদের অবনতি' প্রবন্ধের সমালোচনা করে একদা যিনি লিখেছিলেন 'একেই কি বলে অবনতি?'। ইউসফজী তাঁর পত্রে নেতৃস্থানীয় একদল লোকের বাংলা ভাষার পক্ষে আন্দোলনকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে অভিহিত করে মন্তব্য করেন, এর ফলে বাঙলা দেশে প্রকৃত মুসলমান শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে লাভের চেয়ে বরং ক্ষতিই হয়েছে বেশি। তাঁর মতে, উর্দু ভাষা ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের একটি

www.pathagar.com

আশীর্বাদ, আর এই ঐতিহ্য নিয়ে প্রতিটি মুসলমানেরই গর্বিত হওয়া উচিত। বাঙলার আর পাঁচটা বালিকা বিদ্যালয়ে মেয়েদের যে ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়, মুসলমান মেয়েদের জন্য তিনি তাকে উপযুক্ত মনে করেন নি। তাঁর মতে, মুসলমান নারীশিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত যে-ধর্মীয় আচার ও গার্হস্থ্য কর্তব্য বিষয়ে জ্ঞান, তার জন্য উর্দু-মাধ্যম শিক্ষা অত্যাবশ্যক। মুসলমান মেয়েদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল ইতিমধ্যেই যে সাফল্য দেখিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে তার বর্তমান ধারাতেই চলতে দেওয়ার পক্ষে বক্তব্য রেখে ইউসফজী রহমান সাহেবকে অনুরোধ করেন এমন একটি 'flourishing institution which is contributing so much towards Mohamedan female education in this town' এর ক্ষতিকর সমালোচনা থেকে বিরত থাকতে। অবশ্য জনাব রহমান ও তাঁর বন্ধুরা যদি তাঁদের নিজস্ব ধারায় আলাদা বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় গড়ে তোলেন তবে তাতে ইউসফজী তাঁর আপত্তি নেই বলেও জানান।

নওশের আলী খান ইউসফজীর পত্রের প্রত্যুত্তরে জনাব রহমান *The Mussalman* পত্রিকায় আরও দুটি চিঠি লেখেন। 'Urdu and Bengali' এই একই শিরোনামে পত্রিকার ১৫ জুন ১৯১৭ ও ২২ জুন ১৯১৭ সংখ্যায় যা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে প্রথমটিতে রহমান সাহেব তাঁর পূর্বের পত্রের বক্তব্য নিয়ে ইউসফজীর ভুল ব্যাখ্যা অপনোদনের চেষ্টা করেন। দ্বিতীয়টিতে প্রচলিত মক্তব শিক্ষাপদ্ধতি যে কমবেশি ব্যর্থ এবং বাঙলা দেশে মুসলমান শিক্ষার স্বার্থকে এগিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে তা যে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে—কিছু তথ্য এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে জোরালোভাবে সে অভিমত ব্যক্ত করেন।

এ বিষয়ে রোকেয়ার বক্তব্য আমরা পাচ্ছি পত্রিকার ৩০ নভেম্বর ১৯১৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 'Shakhawat Memorial Girls' School' শীর্ষক দীর্ঘ পত্রটিতে। তাতে তিনি বাঙলা দেশের মানুষের মাতৃভাষা বাংলা—রহমান সাহেবের এ বক্তব্যকে 'স্বতঃসিদ্ধ' সত্য বলে মেনে নিয়েও বলেছেন, এক্ষেত্রে কলকাতার পরিস্থিতি 'সম্পূর্ণ ভিন্ন'। একটানা সাত বছর কলকাতা শহর বাসের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে তিনি জানাচ্ছেন, এই সময়ের মধ্যে বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলার সাহচর্য লাভের সুযোগ তাঁর হয়েছে। কিন্তু তাঁদের কাউকেই তিনি বাংলা ভাষায় কথা বলতে শুনেছেন বলে মনে করতে পারছেন না। নিজে বাংলায় কথা বলতে শুরু করেও তিনি দেখেছেন তাঁরা উর্দুতে উত্তর দিতেই পছন্দ করেন। সে উর্দু সম্পর্কে রোকেয়ার মন্তব্য : 'broken and miserable'। লিখেছেন : "Many of these ladies. although natives of Bengal, say that they have forgotten Bengali. They can talk only bad Urdu but still they must talk Urdu !"

www.pathagar.com

বিদ্যালয় চালুর গোড়ার দিকে যখন ইংরেজিকে একটি অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে শিক্ষা দেওয়া হত তখন রোকেয়া চেষ্টা করেছিলেন ছাত্রীদের বাংলা ভাষার সাহায্য নিয়ে এই শিক্ষা দেওয়ার, অর্থাৎ ইংরেজি শব্দগুলোর বাংলা অর্থ করে দেওয়ার। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শিক্ষার্থিনীদের অভিভাবকদের কাছ থেকে তাঁর কাছে অনুরোধ আসতে থাকে যেন উর্দু-মাধ্যমে এই শিক্ষা দেওয়া হয়।

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের পর কলকাতা শহরে আরও দু-তিনটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু সেখানেও উর্দু-মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হয়। রোকেয়ার বক্তব্য হল, অভিভাবকরা চান বলেই এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম উর্দু। কলকাতার পর্দানশিন মুসলমান ঘরের বালিকারা বিনা মাইনেতেও বাংলা শিখতে আগ্রহী নয়। রোকেয়া বলেছেন, এটা প্রকৃতির নিয়ম যে কোনো সমাজ বা দেশ তা-ই পায় যার জন্য তার চাহিদা রয়েছে। প্রশ্ন করেছেন : "যদি কলকাতার মুসলমান জনগণ একটা বাংলা স্কুল চেয়েই থাকে তবে এটা কী ক'রে হয়, যে এতগুলো বছরেও এখানে সেরকম একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি?" ভারতবর্ষের এতদঞ্চলে একটি উর্দু-মাধ্যম বিদ্যালয় চালাবার নানা (রোকেয়ার ভাষায় 'একশো একটা') অসুবিধার (যেমন : উপযুক্ত মহিলা শিক্ষকের অভাব, পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিক্ষোপকরণের অভাব ইত্যাদি) উল্লেখ করে রোকেয়া বলেছেন, কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই এ সম্পর্কে জানেন। 'তারপরও আমরা উর্দুতে শিক্ষা দিচ্ছি সে কি শুধু ব্যক্তিগত খেয়াল বা ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে?' রোকেয়া প্রশ্ন রেখেছেন। প্রসঙ্গত রোকেয়া পূর্ববর্তী বছরে তাঁর বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থিনীদের দিয়ে বাংলা কবিতা আবৃত্তির উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন, তারও একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ দিয়েছেন এ পত্রে।

১৯১৭ সাল থেকে রোকেয়া তাঁর বিদ্যালয়ে পৃথক বাংলা ক্লাস চালু করেন। বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন সার্বক্ষণিক মহিলা-শিক্ষকও নিয়োগ করা হয়। *Mussalman* সম্পাদককে লেখা এই পত্র থেকে জানা যাচ্ছে, বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন ও রমজানের বন্ধের আগে পর্যন্ত বাংলা শাখায় ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১২। মাঝে এই সংখ্যা কমে-বেড়ে শেষপর্যন্ত নভেম্বর মাসে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩-এ। জনাব রহমান ও তাঁর মতো অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীদের রোকেয়া এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে ও বিদ্যালয়ের বাংলা শাখার জন্য ছাত্রী যোগাড় করে দিতে অনুরোধ করেছেন। জানিয়েছেন বছরের শেষ নাগাদ অন্তত ২০ জন ছাত্রী না পাওয়া গেলে তাঁদেরকে হয়তো বাংলা শাখাটি বন্ধই করে দিতে হবে। কারণ মাসের পর মাস বিনা কাজে একজন অতিরিক্ত শিক্ষকের মাইনে যোগানো তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ের বাংলা শাখার জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক ছাত্রী যোগাড় করা শেষপর্যন্ত সম্ভব হয়নি। তারপরও আরও এক বছর রোকেয়া বিদ্যালয়ের এই

www.pathagar.com

বাংলা শাখাটি চালু রাখেন। ১৯১৮ সালের শেষ দিকেও দেখা যাচ্ছে বিদ্যালয়ের বাংলা শাখার ছাত্রীসংখ্যা ৫। তার মধ্যে একজন আবার উর্দু শাখার, ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে বাংলা শিখছে.। এ তথ্য দিয়ে ২০ ডিসেম্বর ১৯১৮ সংখ্যা *The Mussalman*-এ 'Shakhawat Memorial Girls' School and Bengali Teaching' শিরোনামে প্রকাশিত এক পত্রে রোকেয়া জানাচ্ছেন, "We have therefore decided to abolish the Bengali branch from the beginning of January next."

The Mussalman পত্রিকার সঙ্গে জড়িত জনৈক আজিজুর রহমান সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ের বাংলা শাখার জন্য ছাত্রী যোগাড় করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সে কথার উল্লেখ করে রোকেয়া তাঁর প্রথম পত্রটিতে লিখেছিলেন : "Mr. Azizur Rahman himself assured me that he would give us a good many pupils if we were to start a Bengali branch in my school. Now that I have done so, I fail to see why he is unable to act up to his promise."

শিক্ষিত মানুষের কথা ও কাজের এ অসঙ্গতি রোকেয়াকে আজীবন পীড়িত করেছে।

তথ্য সূত্র : লায়লা জামান (সম্পা.), *দি মুসলমান পত্রিকায় রোকেয়া প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি : ঢাকা, ১৯৯৪।

১৯৯৭ *রোকেয়া : কালে ও কালোত্তরে (২০০০)*

www.pathagar.com

পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

সরকার পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সন্নিবেশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে ক্ষমতায় আসার পরপরই নতুন সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। জানা গেছে, কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজটি শুরু হয়েছে। আমাদের নবীন প্রজন্ম যাতে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারে সে-লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ, সন্দেহ নেই। তবে সরকার রাজনৈতিক স্তরে, নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সরকারের নিজের ভূমিকা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। পরবর্তী সমস্ত কাজ একাডেমিশিয়ানদের। আর ধীরেসুস্থে, ভেবেচিন্তে তাঁদেরকে সে কাজটা করতে হবে। এক্ষত্রে যে-কোনোরকম তাড়াহুড়ো বা গোঁজামিলের ফল বিপর্যয়কর হয়ে দেখা দিতে পারে। বর্তমান সরকার সকল 'জাতীয় ইস্যুতে ঐকমত্য' প্রতিষ্ঠার কথা বলছেন। বলা বাহুল্য, শিক্ষানীতি বা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই ঐকমত্যের প্রয়োজনটা সর্বাধিক। কারণ জাতি তার ভবিষ্যত বংশধরদের বছরের পর বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষার গিনিপিগ করে রাখতে পারে না। যদিও দুঃখজনকভাবে এ যাবত সেটাই হয়ে আসছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার রদবদল একটি স্বাভাবিক ঘটনা। আমরা যদি গণতন্ত্র মানি তাহলে আমাদের বিশ্বাস করতেই হবে যে জনগণের রায়ে আজ যাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, জনগণের রায়েই তাঁরা আবার ক্ষমতাচ্যুত হতে পারেন। এবং আজ যাঁরা ক্ষমতার বাইরে তাঁরা ফের ক্ষমতায় বসতে পারেন। সেদিন নতুন সরকার যদি আবার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইতিহাস রচনা ও পাঠ্যপুস্তকে তা সন্নিবেশের ব্যাপারে প্রয়াসী হন তবে তার ফল কী দাঁড়াবে? সম্ভাব্য সে-অবস্থাটাকে প্রতিরোধ করার কোনো ব্যবস্থা কি আমাদের জানা আছে? ভবিষ্যত জাতির চেতনালোক নির্মাণের এই দীর্ঘমেয়াদি কাজটাকে রাজনীতির বিষয় হতে দেওয়া কি কখনোই আমাদের উচিত হবে?

www.pathagar.com

বিশেষজ্ঞ কমিটিতে যাঁদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে নিজ-নিজ ক্ষেত্রে তাঁরা সকলেই হয়তো যোগ্য ব্যক্তি। অন্তত ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের কারো বিরুদ্ধেই আমাদের কিছু বলার নেই। তবে যে-কাজের জন্য তাঁদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে তার জন্য তাঁরাই যে দেশের মধ্যে যোগ্যতম এমন কথা তাঁদের সবার সম্পর্কে কিছুতেই বলা যাবে না। সবচেয়ে বড় কথা, সাম্প্রতিককালে এঁদের কেউ-কেউ তাঁদের ভূমিকার দ্বারা তাঁরা যতটা না পণ্ডিত বা বিশেষজ্ঞ তার চেয়ে বেশি তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয়কে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। যা এক্ষেত্রে তাঁদের সর্বজনগ্রাহ্যতার বিপক্ষে যাবে। কমিটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতেই বিশুদ্ধ একাডেমিক চরিত্রের, অন্তত রাজনৈতিকভাবে চিহ্নিত নন, এমনকি ভিন্ন শিবিরভুক্ত দু-একজন শিক্ষাবিদকে বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল। ফ্যানাটিক বা মতান্ধ লোক সব পক্ষেই আছে। এটাও ঠিক যে এঁদেরকে কোনো ঐকমত্যের আওতায় আনা কঠিন। তবে এঁদের বাইরেও মোটামুটি বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন, নমনীয়, সমঝোতা-প্রয়াসী ও পেশার প্রতি বিশ্বস্ত লোক আমাদের শিক্ষাবিদদের মধ্যে এখনও মনে হয় একেবারে দুর্লভ নয়।

মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার জন্য (এমনকি সে ইতিহাস যদি পাঠ্যপুস্তকের জন্যও লিখিত হয়) তাতে স্বাধীনতাসংগ্রামের মহানায়ক ও স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি শেখ মুজিব কিংবা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের ভূমিকাকে যথোচিত গুরুত্বে স্থান দেওয়াই যথেষ্ট হবে না। সেটুকু তো অবশ্যই করতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রকৃত প্রেক্ষিত (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক), সে-পর্বে এবং যুদ্ধ চলাকালীন দেশের ভেতরে ও বাইরে এর পক্ষে-বিপক্ষে কাদের কী ভূমিকা ছিল, কারা কীভাবে সহায়তা বা বিরোধিতা করেছিল, তা-ও এ-প্রসঙ্গে সংক্ষেপে (যে-স্তরে যতটা সম্ভব ও উপযোগী) উল্লেখিত হওয়া প্রয়োজন। ক্ষমতায় থাকাকালে জেনারেল জিয়া ও তাঁর উত্তরসূরিরা স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত বা গোপনের ব্যাপারে যে-ভূমিকাই নিন না কেন, তার প্রতিক্রিয়া (বা প্রতিশোধ) হিসেবে স্বাধীনতাযুদ্ধে জিয়ার ভূমিকার—তাঁর সে বেতার-ঘোষণার স্বীকৃতি দিতে আমরা যেন কার্পণ্য না করি। একইভাবে অন্যান্য সেক্টর কমান্ডার—যেমন খালেদ মোশাররফ, তাহের, জলিল প্রমুখের বীরত্বের উল্লেখও ইতিহাস-পুস্তকে থাকা দরকার। মোটকথা, অতীতের ধারায় কাউকে বড় করতে গিয়ে যাতে অন্য কাউকে ছোট করা না হয়। শীর্ষনেতা মুজিবের অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দীন প্রমুখের নেতৃত্বে প্রবাসী সরকার সমগ্র জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মওলানা ভাসানী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন চেয়ে বিশ্ব-নেতৃবৃন্দকে চিঠি দিয়েছিলেন। ভাসানী, মণি সিংহ, অধ্যাপক মোজাফ্ফর প্রমুখকে নিয়ে প্রবাসী

www.pathagar.com

সরকারের একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছিল। বিশ্ববাসীর কাছে মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে জাতির ঐকমত্যকে তুলে ধরতে অন্তত যা সহায়ক হয়েছিল। আওয়ামী লীগ ছাড়াও অন্যান্য দলের শত-শত কর্মী মুক্তিবাহিনীতে নাম লিখিয়ে বা বিচ্ছিন্নভাবে স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। এগুলোও আমাদের ইতিহাসের অংশ। ভবিষ্যত প্রজন্মের এগুলোও জানা দরকার।

তারপরও পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সন্নিবেশ করাতেই কেবল মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার পালিত হয় না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে পাঠ্যপুস্তক তথা সাধারণভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার প্রয়োজনীয়তার কথাটাও এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের পেছনে আমাদের একটি স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও যুক্তিশাসিত সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা কাজ করেছিল। আমাদের পাঠ্যপুস্তক তথা শিক্ষানীতিতে এই চেতনার প্রতিফলন ঘটা দরকার। এমনিতেও ইতিহাস তো ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ মাত্র নয়, একটি দৃষ্টিভঙ্গিও। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাস রচনা করা হলে তাতে বাঙলার বার-ভুঁইয়াদের প্রসঙ্গে ঈশা খাঁর পাশাপাশি কেদার রায়-প্রতাপাদিত্যের কথাও আসবে। মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা সেক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের দুর্বলতা, পক্ষান্তরে জগৎ শেঠ-উমি চাঁদদের ভূমিকা 'হিন্দু-বেনিয়াদের' চক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত হবে না। ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে 'ফকির বিদ্রোহে'র পাশাপাশি সমান গুরুত্বে 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' কথাটাও লিখিত হবে। তিতুমীরের লড়াইয়ের কথা যেমন সে ইতিহাসে থাকবে তেমনি সাঁওতাল বিদ্রোহের কথাও স্থান পাবে। সিপাহি বিদ্রোহের প্রসঙ্গে মঙ্গল পাণ্ডের বীরত্ব এবং বাহাদুর শাহ্-হজরত মহলের ভূমিকার পাশাপাশি তাঁতিয়া টোপি-নানা ফড়নবিস-রানি লক্ষ্মীবাইয়ের অবদানও উল্লেখিত হবে। সাতচল্লিশ-পূর্ব ইতিহাসে নবাব সলিমুল্লাহ্‌কে বাদ না দিয়েও, ব্যারিস্টার আবদুর রসুলের নাম উল্লেখিত হবে। মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলনের কথা সে ইতিহাসে অবশ্যই থাকবে, সেই সঙ্গে থাকবে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন এবং নেতাজি সুভাষ বসুর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য প্রবাসে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠনের কথাও। বাঙালির জাতীয় বীর হিসেবে চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষ বসু, খুদিরাম এঁদেরকেও আমাদের সন্তানরা শ্রদ্ধা করতে শিখবে। এই ভূখণ্ড থেকেই স্বাধীনতার জন্য সূর্য সেন-প্রীতিলতাদের সশস্ত্র লড়াই একদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যের অংশ তা। পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে আমাদের নবীন প্রজন্মের মনে এই গৌরববোধ সঞ্চার করতে হবে। পাকিস্তান-পর্বেও ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রাম ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কথা যেমন, তেমনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকদের তেভাগার জন্য লড়াই—জমিদারি,

www.pathagar.com

নানকর ও টংকপ্রথা বিরোধী আন্দোলন, নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ, ১৯৫০ সালে রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে রাজবন্দিদের ওপর গুলিবর্ষণ—এসব ঘটনাও যতটা সম্ভব মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কারণ এসব প্রতিটি ঘটনাই কমবেশি পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র উন্মোচন, আমাদের জনগণের সংগ্রামী চেতনাকে শাণিত ও একের পর এক আঘাত হেনে পাক ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খলকে দুর্বল করেছিল। আমাদের স্বাধিকার-স্বাধীনতার ইতিহাসে এই আন্দোলন-সংগ্রাম-ঘটনাগুলোর গুরুত্বও অপরিসীম।

অন্য সব ব্যাপারের মতো এই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও (কি পাঠ্যপুস্তকে, কি প্রচার-মাধ্যমে) আমরা যেন যুক্তি, মুক্তদৃষ্টি ও ঔচিত্যবোধ দ্বারা চালিত হই। অতীতে বা বর্তমানে অন্য কে কী করেছে বা করছে তা যেন আমাদের করণীয় নির্ধারণ না করে। মনে রাখতে হবে : প্রতিহিংসা সব সময় কেবল প্রতিহিংসাকেই ডেকে আনে। এবং 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?'

১৯৯৬ *সময়ের মুখোমুখি (২০০০)*

www.pathagar.com

উন্নয়নশীল দেশের মেধাপাচার

মেধাপাচার তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটা স্থায়ী উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৬০ সালের পর তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ থেকে ৫ লাখেরও বেশি দক্ষ জনশক্তি পাচার হয়েছে। যাদেরকে গড়ে তুলতে ঐসব দেশের খরচ হয়েছে আনুমানিক ১৯ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে এই বিপুল মেধাপাচারের দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লাভবান হচ্ছে উন্নত দুনিয়ার কিছুসংখ্যক দেশ। পক্ষান্তরে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এর ফলে ব্যাহত হচ্ছে। সমস্যাটি যদিও সাম্প্রতিককালে খুব তীব্র বা প্রকট আকার ধারণ করেছে, তবু এর সমাধান কেবল উন্নয়নশীল দেশগুলোর একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। কেননা মেধাপাচারের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে একথা যেমন সত্যি, তেমনি বিপরীতভাবে একথাও সত্যি যে, এই সব দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিও দেশগুলো থেকে নিয়মিত মেধাপাচারের জন্য অনেকাংশে দায়ী। আর রাতারাতি এই পরিস্থিতির পরিবর্তন আশা করা যায় না। উপরন্তু উন্নয়নশীল বা অনুন্নত বিশ্বের এই পশ্চাৎপদতার ব্যাপারেও উন্নত দুনিয়ার কমবেশি দায়িত্ব আছে। তারা চাইলেই তা অস্বীকার করতে পারে না। জেনেভায় সদ্যসমাপ্ত আঙ্কটাডের দ্বিতীয় বৈঠকে ৭৭ জাতি অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর পক্ষে তাঞ্জানিয়ার প্রতিনিধি মারসেল নামকুয়া তাই আন্তর্জাতিক সমঝোতার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়েছেন। পশ্চিমা দেশগুলোকে তিনি বলেছেন, তৃতীয় বিশ্ব থেকে মেধাপাচার বন্ধের উদ্যোগে অংশগ্রহণ করতে। পশ্চিমা দেশগুলো এই আহ্বানে কতটা সাড়া দেবে বা আদৌ দেবে কি না, সেটা অবশ্য গভীর সন্দেহের বিষয়। তবে এবারের আঙ্কটাড বৈঠকে এবং ইতিপূর্বে অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে বিষয়টি যেভাবে আলোচিত হয়েছে তাতে এটুকু অন্তত বোঝা যায় যে, তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের জন্য সমস্যাটির গুরুত্ব আর উপেক্ষা করবার মতো নয়। এবং জরুরি ভিত্তিতেই এর একটা সমাধানসূত্র বের করা দরকার। আঙ্কটাডের সম্প্রতি

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত বৈঠকে তৃতীয় বিশ্ব ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরভুক্ত ৫০টি দেশের উত্থাপিত প্রস্তাবে উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে মেধাপাচার বন্ধে সে জরুরি উদ্যোগ গ্রহণেরই আহ্বান জানানো হয়েছে।

আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রধান সমস্যাই হল, জনগণের জীবনযাপনের পক্ষে অত্যাবশ্যক মৌলিক চাহিদাগুলোর নিবৃত্তি। সীমিত সহায়-সম্পদ এবং দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শোষণের উত্তরাধিকার নিয়ে এই সমস্যার সমাধানই যেখানে অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে সম্ভব হয় না, সেখানে মেধা বা দক্ষ জনশক্তিকে পরিকল্পিত উপায়ে কাজে লাগানোর সম্ভাবনা নিতান্ত দূর কল্পনাই থেকে যায়। যে-আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে হাজার হাজার লোককে দেশে কর্মহীন থাকতে হয় এবং বেকারের এই মিছিল ক্রমে বাড়তেই থাকে, সেখানে প্রতিভার যোগ্য মূল্যায়ন বা আদর বোধহয় আশা করাও যায় না। স্বদেশে প্রতিভা ও যোগ্যতার উপযুক্ত মূল্যায়ন বা মর্যাদার অভাব, আপন ক্ষমতাকে কাজে লাগাবার ক্ষেত্রে সুযোগহীনতা, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা এবং সেই সঙ্গে খানিকটা হয়তো অভিমানও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে বহু বিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিদ, প্রকৌশলী, স্থপতি, অধ্যাপক বা গবেষককে উন্নত পশ্চিমা দেশগুলোতে পাড়ি জমাতে প্ররোচিত করে। বিদেশের মোহ এবং প্রতিষ্ঠা, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও বিলাসী জীবনের আকাঙ্ক্ষা যে এর পেছনে একেবারেই কাজ করে না তাও নয়। তবে আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা প্রতিভার সহজাত ধর্ম। কাজেই স্বদেশে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ না পেয়ে যদি কেউ বিদেশকেই তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয়, তবে তাঁকে বোধহয় তার জন্য খুব দোষ দেওয়াও যায় না। কাজ ও গবেষণার সুযোগ না পাওয়ায় আমাদের দেশের অনেক সত্যিকার প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিভাকে কাজে লাগাতে পারেননি। অন্যদিকে আমেরিকা-প্রবাসী ভারতের নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ড. খুরানা বা আমাদের বাংলাদেশের স্থপতি এফ. আর. খানের মতো কারো কারো সাফল্য ও খ্যাতি তাঁদের স্বদেশকেও গৌরবান্বিত করেছে। কে জানে হয়তো দেশে থাকলে এঁদের প্রতিভাও অনাবিষ্কৃত থেকে যেত। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাও অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে মেধাপাচারের পেছনে কাজ করে থাকে। রাজনৈতিক বিশ্বাস বা মতবাদের কারণে সরকারের বিরাগভাজন হয়ে কিংবা নিরাপত্তাবোধের অভাব থেকেও অনেকে বিদেশকেই তাঁদের কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির এই সুযোগটা পশ্চিমা দেশগুলো বলা যায় সচেতনভাবেই গ্রহণ করে। তারা নানা ধরনের ফেলোশিপ বা গবেষণাবৃত্তি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে উঁচু বেতনের চাকরি

www.pathagar.com

ও গবেষণার সুযোগ দিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রতিভাবান ও দক্ষ লোকদের আকৃষ্ট করে। পরবর্তীকালে এঁদের কাজ ও গবেষণার দ্বারা এই দেশগুলোই আসলে লাভবান হয়। বিদেশে পাড়ি জমানোর আগে পর্যন্ত গরিব দেশগুলো এঁদের পেছনে যে অর্থব্যয় করে তার সবটাই তখন দাঁড়ায় খরচের খাতায়।

দেশের শিক্ষিত ও প্রতিভাবান ব্যক্তিদের দেশপ্রেম ও সামাজিক কর্তব্যবোধের কাছে আহ্বান জানিয়েই কেবল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে এই নিয়মিত ও বিপুল মেধাপাচার রোধ করা সম্ভব নয়। অন্তত বাস্তব ক্ষেত্রে এর অকার্যকারিতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। এর জন্য আসলেই দরকার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমঝোতার। সে সমঝোতাটাও অবশ্য সহজসাধ্য নয়। যেহেতু উন্নত পশ্চিমা দুনিয়া এর দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লাভবান হচ্ছে, সেহেতু তারা এ ব্যাপারে সদিচ্ছার পরিচয় দেবে না এটাই স্বাভাবিক। এবারই যেমন আন্তর্জাতিকভাবে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ সুবিধাদানের একটি প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আঙ্কটাড দেশগুলো আঙ্কটাড বৈঠক বর্জন করেছে। ওই প্রস্তাবে শিল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতি প্রযুক্তি হস্তান্তরের যে সুফল তারা পাচ্ছে, তাতে সমতার ভিত্তিতে উন্নয়নশীল বিশ্বের সম-অংশীদারিত্বের দাবি জানানো হয়।

তাহলেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো যেভাবে আগের চেয়ে বৃহত্তর ও অপেক্ষাকৃত কার্যকর ভূমিকা নিচ্ছে তাতে তারা যদি ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করতে থাকে, তবে মেধাপাচার রোধে একটা আন্তর্জাতিক সমঝোতার সম্ভাবনা হয়তো দুরাশাও নয়।

১৯৮৪ *বিশ্বায়নের কবলে বাংলা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (২০০৮)*

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ : শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার

দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে পুরো ব্যবস্থাটাকেই আগাগোড়া ঢেলে সাজাবার কথা বলেছেন খোদ শিক্ষামন্ত্রী। দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি অভিহিত করেছেন 'ঔপনিবেশিক আমলের ফসল' বলে। এবং কোনো রকম রাখঢাকের আশ্রয় না নিয়েই তিনি বলেছেন, এই শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এ ব্যাপারে একটি সরকারি পরিকল্পনার কথাও তিনি জানিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, 'প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হচ্ছে যাতে শিক্ষার ব্যয় সঙ্কোচন ঘটবে এবং তা আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও কর্মসংস্থানমুখী হবে।' শিক্ষামন্ত্রী তাঁর একই ভাষণে আরও জানিয়েছেন, 'সরকার বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে এবং ছাত্রদের প্রচেষ্টা ও মেধার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে অধিকতর বিজ্ঞানভিত্তিক ও কার্যকরী করে তুলছে।' দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করার যে পরিকল্পনার কথা মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন তার পেছনে, ধরে নেওয়া যায়, সময় বা যুগের ওই চাহিদা, সামাজিক প্রেক্ষিত, ছাত্রদের মেধা ও যোগ্যতা সম্পর্কে সচেতনতা এবং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যই কাজ করছে।

ফরিদপুরের নাগরিক সমাবেশে প্রদত্ত শিক্ষামন্ত্রীর উল্লিখিত ভাষণ যেদিন প্রকাশিত হয়েছে, সেদিনেরই সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় পাশাপাশি আরও দুটি শিক্ষাসম্পর্কিত সংবাদ ছাপা হয়েছে। এর একটিতে দেখা যায়, সরকার এসএসসি পর্যায়ের পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের পথ ও পদ্ধতি বের করার জন্য একটি 'টাস্কফোর্স' গঠন করেছেন। অপর খবরে বলা হয়েছে, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাদের বাংলা পাঠ্যবইয়ে স্বাধীনতাসংগ্রামের সাতজন 'বীরশ্রেষ্ঠ' সামরিক যোদ্ধার জীবনী, তাঁদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কাহিনি পাঠ করবে।

www.pathagar.com

এসব খবর থেকে একথা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় যে, দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা সংস্কার আনার ব্যাপারটি সরকার গুরুত্ব দিয়েই বিবেচনা করছেন এবং শিগগিরই হয়তো এই ভাবনাচিন্তার একটা বাস্তব ফলাফল আমরা দেখতে পাব। ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্রী প্রাথমিক স্তরে (ভাষণে তিনি যাকে প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থার 'মৌলিক পর্যায়' বলে উল্লেখ করেছেন) যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণি থেকে আরবি ও ইংরেজিকে অবশ্যপাঠ্য করার সরকারি পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন।

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্নমুখী সমস্যা, এক্ষেত্রে বিরাজমান বাস্তবতা এবং শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের প্রশ্নটি নিয়ে গভীর, বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হওয়া দরকার। এই নিবন্ধটির সীমাবদ্ধ পরিসরে যা সম্ভব নয়। তাছাড়া শিক্ষা-সমস্যা নিয়ে লিখতে গিয়ে আমরা সাম্প্রতিককালেও একাধিকবার সে বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর মূল বক্তব্যের সাথে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য একেবারে নেই বললেই চলে। আমরাও মনে করি যে, আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা ও চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ঔপনিবেশিক শাসকরা তাদের নিজেদের স্বার্থেই শিক্ষার এই ছাঁচ গড়ে তুলেছিল—এবং স্বাধীন জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এতে আশা না করাই উচিত। তবু কেন যে আমরা এতদিনও এ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছি, সেটাই বরং আশ্চর্য! শুধু তা-ই নয়, স্বাধীন দেশে আজ আমরা যখন স্বাধীন জাতির উপযোগী নয়া শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলি, তখনও সেই ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার 'গুণ' যেন আমাদেরকে নানাভাবে পিছু টেনে ধরে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেও, মন-মানসিকতার দিক থেকে তো আমরা এখনও ঠিক স্বাধীন হতে পারিনি।

মোটকথা, প্রশাসনের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি শিক্ষার ব্যাপারের আমাদের দাবি বা প্রস্তাব হল ঔপনিবেশিক কাঠামোর পরিবর্তনের। পরিবর্তন মানে আগাগোড়া পরিবর্তন, যাকে বলে খোলনলচেসুদ্ধ পালটে ফেলা। আমরা আগেও বলেছি এবং এ ব্যাপারে আমাদের দৃঢ় অভিমত হল, ঔপনিবেশিক শাসনের মূল কাঠামোটা ঠিক রেখে স্বাধীন দেশে প্রকৃত গণমুখী বা জনকল্যাণকামী প্রশাসন প্রবর্তন করার কথা বলা যেমন অর্থহীন, তেমনিভাবে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার ছাঁচ থেকে স্বাধীন দেশের স্বাধীন, যথার্থ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও সামাজিক দায়িত্বশীল নাগরিক বেরিয়ে আসবে, এটা আশা করা অবাস্তব। সে-রকম আশাবাদ ব্যক্ত করার মধ্যে কপটতা যদি না-ও থাকে, নির্বুদ্ধিতা পুরোমাত্রায়ই আছে। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ঔপনিবেশিক আমলের ফসল একথা যদি সত্যি হয়, তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে-কোনো সংস্কার বা পরিবর্তনের গোড়ার কথাই হওয়া উচিত ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণা বা

www.pathagar.com

মানসিকতার ভূত ছাড়ানো। শিক্ষার সুযোগকে সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে সম্প্রসারিত করা, দেশীয় পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতের সাথে শিক্ষাব্যবস্থাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা, শিক্ষাকে জাতীয় চেতনা, সামাজিক দায়িত্বশীলতা, ঐতিহাসিক বোধ ও নৈতিক মূল্যবোধের উদ্বোধক করে তোলা—এগুলো তো শেষপর্যন্ত পরাধীন আমলে ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রবর্তিত সেই শিক্ষাদর্শের প্রভাব থেকে মুক্তির প্রশ্নটির সাথেই সম্পর্কিত। কথাটা যে আমরা একেবারে জানি না তা-ও নয়। তবু কেন যে আমরা শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাসের কথা বলতে গিয়েও বারবার সেই পুরনো দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাই পরিচালিত হই!

শিক্ষার একেবারে মৌলিক পর্যায়েই আরবি ও ইংরেজিকে অবশ্যপাঠ্য করার কথা শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন। প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ওপর বিদেশী ভাষার এই বোঝা চাপাবার সরকারি পরিকল্পনার সপক্ষে যুক্তি হল, এর ফলে ভবিষ্যতে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। কর্মসংস্থান বলতে এখানে নিশ্চয়ই প্রধানত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কর্মসংস্থানের কথাই বোঝানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ভবিষ্যতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে চাকরির সুযোগ কতটা বাড়বে বা কমবে, সে-প্রশ্নে না গিয়েও বলব, কোনো অবস্থায়ই আমাদের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মধ্যপ্রাচ্যে বা বিদেশে চাকরি করতে যাবে না। এবং দেশের অর্থনীতিতে এদের প্রভাব বা গুরুত্ব যা-ই হোক, বাস্তব ব্যাপার হল আমাদের মোট জনসংখ্যার ক্ষুদ্র একটা অংশই মধ্যপ্রাচ্যে বা বাইরের অন্যান্য দেশে চাকরি করে। ভবিষ্যতে এই সংখ্যা যদি বৃদ্ধিও পায়, তবু তা কখনোই অতটা বাড়বে না যাতে মনে করা চলে যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কর্মসংস্থানই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। আরবি ভাষা শিখলে ভবিষ্যতে কিছু লোকের মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি লাভের সুবিধা হবে এবং সেই সূত্রে দেশে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও আসবে, শুধুমাত্র এ কারণেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়েই আরবিকে সকলের জন্য বাধ্যতামূলক বা অবশ্যপাঠ্য করতে হবে—এটা আসলে কোনো যুক্তির কথা নয়। আর তুলনামূলক হারে কম হলেও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তো আমাদের দেশ থেকে লোকজন চাকরি করতে যায়। অনেকদিন আগে থেকেই যায়, ভবিষ্যতেও হয়তো যাবে। তাই বলে কি বিদেশে কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে ওই সব বিদেশী ভাষাকেও আমাদের দেশে অবশ্যপাঠ্য করতে হবে? আর ধর্মশিক্ষার জন্য যদি আরবি ভাষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়, তবে সে প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হল, ধর্মশিক্ষা তো মাতৃভাষাতেও হতে পারে। তুরস্ক প্রভৃতি মুসলিম দেশে যদি আজান-নামাজের মতো ধর্মীয় কাজগুলোও তারা তাদের নিজেদের ভাষাতেই করতে পারে, তাহলে আমরাই বা আমাদের সন্তানদের

www.pathagar.com

মাতৃভাষায় ধর্মশিক্ষা দিতে পারব না কেন? এর জন্য আবার কোমলমতি শিশুদের ওপর অতিরিক্ত একটি ভাষার বোঝা চাপানো কেন?

একথা অস্বীকার করবার কোনো কারণ নেই যে, ইংরেজি একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক ভাষা। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বাহন হিসেবে এর কার্যকারিতাকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় ও দৈনন্দিন জীবনে এর যে মর্যাদা ও অবস্থান, তার কারণ অন্য। ঔপনিবেশিক আমলের উত্তরাধিকার হিসেবেই আমরা একে লাভ করেছি এবং আর দশটি ক্ষেত্রের মতো ভাষার ক্ষেত্রেও এই ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারকে আমরা এখনও বয়ে চলেছি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ, যারা আমাদের মতো ইংরেজি ভাষার 'আশীর্বাদ' লাভ করেনি এবং ইংরেজি যাদের দ্বিতীয় এমনকি তৃতীয় ভাষাও নয়, তারা যে সভ্য জাতি হিসেবে পরিচিত হতে পারেনি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাদের কেউ কেউ যে আমাদের চেয়ে অনেক অনেক ধাপ এগিয়ে নেই, এমন কথা বোধহয় আমাদের দেশের পরম ইংরেজিভক্ত লোকটিও বলতে পারবে না। বরং চারদিকে একটু নজর ফেরালেই আমরা দেখতে পাব, নিজ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেই অনেক নবীনতর জাতিও আজ সভ্যতা-সংস্কৃতি, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একেবারে শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে।

না, আমাদের দেশের লোক বিদেশী ভাষা শিখবে না, জাতীয়তাবাদের নামে এমন কোনো সঙ্কীর্ণতাকে আমরা প্রশ্রয় দিতে চাই না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল দরজা-জানালা আমরা খোলা রাখতে চাই। ভাষা হল জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের সেই দরজা-জানালা। তবে সেজন্য শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই একটি বা দুটি বিদেশী ভাষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে এর কোনো মানে নেই। 'মৌলিক পর্যায়ে'ই পাঠ্যবিষয়ের এই ভার বরং শিশুদের স্বাভাবিক মানসিক বিকাশকে ব্যাহত করবে। বিদেশী ভাষাকে সকল ছাত্রের জন্য এভাবে বাধ্যতামূলক করার ফলে সাধারণ ও মাঝারি মেধার ছাত্রদের পক্ষে লেখাপড়া করাই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, বিশেষ করে প্রতিবছরের পরীক্ষার ফলাফল থেকেই আমরা এটা উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের দেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা স্নাতক পর্যায়ের পরীক্ষায় যত ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হয়, দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই ফেল করে ইংরেজিতে। অথচ যে-কোনো অর্থেই ইংরেজি আমাদের কাছে একটি বিদেশী ভাষা। আর এই বিদেশী ভাষায় কোনো ছাত্র বা ছাত্রী কাঁচা বা যথেষ্ট ভালো নয় বলে অন্যান্য বিষয়ে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েও সে ভবিষ্যতে লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, কোনো 'জাতীয়' শিক্ষানীতিই এই ব্যবস্থাকে অনুমোদন করতে পারে না।

www.pathagar.com

আমরা চাই শিক্ষার উচ্চস্তরে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে বিভিন্ন বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাক। আর সেটা দরকারিও। প্রসঙ্গত এখানে একটা কথা বলা দরকার, সেটা হল, ইংরেজিই তো একমাত্র আন্তর্জাতিক ভাষা নয়। বর্তমান বিশ্বে ফ্রেঞ্চ, জার্মান, স্প্যানিশ বা রুশ ভাষাও ইংরেজির পাশাপাশি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। বিশ্বের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিরাটসংখ্যক মানুষের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হল ইংরেজির বদলে এই ভাষাগুলো। তবু সাবেক ব্রিটিশ উপনিবেশের মানুষ হিসেবে ঐতিহাসিক কারণেই আমাদের কাছে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজিই হয়তো প্রথম বিবেচনা ও সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করবে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে অন্যান্য আন্তর্জাতিক ভাষাগুলোও শিখতে আমরা আগ্রহী হব না কেন?

প্রাথমিক স্তরে একই সাথে দুটি বিদেশী ভাষা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত কার্যকর করার আগে এ ব্যাপারে শিক্ষাবিশেষজ্ঞ ও শিশু মনস্তত্ত্ববিদদের আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত মতামতকে বিবেচনায় আনার জন্য আমরা সরকারকে অনুরোধ করব। অন্যথায় ভালো করতে গিয়ে চূড়ান্ত মন্দও হতে পারে।

১৯৮২ *বিশ্বায়নের কবলে বাংলা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (২০০৮)*

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ইংরেজি চর্চা

গত ১২ ও ১৩ জুন 'বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার অবস্থা' শীর্ষক দু' দিনব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের উদ্যোগে। আসলে ব্যাপারটা ছিল বাংলাদেশের ইংরেজি শিক্ষকদের বার্ষিক কনভেনশন। আর মূলত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকরাই এতে অংশ নিয়েছেন, বক্তব্য রেখেছেন। যতদূর জানা গেছে, সেমিনারে অংশগ্রহণকারী প্রায় সকল বক্তাই বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে বিরাজমান অবস্থাকে তাঁরা অভিহিত করেছেন 'বিপর্যস্ত অবস্থা' বলে। সেমিনার থেকে তাঁরা সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন, 'ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, অনিশ্চয়তা ও বিপর্যস্ত অবস্থা বিরাজ করছে তা দূর করার উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে একটি সুস্পষ্ট ও সুষম নীতি ঘোষণা' করা হোক। এই 'সুষম নীতি' বলতে তাঁরা আসলে কী বোঝেন বা বোঝাতে চান, তা-ও তাঁরা পরিষ্কার করে দিয়েছেন ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে শুরু করে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার সকল স্তরে ইংরেজিকে অবশ্যপাঠ্য ভাষা করার দাবি জানিয়ে সেমিনারে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।

সেমিনারের যাঁরা উদ্যোক্তা এবং যাঁরা তাতে বক্তব্য রেখেছেন, সত্যি কথা বলতে কি, বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার এই বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাথে তাঁদের পেশাগত স্বার্থ—জীবন ও জীবিকার প্রশ্নটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবেই সম্পর্কিত। সুতরাং দেশে ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে যদি কোনো সুস্পষ্ট নীতি না থাকে, যদি এক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা অনিশ্চয়তা বিরাজ করে, তবে তাতে তাঁদের উদ্বিগ্ন হওয়া, বিচলিত বোধ করা তো খুবই স্বাভাবিক। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে যে-'সুস্পষ্ট' নীতি ঘোষণার দাবি তাঁরা সরকারের কাছে জানিয়েছেন, তার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমাদের সহানুভূতি ও সমর্থন রয়েছে তাঁদের সে দাবির প্রতি। কিন্তু প্রশ্ন হল, ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নীতি ঘোষণার ব্যাপারটা কি দেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আলাদা বা তার বাইরের কিছু? দেশের

www.pathagar.com

সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রেই যদি দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করে, এ ক্ষেত্রেই যদি অবস্থাটা হয় সত্যিকার বিপর্যস্ত, তবে সেখানে একটি বিদেশী (সকল অর্থেই) ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নীতি-পদ্ধতি আশা করা যায় কী করে? দেশে একটি সুস্পষ্ট ও সুষম জাতীয় শিক্ষানীতির অনুপস্থিতিতে আলাদাভাবে সরকারের কাছে কেবল ইংরেজি শিক্ষার প্রশ্নেই দ্বিধাদ্বন্দ্বমুক্ত নীতি প্রণয়নের দাবি জানিয়ে তাঁরা আসলে কতটা বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন?

উল্লিখিত সেমিনারে যাঁরা অংশ নিয়েছেন তাঁরা সকলেই যাকে বলে জ্ঞানীগুণী মানুষ। পেশাগত পরিচয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পদাধিকারের বাইরেও তাঁদের কারো কারো পাণ্ডিত্যের খ্যাতি, প্রজ্ঞা ও মননশীলতার পরিচয় আমাদের সমাজে তাঁদেরকে গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। এ অবস্থায় তাঁদের কথাবার্তায় ব্যক্তিগত বা পেশাগত স্বার্থদৃষ্টির উর্ধ্বে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ বা জাতীয় স্বার্থদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটবে এটাই স্বাভাবিক ও কাম্য। অথচ দুঃখজনক সত্যি হল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ আয়োজিত 'বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার অবস্থা' শীর্ষক উক্ত সেমিনারে এ ধরনের দু-একজন দায়িত্বশীল ও সম্মানিত ব্যক্তিও এমন কিছু মন্তব্য করে বসেছেন, যাকে এককথায় দায়িত্বহীন উক্তি বলে অভিহিত করতে হয়।

এখানে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো। তা হল, শুধু ইংরেজি কেন, কোনো বিদেশী ভাষা শিক্ষারই আমরা বিরোধী নই। তবে শিক্ষার উচ্চস্তরে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবেই তাকে রাখার পক্ষপাতী। ইংরেজি ভাষার আন্তর্জাতিক মর্যাদা কিংবা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বাহন হিসেবে এর শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করেও বলব, সবকিছুর পরেও এটি আমাদের কাছে একটি বিদেশী ভাষা। এবং একটি বিদেশী ভাষা কখনোই কোনো দেশের শিক্ষার সর্বস্তরে 'অবশ্যপাঠ্য' হতে পারে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল দরজা-জানালা খোলা রাখতে চাই আমরা এবং তার জন্য বিদেশী ভাষা শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ দেশে বিরাজ করুক এটা আমাদেরও কাম্য। কিন্তু সেমিনারে 'জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে' ইংরেজি শিক্ষার 'অপরিহার্যতা'র কথা বলে যে প্রস্তাব পাস করা হয়েছে, তার সঙ্গে আমরা একমত নই। পৃথিবীর অনেক অনেক দেশ যেখানে ইংরেজি ভাষাকে বাদ দিয়েই বা শিক্ষার ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যপাঠ্য না করেই উন্নয়নের পথে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমাদের দেশে একে অবশ্যপাঠ্য করার পক্ষে কোনো যুক্তিই থাকতে পারে না। শিক্ষার সর্বস্তরে বিদেশী ভাষার বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য হতে পারে একটাই। আর তা হল, শিক্ষাকে দেশের মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণির মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে সাধারণত কোন্ নীতিপদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে, সেমিনারে অংশগ্রহণকারী 'পণ্ডিত' ব্যক্তিরা

www.pathagar.com

যে সে সম্পর্কে একেবারেই অনবহিত তা হয়তো নয়। কিন্তু তাঁরা জেনেশুনেই এভাবে ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে ওকালতি করছেন। সেমিনারে তাঁরা যেসব কথা বলেছেন তা থেকে মনে হয়, সম্ভব হলে তাঁরা আমাদের দেশে নতুন করে ইংরেজিকেই সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবি জানাতেন। এঁদের এসব বক্তব্যকে তুচ্ছ করা যায় না এ কারণেই যে, এঁরা আমাদের সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রের মান্যগণ্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। এবং এঁদের বক্তব্য কেবল ব্যক্তিগতভাবে এঁদেরই বক্তব্য নয়। আমাদের সমাজের একটি মহলের মনোভাব ও স্বার্থদৃষ্টিরই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁদের বক্তব্যে।

১৯৮২ *বিশ্বায়নের কবলে বাংলা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (২০০৮)*

www.pathagar.com

বৈষম্য সৃষ্টির শিক্ষাব্যবস্থা

ক্যাডেট কলেজের একজন ছাত্রের পেছনে সরকার বছরে ১৪ হাজার ৫ শত ৮৩ টাকা ব্যয় করেন। পক্ষান্তরে বেসরকারি কলেজের একজন ছাত্রের পেছনে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ বার্ষিক ৫ শত ৩৫ টাকা এবং বেসরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের পেছনে মাত্র ১৬২ টাকা। গত শুক্রবার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তরকালে স্বয়ং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল বাতেন এ তথ্য জানিয়েছেন।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় চালু বৈষম্যের যে-চিত্র শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর প্রদত্ত এ সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান উদ্‌ঘাটিত করছে তা রীতিমতো ভয়াবহ ও উদ্বেগজনক। যে-কোনো সুস্থ, বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন, সত্যিকার দেশপ্রেমিক নাগরিক এতে বিচলিত বোধ না করে পারে না। দেশের ৬টি মাত্র ক্যাডেট কলেজের কয়েকশো ছাত্রের প্রতি সরকারের এই সর্বপ্রযত্ন দৃষ্টি ও তারই পাশাপাশি ১৫৫টি সরকারি ও ৮ হাজার ৭৯৯টি বেসরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের লক্ষ লক্ষ ছাত্রের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণের কী 'যুক্তি' থাকতে পারে, অথবা কোন যোগ্যতায় ক্যাডেট কলেজের মুষ্টিমেয় ছাত্র শিক্ষা খাতে জাতীয় ব্যয়ের এই মোটা অংশটা ভোগ করছে, সে প্রশ্ন তুলে এখানে হয়তো সত্যি সত্যি লাভ নেই। কেননা মনে মনে আমরা সবাই তো সে প্রশ্নের জবাব জানি। এমন তো নয় যে, ক্যাডেট কলেজগুলোতে যারা পড়াশুনা করে মেধা ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে তাদের সমকক্ষ ছাত্র অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নেই। নিশ্চয়ই আছে, হয়তো পর্যাপ্ত পরিমাণেই আছে। কিন্তু তাদেরকে সে যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ দিচ্ছে কে? প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যাডেট কলেজসমূহে ছাত্র ভর্তি করা হয় ঠিকই। কিন্তু বাংলাদেশের ক'টি পরিবারের পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করার কথা ভাবতে পারে? এ প্রসঙ্গেই চলে আসে সঙ্গতির প্রশ্ন, দেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক বাস্তবতার প্রশ্ন।

যে-দেশের শতকরা আশিভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমারও নিচে বাস করে; অধিকাংশ লোকই অক্ষরজ্ঞান বর্জিত—প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগটুকু থেকেও বঞ্চিত; যে দেশের

www.pathagar.com

বেসরকারি স্কুল-কলেজগুলো হাজারো সমস্যায় জর্জরিত—কোনোরকমে টিম টিম করে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, সে দেশে কিছুসংখ্যক ভাগ্যবান পরিবারের কয়েকশো মাত্র ছাত্রের জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থার যুক্তি খুঁজতে যাওয়াই কি অপরাধ নয়? যুক্তি কি সত্যিসত্যিই কিছু আছে? সরকারি অনুদানের টাকার অভাবে যখন দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়; বেসরকারি কলেজের শিক্ষকরা বেতন দূরে থাক, সামান্য সরকারি ভাতাটাও নিয়মিত পান না; প্রয়োজনীয় শিক্ষক, লাইব্রেরির বই ও ল্যাবরেটরির সরঞ্জামের অভাবে বেসরকারি স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া পদে পদে ব্যাহত হয়; তখনও শোনা যায় সরকার সারা দেশে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলগুলোকে ক্যাডেট কলেজে পরিণত করার কথা ভাবছেন। ভাগ্যের বরপুত্রদের অতিরিক্ত সৌভাগ্যের এই মাশুল যোগাতে হবে শেষ পর্যন্ত জনগণকেই—তাদের করের অর্থে।

ব্রিটিশ আমলে এ দেশে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সূচনা থেকেই এর ভিত্তি ছিল শ্রেণিবৈষম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষানীতি সমাজের ব্যাপক অংশের সাথে অল্পসংখ্যক 'শিক্ষিত' ব্যক্তির ব্যবধান সৃষ্টির লক্ষ্যেই শুধু পরিচালিত হয়নি, শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরেও সেখানে শ্রেণিবৈষম্যকে পাকাপাকিভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনেও মোটামুটিভাবে ব্রিটিশ আমলের সে দৃষ্টিভঙ্গিই অনুসৃত হয়েছে। আর শিক্ষাক্ষেত্রে সে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির চরম প্রকাশ ঘটেছে আইয়ুবি দশকে ক্যাডেট কলেজগুলো প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে।

বললে অত্যুক্তি হবে না, ক্যাডেট কলেজ, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও এ-জাতীয় অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য বা 'সার্থকতা'ই হল আপন পরিবার, সমাজ ও বৃহত্তর দেশীয় বাস্তবতা থেকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের বিচ্ছিন্ন করার মধ্যে। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের কোনো সন্তান যদি বা ভাগ্যজোরে ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হতে পারে, ছুটিতে যখন সে বাড়ি আসে টেবিলে বসে তার কাঁটা-চামচে খাওয়ার অভ্যাস বজায় রাখতে পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ব্যতিব্যস্ত হতে হয়। পাড়ার সমবয়সী পূর্বতন খেলার সঙ্গীদেরও সে খানিকটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। পরে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেও সাধারণ বিদ্যালয় থেকে আসা ব্যাপক ছাত্রসমাজের সাথে তারা সহজভাবে মিশতে পারে না। সমাজেও তারা একটা নিজস্ব সঙ্কীর্ণ বেষ্টনী রচনা করে বাস ও চলাফেরা করে।

স্বাধীনতার পর আশা করা গিয়েছিল সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও এই বৈষম্যমূলক ও অযৌক্তিক ব্যবস্থার অবসানের একটা ধারা অন্তত সূচিত হবে। দাবি উঠেছিল ক্যাডেট কলেজগুলো বন্ধ করে দেওয়ার। কিন্তু স্বাধীন

www.pathagar.com

দেশের কোনো একজন মন্ত্রীই সেদিন প্রকাশ্যে এ দাবির বিরোধিতা করেছিলেন। স্বাধীন দেশেও রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালনায় যাঁরা নিয়োজিত হয়েছেন তাঁরা শ্রেণিস্বার্থ ক্যাডেট কলেজ ও রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল-জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে টিকিয়ে রেখেই শুধু সন্তুষ্ট হননি। দেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার ভবিষ্যতকে অকাতরে জলাঞ্জলি দিয়ে হলেও এই গুটিকতক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পেছনে সরকারি ব্যয়বৃদ্ধি ও সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণে তাঁরা যেন বদ্ধপরিকর। একথা সেদিনও যেমন আজও তেমনি, কিংবা তারও চেয়ে বেশি, সত্যি। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর প্রদত্ত পরিসংখ্যান এ সত্যের স্বীকৃতি বৈ তো নয়!

১৯৮১ *বিশ্বায়নের কবলে বাংলা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (২০০৮)*

---

www.pathagar.com

KATHAPROKASH

কথাপ্রকাশ

www.kathaprokashbd.com

9 847012 004760

www.pathagar.com